ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

অষ্টম বর্ষ ■ নববর্ষ সংখ্যা ■ বৈশাখ ১৪২৫ ■ এপ্রিল ২০১৮

বসন্ত চলে গেছে, দাঙ্গা এসে গেছে

- ব্রহ্মাণ্ডে ডানা মেললেন স্টিফেন হকিং
- গভীর শূন্যতা রেখে গেলেন আসমা জাহাঙ্গীর
- কলকাতার প্রহরী ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ প্রয়াত
- কৃষক প্রতিবাদের চালচিত্র
- সাম্প্রতিক ত্রিপুরা নির্বাচন

- ভারতলক্ষ্মী নিবেদিতা
- ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব
- কুঁয়র নারায়ণের কবিতা
- মোদি কেয়ারের নেপথ্যে

- শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য

কৃষক প্রতিবাদের চালচিত্র

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

ISSN : 13660

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

অষ্টম বর্ষ • নববর্ষ সংখ্যা • বৈশাখ ১৪২৫ • এপ্রিল ২০১৮

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাদ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায়, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভময় দত্ত, সোমনাথ চৌধুরী, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, অরণি সেন

উপদেষ্টামণ্ডলী : সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ৩৮ ইউ সুলতান আলম রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩
অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, এস-১৮ বিদ্যাসাগর ভবন, ১০ রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
রূপক ঘোষ, পশ্চিমপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম-৭৩১২৩৫
সনৎ রায়চৌধুরী, ফুলপুকুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১
জয়া মিত্র, এ.এস.-৩/২৮/২ কল্যাণপুর হাউসিং বোর্ড, আসালসোল-৭১৩৩০৫
কমলেন্দু চক্রবর্তী, ২৩৩ পীরগাছা, বামুনমুড়া রোড, পোঃ বাদু, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৮
কমল চক্রবর্তী, ভালোপাহাড়, পোঃ লতা, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া-৭২২১৩৬
পীযুষ সরকার, আমাদের হাসপাতাল, ফুলবেড়িয়া, বাঁকুড়া-৭২২১৩৬
অনিতা মজুমদার, ২৫ডি.এল.রায় সরণী, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১
তৃপ্তি সান্ত্রা, এয়ারভিউ কমপ্লেক্স, মহেশমাটি, ইংরেজ বাজার, মালদা-৭৩২১০১
মৈনাক মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডুপুকুর, বর্ধমান-৭১৩১০১
দেবাশিষ দত্ত, ৮, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
পুণ্যব্রত গুণ, এইচ. এ.৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯৭
সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮/৩, সমবায় পথ, পোঃ নবনগর, হুগলী-৭১২২৪৬
বরুণ সাহা, চৌপথি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার-৭৩৬১৪৬
সুমন গোস্বামী, কলেজ রোড, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২
জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪
সুদেব সাহা, মিলন পাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩১৩৪
পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেণ সেন সরণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
শুভম ভট্টাচার্য্য, গীতাঞ্জলি মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
সুমনা গুপ্ত, ৩৬/১, মধুপুর রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
সুদেষ্ণা রায় চৌধুরী, ১৯/১ বি.এ.সি. রোড, ইন্দ্রপ্রস্থ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪৩৩২৯
সুনীল সোরেন, লাল কুঠি পাড়া, সিউড়ি, বীরভূম-৭৩১১০১
অরুণ সেন, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
বিজন ভট্টাচার্য্য, রেলওয়ে নিউমার্কেট, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩২৯
ষড়ানন পাণ্ডা, এঁড়াল, সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৪৪
বিবর্তন ভট্টাচার্য্য, গ্রাম-কাঁঠালপুলি, পোস্ট - চাকদহ, নদীয়া-৭৪১২২২
প্রবীর পাল, ১৯/২, ভোলানাথ নন্দী রোড, হাওড়া-৭১১১০৪
ফণিগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প, ৫, জি.টি. রোড, হাওড়া-৭১১২০২
ভবানী প্রসাদ সাহু, গ্রাম : ঘোলে, পো : চাউলপট্টি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৫৫
জাতিশ্বর ভারতী, সুখসাগর এপার্টমেন্টস্, শিয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
রঞ্জন আচার্য্য, রবীন্দ্রপল্লী, পুরুলিয়া-৭২৩১০১
জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড, কাঁচরাপাড়া-৭৪৩১৪৫
প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, বিজলি চক, কালিবাড়ি, রায়পুর, ছত্তিশগড়-৪৯২০০১
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বি/এল ৭৬, ভি.এস.এস. নগর, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা-৭৫১০০৭
সমিত কুমার কর, ১০১১ শতলেজ বিজয়া শতাব্দী, সোনারী, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড-৮৩১০১১
সোমেন চক্রবর্তী, পি৫৩, সুরুচি অ্যাপার্টমেন্টস্, দ্বারকা, নিউ দিল্লী-১০০০৭৫
রাহুল মুখোপাধ্যায়, বি ৯৫ এস. এস., বার্হিংহাম হার্টল্যান্ডস্ হসপিটাল, বার্জসলে গ্রীন ইস্ট, ইউ. কে.
কৌশিক সেন, স্পোর্টিং ক্লাব ড্রাইভ, র‍্যালে, নর্থ ক্যারোলিনা, ইউ.এস.এ.

প্রচ্ছদ : কলাভবন; **বর্ণসংস্থাপন :** তন্ময় ভট্টাচার্য্য : **অন্যান্য চিত্র** - সাম্পান পাঠক, ইন্দ্রনীল মিত্র, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, সৌমিত্র সাহা, অর্ঘ্য মিত্র ও চন্দন রায়

পরিবেশনা : সমরেন রায়, অমিতাভ সেনগুপ্ত, প্রদীপন গাঙ্গুলী, অয়ন ঘোষ, প্রদ্যোৎ নাগ, শাহজাহান সিরাজ ও অভিজিৎ সেন

যোগাযোগ : **ssunnayan@gmail.com || www.ssu2011.com**

সম্পাদকীয়

আমার হকিং

অরুণাভ বিশ্বাস

স্টিফেন হকিং আর নেই। পদার্থবিজ্ঞানের জগতে যে শূন্যতা নেমে এল তা নিয়ে এখন অনেক লেখালিখি অনেক বিতর্ক হবে। মাপামাপি হবে তিনি আদতে কতবড় বিজ্ঞানী তা নিয়ে। সে সব কথাবার্তায় না ঢুকে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি করছি।

আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আবার একেবারেই উল্টো। আমি বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর অসামান্যতা বোঝার চেষ্টাই করি না। কারণ বিগ ব্যাং থিয়োরী আদৌ তাঁরই কিনা, স-ক-ত আদতে গ্রহণযোগ্য কিনা বা কণা পদার্থবিদ্যায় তাঁর মৌলিক অবদান প্রকৃতপক্ষে কতখানি তা বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি সাহিত্যের ছাত্র। আমার কাছে তাঁর অসামান্যতা তাঁর লেখা বইয়ের জন্য।

A Brief History of Time, Universe in a Nutshell, Theory of Everything ইত্যাদি বইগুলোর অনুবাদে মজে ছিলাম ছাত্রজীবনে। এখনও বিদেশে ছাপানো Illustrated Edition এর তেলতেলা পাতাগুলো ওল্টাতে শিহরিত হই। স্কুল জীবনে আইনস্টাইন, প্লাঙ্ক, ফাইনম্যানের লেখা বই পড়েছি বলে তো মনে হয় না। বড়জোর আইনস্টাইনের সমাজবিজ্ঞানসিঞ্চিত প্রবন্ধগুলোতে কলেজজীবনে আকৃষ্ট হয়েছি। কিন্তু শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত আর পথিক গুহর অনুবাদ বা লেখার মাধ্যমে তাঁর প্রতি যে মুগ্ধবোধ জন্মে গেছিল সেই এইট-নাইনে পড়তে পড়তে তা তো আজও মলিন হয় নি। Universe কণাপদার্থবিদ্যার basic premises (জটিল এবং মূল শতসিদ্ধ বা প্রতিপাদ্য)-গুলোর আলোচনায় সহজ সরল ভাষায়, জার্গন পরিহার করে, পৃথিবীব্যাপী অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানপিপাসু সাধারণ মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব আমার মতে স্টিফেন হকিংয়ের। সম্প্রতি তাঁর মেয়ের সাথে মিলে George's Secret Adventure to the Universe সিরিজের বইগুলোতে একেবারে বাচ্চাদের জন্য লিখছিলেন।

আর তাঁর সোচ্চার নিরীশ্বরবাদী অবস্থান, ব্যক্তিগত জীবনসংগ্রামের কথা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিজ্ঞানী হিসেবেও সেলিব্রিটিত্ব অর্জন করাকে এই আলোচনায় আনলাম না।

মূর্তি নয়, সভ্যতার জিন

শ্রীজাত

যদি বলি মূর্তি নয়? সভ্যতার জিন?
যদি বলি ধর্ম নয়? চিন্তাধারাপাত?
বামিয়ানে বুদ্ধ থেকে মস্কোয় লেনিন-
পাথরে হাতুড়ি লাগে। হৃদয়ে আঘাত।

আমরা ধান ফলিয়েছি ইনকায় মিশরে
আমরাই গেয়েছি গান রোমে, হরপ্পায়
আজও তার স্রোত বইছে রক্তের ভিতরে-
তুমি ভাবো এক আঘাতে সবই ভাঙা যায়?

মূর্তি নয়। ভাবমূর্তি। আমার না। তোমার।
গুঁড়ো হয়ে মিশে যাচ্ছে সভ্যতার জলে...
ধর্ম তো সহিষ্ণু। তুমি অধর্মের সার।
পাথর নীরবই থাকে। চিন্তা কথা বলে।

যত পারো ভেঙে যাও, ধর্মবীর সাজো—
সভ্যতার রক্তস্রোত শেষ হয়নি আজও!

শ্রদ্ধার্ঘ্য

অকুতোভয় সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক গৌরী লঙ্কেশ; দুনিয়া জুড়ে অসৎ-রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, বিনোদন জগতের মানুষদের দুর্নীতি সংক্রান্ত পানামা কেলেঙ্কারী ফাঁসের পুরোধা মালটার তদন্তমূলক সাংবাদিক ও ব্লগার ড্যাফেন কারুয়ানা গ্যালিজিয়া; ত্রিপুরার সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিক; উত্তরপ্রদেশের সাংবাদিক নবীন গুপ্ত ও কে.জি. সিংহ; মধ্যপ্রদেশের সাংবাদিক সন্দীপ শর্মা; মেঘালয়ের তথ্যের অধিকার কর্মী পাইপিনহান মাজাও

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট ~ ● বঙ্কিম গবেষক সত্যজিৎ চৌধুরী ● লেখিকা চিত্রা দেব ● কবি কার্তিক মোদক ● মালয়ালাম সাহিত্যিক কুঞ্জাবদেল্লা ● সাহিত্যিক রবিশংকর বল ● শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র ● বিজ্ঞানী লালজি সিং ● রতনলাল ব্রহ্মচারী ● সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ● সঙ্গীতকার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ● সঙ্গীতজ্ঞা রাধা বিশ্বনাথন ● সিনেমাটোগ্রাফার রামানন্দ সেনগুপ্ত ● চিত্র পরিচালক কুন্দন শাহ্ ● অভিনেতা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুমিতা সান্যাল ● রীতা কয়রাল ● সাকিলা ● শম্ভু ভট্টাচার্য্য ● পার্থ মুখোপাধ্যায় ● শ্রীদেবী ● নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন ও রাজবংশী ধুমল সম্প্রদায়ের নেতা খুদন মল্লিক ● শ্রমিক নেতা মহম্মদ আমিন ● কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সুকোমল সেন ● রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রবোধ পনডা ● নভশ্চর জন ইয়ং ● ক্রিকেটার শ্রীরূপা বসু ● পাওয়ার লিফটার সক্ষম যাদব ● নাট্য ব্যক্তিত্ব জয় মিচেল ● সুফি গায়ক প্যারেলাল ওয়াদালি ● প্রতিবন্ধীদের অধিকার আন্দোলনের সংগঠন জাভেদ আমিদি ● বর্ণবৈষম্য বিরোধী সংগ্রামের নেত্রী লিনডা ব্রাউন ও উইনি ম্যাণ্ডেলা ● পরিবেশ বিজ্ঞানী আশিস কুমার ঘোষ

বসন্ত চলে গেছে, দাঙ্গা এসে গেছে

আমার ভারতবর্ষ

ইমানুল হক

তোমরা যাকে দেশ বলে শেখাতে চাও
সেটা আমার দেশ না।
আমার দেশ মানে অষ্টমীতে জগন্নাথের মায়ের বানানো লুচি,
কুমড়োর ছক্কা
আর জিরের ফোড়ন দেওয়া অমৃত স্বাদ ডাল,
আমার দেশে ঈদের দিনে দোকানে কেনা লাচ্ছা খাবে না
তাপস চক্রবর্তীর ছেলে,
সে ইনামভাইয়ের দেওয়া লাচ্ছা সিমুই ছাড়া আজ আর কিছুই
খাবে না।

আমার ভারতবর্ষ মানে বিজয়া দশমীর দিনে সাঁওতালি নাচ
মাথায় তাদের ময়ূরের পালক এবং বুনো কাশ।
আমার ভারতে মারাং বুরুর উৎসবে বাজে ধামসা আর
রবীন্দ্রসংগীত।
আমার ভারতবর্ষে ধর্মং শরণং গচ্ছামি বলে
কেউ অস্ত্রে দেয় না শান
আমার ভারতবর্ষে মহালয়ায় সুরে মিশে থাকে আজান
আমার ভারতে রাম মামার মায়ের হাতে সত্যপীরের সিন্নি
বিজয়ার সিঁদুরে মাখানো নারকূলে নাড়ু।

আমার ভারতবর্ষ রক্তে নয়
সিঁদূরে সোহাগে মেশা,
আমার ভারতবর্ষ
রাম-রহিমের অপূর্ব ভালাবাসা।

আমার ভারত লেখে নয়া ইতিহাস...
গোলাপ পদ্মে মেশা বুনো বুনো কাশ।

মানুষ কিছুতেই বড় হতে চায় না

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল,
মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না।
এখনো বুঝলো না 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়,
মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই,
ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু
এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না,
ধর্মগুলো সব রূপকথা।
যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধূলোমাখা
শিশুটির কান্না শুনতে পায় না,
তারা গর্জন বিলাসী....

দাঙ্গা নয়, যুদ্ধ নয়— শান্তি চাই, খাদ্য চাই, নিরাপদ পানীয় জল চাই, সেচের জল চাই, বাসস্থান চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, কাজ চাই

ধিক্কার ও প্রতিবাদ

- বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপর সমাজবিরোধী ও পুলিশের আক্রমনের প্রতিবাদে
- দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ একের পর এক রাজ্যে ক্রমাগত নারী ধর্ষণ, অত্যাচার ও হত্যা, বিশেষত গরীব, গৃহহীন ও দলিত পরিবারের মহিলাদের উপর অত্যাচার এবং অপরাধীদের ধরা ও শাস্তির ক্ষেত্রে পুলিশ -প্রশাসন- কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির 'নির্বিকল্প সমাধি'র প্রতিবাদে
- কাবুল সহ আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর প্রতিবাদে
- কাশগঞ্জ, রানীগঞ্জ সহ সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গার প্রতিবাদে
- গুজরাটের মানবাধিকার কর্মী জয়ন্ত পাণ্ড্যর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকবাজদের হানায় একের পর এক সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী, অভিবাসী শ্রমিক প্রমুখের মৃত্যুতে
- দলিত আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যার প্রতিবাদে

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে ২

● আমার হকিং — অরুণাভ বিশ্বাস

● মৃতি নয়, সভ্যতার জিন — শ্রীজাত

বসন্ত চলে গেছে, দাঙ্গা এসে গেছে ৩

● আমার ভারতবর্ষ — ইমানুল হক

● মানুষ কিছুতেই বড় হতে চায় না — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৭

● এমিলি জেন ব্রন্টি ● ইভান সের্গেইভিচ তুর্গেনিভ ● ভীমা কোড়েগাঁও যুদ্ধ ● প্রমথ চৌধুরী ● ম্যাক্সিম গোর্কি ● ইনগমান বার্গম্যান ● আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন ● অসীমা চট্টোপাধ্যায় ● তাঞ্জোর বালাসরস্বতী ● সুভাষ মুখোপাধ্যায় ● গুরু বিপিন সিংহ ● অমিয়ভূষণ মজুমদার ● লেফটেনান্ট ইন্দ্রলাল রায় ● পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ● বসু বিজ্ঞান মন্দির ● স্যাফ্রোজেট অধিকার অর্জনের শতবর্ষ

কবিতা ১২

● কুয়ঁর নারায়ণের কবিতা — অনুলিখন : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ১৩

● ভারতলক্ষ্মী নিবেদিতা — দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ভাষ্য ২৪

● ডোকলাম ও তারপর ● ক্যাটালোনিয়ার ভবিষ্যত ● সালিসবারি ঘটনা নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়া কূটনীতি যুদ্ধ

স্মরণিকা ২৬

● গিরিজা দেবী ● সুপ্রিয়া দেবী ● শশী কাপুর ● পন্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ● প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ● বেলা দত্ত ● যশবন্ত চ্যবন ● চন্ডী লাহিড়ি ● ভানু বসু ● এয়ার চিফ মার্শাল অর্জন সিংহ ● কালাচাঁদ দরবেশ

বিশেষ স্মরণিকা ৩০

● মানবাধিকারের মুক্ত কণ্ঠই আসমা জাহাঙ্গীর ● ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ ● দীপঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনাবসান আর্সেনিকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন যিনি ● অনিল কুমার নন্দী

প্রধান রচনা ৩৪

● জলাভূমি কমছে, বিপদগ্রস্ত শহর, নির্লিপ্ত নাগরিক — ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

বিশেষ রচনা ৩৬

● ব্রহ্মান্ডে ডানা মেললেন অধ্যাপক হকিং — জয়ন্ত ভট্টাচার্য

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৩৮

● দিনাজপুরের গত বছরের বন্যা এবং তার কারণ অনুসন্ধান — রূপক কুমার পাল ● শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব : অনুপ্রেরণায়, পথনির্দেশে আজও দীপ্যমান ! — অতনু চক্রবর্তী ● সাম্প্রতিক ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ — নীলকণ্ঠ আচার্য ● ত্রিপুরা : এক চমকের অভ্যন্তরে — রতন দাস ● মাথাভাঙ্গা ও চূর্নি নদী বাঁচাও আন্দোলন — স্বপন কুমার ভৌমিক ● বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী (প্রস্তাবিত) ● Small farmers go big with organic farming ● This simple technology has transformed Gujarat farmlands into an oasis – Kavita Kanan Chandra ● Retired teacher seeds organic farming In Odisha ● জৈব চাষে তাক লাগিয়ে, কৃষি-রত্ন গ্রাম্যবধূ কিরিন

ভ্রমণ ৫৯

● পেডং থেকে — পার্থময় চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৬০

● মাথাভাঙা, চূর্নী, ইছামতী বাঁচান — অনুপ হালদার ● বক্সা জঙ্গলে নানা প্রজাতির আরও কিছু বন্যপ্রাণীর হদিস — জয়া চক্রবর্তী ● নদীয়া জেলায় শান্তিপুর, চাকদা সমেত বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশ ধ্বংসের কাজ চলছে — গৌতম পাল ● পথের অধিকার, বন্য প্রাণ ও প্রগতি — রামজীবন ভৌমিক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৬৬

● রসায়নপ্রিয় লেখক ও তাঁর দুঃসহ অতীত — অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

অর্থনীতি ৬৮

● অর্থনীতির হালহকিকৎ

অর্ধেক আকাশ ৭৪

● গৌরী লঙ্কেশ কেন গৌরী লঙ্কেশ — নলিনী কৃষ্ণমূর্তি ● আমরা সবাই গৌরী — বাণীব্রত পাল ● আসমা জাহাঙ্গীরকে খোলা চিঠি — শুভাশিষ চট্টোপাধ্যায় ● জেল যাপনের কিছু কথা — কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৮৩

● জিডি বিড়লার ঘটনা এবং কিছু প্রশ্ন — শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ● এক নজরে প্রেসিডেন্সি — শরদ্বত সরকার ● উচ্চ শিক্ষার ক্রমাবনতি — সনাতন মুর্মু

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ৮৭

● ডেঙ্গু জ্বর — সঞ্জয় সেনগুপ্ত ● মোদি কেয়ার বা নমো কেয়ারের ঘোষণা — গৌতম মৃধা ● অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেক্শন (ARI) – স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জরায়ুর ক্যানসার প্রতিরোধী টীকা — স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় ● অক্টোবর বিপ্লব ও স্বাস্থ্য : একটি উপক্রমনিকা — অরুণ সিংহ ● World Health Day 2018: Theme : Universal health coverage : everyone, everywhere. Slogan : Health for All ● দুঃসময়ের লেখা — মৃত্যুঞ্জয়ী বাউরী

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১০৮

● চিকিৎসক নিগ্রহ বন্ধ হোক ● Press Release on 'National Medical Commission (NMC)' Bill From Resident Doctors' Association, AIIMS

খবরাখবর ১১১

■ **চিকিৎসকের আকাল :**

যেখানে হাজার জনসংখ্যায় একজন চিকিৎসক থাকা উচিত সেখানে গ্রামীন ভারতে ৫৯৫০ জনসংখ্যায় একজন পাশ করা চিকিৎসক, ২০০০০ জনসংখ্যায় একজন সরকারি চিকিৎসক, শহরে ৫৬০ জনসংখ্যায় একজন চিকিৎসক। গড়ে ১৬৪৭ জনসংখ্যায় একজন চিকিৎসক রয়েছে। ঘাটতি প্রায় ৫,৩২ হাজার। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে ৫১০০ জনসংখ্যায়, শহরে ৬৭৩ জনসংখ্যায় এবং শহর গ্রাম মিলে ১৬৪৭ জনসংখ্যা একজন করে পাশ করা চিকিৎসক আছেন।

মন্তব্য

- '' নোট বাতিলের যে সব লক্ষ্য ছিল, সে সব পূরণের আরও ভাল বিকল্প ছিল। ..... জাতীয় স্বার্থেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরের স্বাধীনতা রক্ষা জরুরি।" — **রঘুরাম রাজন**, প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা
- ''রাজন (অকাল) বিদায় দেশের বড় ক্ষতিগুলোর একটা।" — **কৌশিক বসু**, প্রাক্তন মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা
- '' নোট বাতিলের প্রয়োজন ছিল না। আমি থাকলে নোট বাতিল হতে দিতাম না।"— **বিমল জালান**, প্রাক্তন গর্ভনর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
- ''নরেন্দ্র মোদি সরকার ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" — **যশবন্ত সিনহা**, প্রাক্তন বিজেপি অর্থমন্ত্রী
- '' নোট বাতিল বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারী" .....আড়াইজন লোক সরকার চালাচ্ছে " — **অরুন শৌরি**, প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী
- ''অবশেষে জানা গেল নোট বাতিলের একমাত্র সুফল পেলেন কে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয়, গরীব কিংবা কৃষক নন। অমিত শাহের শাহ জয়।" —**রাহুল গান্ধী**, বিরোধী নেতা
- ''বিমুদ্রাকরণ প্রমাণ করেছে এটি কেবলই রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্তি যেখানে আসল অপরাধীরাই ছাড়া পেয়ে গেছে। এটি একটি সংগঠিত লুঠ এবং আইনসিদ্ধ ডাকাতি। ৮ অক্টোবর ভারতের একটি কালা দিন।" —**মনমোহন সিংহ**, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী।
- ''মুম্বাইয়ে বুলেট ট্রেন কে চেয়েছে? মোদীর স্বপ্নের জন্য সাধারণ মানুষের স্বপ্ন চুরমার করতে দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের মৌলিক পরিষেবার অর্থ নেই, অথচ কোটি কোটি টাকা দিয়ে বুলেট ট্রেন আনা হচ্ছে।" — **উদ্ধব ঠাকরে**, শিবসেনা প্রধান
- ''মুম্বাই-আমদাবাদ বুলেট ট্রেন অবাস্তব। মুম্বাই, চেন্নাই বা কলকাতার মত শহরের সাথে দিল্লীর বুলেট ট্রেন প্রয়োজন।" — **অরুন শৌরি**
- ''আমরা এক দেশ এক করের (জি.এস.টি.) কথা বলেছিলাম। এখন এক দেশ সাত রকম কর। কর আর হাজারো নিয়মের জঞ্জালে আমজনতা ও ব্যবসায়ীরা নাকাল।" — **রনদীপ সুরজেওয়ালা**, কংগ্রেস মুখপাত্র
- ''সিঙ্গাপুরের লোকে ৭% জি.এস.টি. দেয়। বিনামূল্যে চিকিৎসা পায়। ভারত সরকার ২৮% জি.এস.টি. নেয়, কিন্তু কেন বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে পারে না? আমরা ওষুধের জন্য ১২% জি.এস.টি. দিই, কিন্তু মদে জি.এস.টি. নেই। দেশের সরকারী হাসপাতালগুলোয় অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকে না।" —তামিল ছবি 'মোশার্ল'-এ বিজয় ওরফে **ভেট্টি**
- ''নোটবন্দির থেকেও বড় বিপদ হল, 'সেটা যে ভুলে তা স্বীকার করার ব্যর্থতা। আর এটাই ভবিষ্যতের নীতি সম্পর্কে লগ্নিকারী ও ব্যবসায়ীদের উদ্বেগে রাখছে। — **কৌশিক বসু**, অর্থনীতিবিদ
- 'বিজেপি আজ ওয়ান ম্যান শো, দু মেন আর্মি'।" — **শত্রুঘ্ন সিন্‌হা**, বিজেপি সাংসদ
- ''তৃণমূল কংগ্রেস এখন একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী যাকে চালাচ্ছেন এর প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। — **মুকুল রায়**, প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক, তৃণমূল
- ''১০ বছর আগে যখন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষকদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য চলচ্চিত্র উৎসবে মেতে ছিলেন। একইরকম ডেঙ্গিতে একের পর এক মানুষ মারা যাচ্ছে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাচ-গান- ভোজ-কার্নিভাল-চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে মেতে রয়েছেন। — **মুকুল রায়**
- ''জ্যোতিবসুর একটা অভ্যাস ছিল। পুঁজি সংগ্রহের নাম করে প্রায়ই তিনি লন্ডনে গিয়ে অবকাশ কাটাতেন। এখন সেই ব্যামোতে ধরেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রায়ই তিনি সপার্ষদ বিদেশে চলে যাচ্ছেন।" — **মুকুল রায়**
- ''সরকার কি জানে, নোট বাতিলের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের হার কি হয়েছে? কতজন কর্মী আত্মহত্যা করেছেন?"— **শ্যামাচরণ গুপ্ত**, বিজেপি সাংসদ
- ''কৃষকদের সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক নন। এখনও কৃষক আত্মহত্যা চলছেই।" —**নানা পাটোলে**, বিজেপি সাংসদ, পরে কংগ্রেসে যোগ দেন
- ''আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ফিল্মের জগৎ থেকে এসে আমি কেন অর্থনীতি নিয়ে মন্তব্য করছি। এখন উকিলবাবু (অরুন জেটলি) যদি অর্থনীতির কথা বলতে পারেন, টেলিভিশনের এক অভিনেত্রী (স্মৃতি ইরানি) যদি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী হতে পারেন, আর একজন চা-ওয়ালা যদি....এর বেশী আমি বলব না। কিন্তু এ-ই যদি হয় তাহলে আমি কেন অর্থনীতি নিয়ে মুখ খুলব না? আমার হৃদয়ের কথা বলছি। 'মন কি বাত' তো বলতে পারব না, কারণ তার পেটেন্ট অন্য কেউ নিয়ে রেখেছেন।" — **শত্রুঘ্ন সিন্‌হা**। বিজেপি সাংসদ
- ''রোজই পশ্চিমবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ কিংবা দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামগুলি থেকে দালালরা শিশু-কিশোরীদের তুলে এনে দিল্লী, হরিয়ানা, এমনকি কাশ্মীরে পাচার করে দিচ্ছে। একদল পৌঁছে যাচ্ছে মুম্বাই ও দুবাই হয়ে আরব মুলুকে।" —**ঋষিকান্ত**, শিশু ও কিশোরীদের উদ্ধার কাজে যুক্ত 'নারী শক্তি বাহিনী'র কর্তা
- ''দূর্নীতির বিরুদ্ধে মোদী সরকারের লড়াই ও পরিবর্তনের ডাক শুধু বিজ্ঞাপনী প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ।" —**অন্না হাজারে**, অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা
- ''পেশোয়াশাহীর ভিত্তি ছিল জাতিভেদ প্রথা। মোদিজীও তাই করে চলেছেন। আমার কাছে মোদী হলেন নিও লিবারেল পেশোয়া" —**জিগ্নেশ মেভানি**, দলিত নেতা
- ''ধর্ষণ অপরাধ। কিন্তু কেউ যদি কারও মন জয় করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাহলে সেটা তো অপরাধ নয়।" — **ক্যাথরিন দ্যুনভ**, বিশিষ্ট ফরাসী অভিনেত্রী

- ''মাদ্রাসাগুলি বিদ্যালয়ে পুর্ণগঠিত করে ধর্মনিরপেক্ষ, মূল শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে দিতে হবে।'' — **ওয়াসিম রিজভি**, কেন্দ্রীয় শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান
- ''দায়িত্ব নেওয়া আর দায়িত্ববোধ, অধিকার বোধ এক জিনিস নয়। ক্ষমতা থাকা আর ক্ষমতা দেখানো এক নয়।'' — **শঙ্খ ঘোষ**, বিশিষ্ট কবি
- মোদি সরকারের মন্ত্রী বলেছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা বাঁদরকে মানুষ হতে দেখেননি। কিন্তু স্যার আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে আমরা উল্টোটা দেখছি। অতীত খুঁড়ে এবং আমাদের প্রস্তর যুগে পাঠানোর চেষ্টা করে মানুষ বাঁদরে পরিণত হচ্ছে।...'' —**প্রকাশরাজ**, জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেতা।
- ''রোজগার নিয়ে সরকার দিশাহীন। চাকরি আর স্বরোজগারের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। পকোড়া বেচা চাকরি হলে তো ভিক্ষা করাও চাকরি।'' — **পি. চিদাম্বরম**, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী
- ''ধর্ষিতা হয়েও বা স্বামীকে হারিয়েও মহিলাদের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। মহিলারা শুধু যৌনসঙ্গী বা সন্তান উৎপাদক নন। হ্যাঁ তাদের গোটা জীবন যোনি আর তার বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে কেটে যায় না।'' — **স্বরা ভাস্কর**, অভিনেত্রী
- ''ভারতে বিলিয়নেয়ারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে লড়তে পারার মতো ক'টা পন্য আজ অবধি তারা তৈরি করতে পেরেছেন? ভারতের কর্পোরেট ক্ষেত্র আসলে একটা নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ বাজারের সুবিধা নিয়ে চলেছে। উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মুনাফা অর্জন করতে পারেনি।'' — **মৈত্রীশ ঘটক**, অর্থনীতিবিদ
- ''কাজ চাই। কারখানায়। নইলে বেকারত্বের খাদেই তলিয়ে যাবে ভারতীয় অর্থনীতির উড়ানের গল্প।'' — **পল ক্রুগম্যান**, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্

শোকজ্ঞাপন

- মেক্সিকোর ভয়াবহ ভূমিকল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা, পুয়েতোরিকো, সহ মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে ভয়ানক সমুদ্রঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে হতাহতদের প্রতি
- সাইবেরিয়ার কামেরোভা শহরে শপিং মল অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের প্রতি
- মেক্সিকো এবং ইরান-কুর্দিস্তানে ভূমিকম্পে হতাহতদের প্রতি
- সাইক্লোন অক্ষিতে কেরল, লাক্ষাদ্বীপ ও তামিলনাড়ুর মৃত ও হারিয়ে যাওয়া মৎস্যজীবীদের প্রতি
- সিরিয়ায় সিরিয় সরকার ও তুরস্কের সেনাবাহিনীর বোমা ও গোলা বর্ষনে হতাহতদের প্রতি
- কাঠমান্ডু, রাশিয়া সহ বিমান দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি

দাবী

- মন্দির-মসজিদ, গোরু-গোমূত্র নয়; সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সব হাতে কাজ ও উপার্জন চাই।
- চীন-পাকিস্থানের সাথে সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমন করো; কাশ্মীর, দন্ডকারণ্য, মনিপুর ও দার্জিলিঙে দমনপীড়ন বন্ধ করো।
- মানেসরের মারুতি কারখানার এবং কোয়েম্বাত্তুরের প্রিকল কারখানার শ্রমিকদের সাজা রদ করতে হবে।
- জি.এস.টি.-র নামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন করা চলবে না।

প্রাপ্তিস্থান :

বুক মার্ক ● একুশে ● পিপলস্ বুক সোসাইটি ● বইচিত্র ● ধ্যানবিন্দু ● পাভলভ ইনস্টিটিউট ● মনীষা, কলেজস্ট্রীট ● এস.কে.বুকস্, উল্টোডাঙ্গা ● বইওয়ালা, যাদবপুর ● প্রগ্রেসিভ বুক স্টল, রাসবিহারী ● কোলে বুক স্টল, বি.বা.দি.বাগ ● ঘুম নেই, সরসুনা ● পশ্চিমবঙ্গ গণসাংস্কৃতিক পরিষদ, ক্রীক রো ● ফামা, বেলেঘাটা ● নাগরিক মঞ্চ, আনন্দপুর, কলকাতা ● দেবাঞ্জলি, মাথাভাঙ্গা ● গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা, কোচবিহার ● সুমন গোস্বামী, আলিপুর দুয়ার কোর্ট ● জাতিশ্বর ভারতী ● লার্নি পয়েন্ট ● ওরিয়েন্টাল বুক স্টল, জলপাইগুড়ি ● দি বুকস্, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি ● ধানসিড়ি, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ ● অন্নপূর্ণা ● বুকল্যাণ্ডস, বালুরঘাট ● রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, গঙ্গারামপুর ● রূপান্তরের পথে, মালদা ● বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর ● কোরাস নাট্য গোষ্ঠী, কান্দী ● পত্রিকালয় ● ম্যাগাজিন কর্ণার, সিউড়ি ● সুবর্ণরেখা, শান্তিনিকেতন ● শ্যাম বুক স্টল, আসানসোল ● জয়া বুক স্টল, বি জোন, দুর্গাপুর ● খোয়াই ● সাহিত্য পরিষদ ● অপুর স্টল, বর্ধমান ● প্রয়াস মল্লভূম, লোকপুর ● হংসরাজ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ● দি বুক হাউস, কৃষ্ণনগর ● কপি সেন্টার, রাণাঘাট ● বিশুদার বুক স্টল, চাকদা স্টেশন ● বিজ্ঞানের দরবার, কাঁচড়াপাড়া ● সনৎ রায় চৌধুরী, ফুলপুকুর, চুঁচুড়া ● রেলওয়ে স্টেশন বুক স্টল,শ্রীরামপুর ● বারাসাত ● খড়দহ ● সোনারপুর ● উলুবেড়িয়া ● সরস্বতী বুক স্টল, নৈহাটী ● বাণীবিতান, ডায়মণ্ডহারবার ● যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং ● শ্রমজীবী হাসপাতাল, বেলুড়, সরবেরিয়া, শ্রীরামপুর, কোপাই, উখরা ও রাণাঘাট ● ভালোপাহাড়, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া ● শ্যামল ভট্টাচার্য্য, অখাউড়া, আগরতলা ● রোশনি, জামসেদপুর ● লিটল ম্যাগাজিন মেলা ● অকাদেমী চত্বর, প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবার।

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

এমিলি জেন ব্রন্টি (১৮১৮ - ১৮৪৮)

ভিক্টোরিয়ান রোমান্টিক যুগে এক গভীর, প্রাণস্পর্শী, প্রেমময়, আধ্যাত্মিক, প্রকৃতিপ্রেমী, নারীর স্বকীয়তা ও আবেগঘন বিষয়ের উপর লেখার জন্য কবি ও সাহিত্যিক এমিলি ব্রন্টি পরিচিত। ছয় ভাইবোনের মধ্যে 'জেন আয়ার' রচয়িতা শার্লোট, 'ওয়াদারিং হাইটস্,' রচয়িতা এমিলি এবং 'দ্য টেনেন্ট অফ ওয়াইল্ডফেল হল' রচয়িতা অ্যান তিন পরস্পর ঘনিষ্ঠ বোন তাঁদের লেখনির মাধ্যমে পরিচিতি রেখে গেছেন। তাদের একীকৃত কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। যাজক আইরিশ পিতা ও ইংরেজ ঘরনী মাতার সন্তান এমিলির জন্ম, বেড়ে ওঠা, শিক্ষা সবই উত্তর ইংল্যান্ডের সৌন্দর্যময় অথচ রুক্ষ মূর ও হিথ অঞ্চলে। মাঝে একবার বেলজিয়াম পর্ব ছাড়া। মাত্র ৩০ বছর বাঁচা অন্তর্মুখী শান্ত প্রকৃতির এমিলি সম্পর্কে খুব একটা জানা যায় না। জানা যায় তিনি ছিলেন সহজ সরল অথচ দৃঢ়চেতা এবং সাংগঠিত চার্চের বিরোধী। তাঁর দ্বিশততম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইভান সের্গেইভিচ তুর্গেনিভ (১৮১৮ - ১৮৮৩)

উনবিংশ শতাব্দীর সামন্ত ভূমিদাস প্রথা ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়ার পটভূমিকায় অগ্রনী লেখক। মস্কো, পিটার্সবার্গ ও বার্লিনে পড়াশুনা। শিক্ষক হিসাবে বরেণ্য সাহিত্যিক গোগোলের সংস্পর্শ, চিন্তাবিদ্ স্ট্যানকোভিচ ও বাকুনিনের সাথে আলাপ এবং চিন্তার জগতে ব্লা, প্রুধো ও হাইনের প্রভাব। তাঁর কালজয়ী উপন্যাসগুলিতে প্রেম, মৃত্যু ও ভাগ্য বার বার এসেছে। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য করুণ রস। 'দ্য ভার্জিন সয়েল', 'আ করেসপনডেনস্', 'দ্য টরেন্টস্ অফ স্প্রিং,' 'আ করেস পনডেন্স', 'অন দ্য ইভ'— মোট দশটি নাটক, ছটি উপন্যাস, প্রচুর ছোটগল্প ও স্মৃতিকথা লেখেন। তাঁর দ্বিশততম জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভীমা-কোড়েগাঁও যুদ্ধের (১৮১৮) দ্বিশতবছর

ভারতের প্রচলিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস নির্মাণে এই ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ অবহেলিত থেকে গেছে তাঁর ব্রিটিশ স্পর্শ ও নিচু বর্ণের মাহার জাগরণের জন্য। সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ক্ষমতার তখতে যখন শূন্যতা দেখা গেল তখন প্রবল শক্তিধর হয়েও মারাঠারা তা কাজে লাগাতে পারল না। বরং ধুরন্ধর কূটনীতি, উন্নত সামরিক শক্তি এবং প্রবল সাহস ও রণকৌশল ভর করে ব্যব্যসাদার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পেছন পেছন ইংরেজ রাজশক্তি অন্যান্য ইউরোপীয় এবং স্থানীয় শক্তি-গুলিকে পরাজিত করে এগিয়ে চলল, প্রথমে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত নিয়ন্ত্রণে এনে তারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে হাত বাড়াল। মারাঠাদের মধ্যেও তখন প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। পুনের পেশোয়া, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দৌরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড় ও নাগপুরের ভোঁসলেরা তখন পরস্পর বিবাদমান। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইংরেজ ততদিনে মহারাষ্ট্রের অনেকটা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। এক সময়ে মারাঠা নায়ক শিবাজী ও তার পরবর্তী পেশোয়াদের বিখ্যাত সেনবাহিনীর স্তম্ভ ছিল রণনিপুণ দলিত মাহার সৈনিকরা। তারাই পরবর্তিতে ব্রাহ্মণ্যবাদী পেশোয়াদের প্রবল অত্যাচারে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। পুনে চুক্তিতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ায় ক্ষিপ্ত পেশোয়া পুনের ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন। কিন্তু ৫ নভেম্বর ১৮১৭-র খাদকির যুদ্ধে ব্রিটিশের কাছে পরাজিত হয়ে সাতারায় পালিয়ে যান। এবার ব্রিটিশ ফৌজ কোঙ্কন ও সাতারার দিকে পা বাড়ায়। এবার পেশোয়া ইংরেজদের ঘেরাও এড়াতে নাসিকের দিকে খানিকটা এগিয়ে পুনরায় পুনো আক্রমণ করতে উদ্যত হন। খবর পেয়ে পুনের রেসিডেন্সি থেকে চারিদিকে বাহিনী চেয়ে পাঠানো হয়। শিরুর ঘাঁটি থেকে ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস স্টনটনের নেতৃত্বে বম্বে নেটিভ ফার্স্ট রেজিমেন্ট ও ম্যাড্র্যাস আর্টিলারির ৮৩৪ জন সৈন্য, যার ৫০০ পদাতিক, ৩০০ অশ্বারোহী ও ৩৪ জন গোলন্দাজ, এবং দুটি ছয় পাউন্ডের কামান নিয়ে রওনা হয়। কোম্পানীর সৈন্যরা ছিল মাহার, মারাঠা, রাজপুত, মুসলমান ও ইহুদী। তারা কোড়েগাঁওয়ের ভীমা নদীর প্রান্তে পৌঁছান। কোড়েগাঁওতে পেশোয়ার নেতৃত্বে বাপু গোখলে, আপ্পাদেশাই ও ত্রিম্বকজী দাঙ্গলের সেনাপতিত্বে অবস্থান করছিল ২৮ হাজার মারাঠা, গোঁসাই ও ভাড়াটে আরব মুসলমান সেনা। যাদের ২০, ০০০ অশ্বারোহী ও ৮,০০০ পদাতিক যোদ্ধা। সঙ্গে দুটি কামান। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে পেশোয়া পরাজিত হন। কোম্পানীর ২৭৫ ও পেশোয়ার ৫০০-৬০০ সৈন্য ভীমা-কোড়ে-গাঁওয়ের যুদ্ধে মারা যায়। এই যুদ্ধের পরই পেশোয়া শক্তি সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে বিথুরে ব্রিটিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই পট পরিবর্তনের যুদ্ধকে স্মরণ রাখতে ব্রিটিশ এক বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করে যেখানে ফলকে ১ জানুয়ারী ১৮১৮-র যুদ্ধে ৪৯জন কোম্পানীর নিহত যোদ্ধার নাম খোদাই আছে যার মধ্যে ২২ জন মাহার যোদ্ধা। পরে দলিত নেতা বি.আর.আম্বেদকর ১৯২৭-র ১ জানুয়ারী ভীমা- কোড়েগাঁও ঘুরে যান এবং সেই থেকে এই বিজয়স্তম্ভ মাহার জাগরণের, অহমিকার ও সমাবেশের কেন্দ্র। এ বছর ভীমা- কোড়েগাঁও স্তম্ভে দলিত সমাবেশে যাওয়ার পথে একটি মিছিল হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় ও একজন দলিত মারা যান যা মহারাষ্ট্রে জুড়ে নতুনভাবে জাত দাঙ্গার সূত্রপাত করে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

বিশিষ্ট পন্ডিত, সাহিত্যিক এবং বাংলা আধুনিক গদ্য রীতির পথপ্রদর্শক। চৌধুরীরা পাবনা থেকে এসে কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেন। প্রথমনাথ কৃষ্ণনগরও পিতার কর্মস্থান দিনাজপুরে পড়াশুনা সাঙ্গ করে কলকাতার

প্রেসিডেন্সি ও সেন্ট জেভিয়ারসে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তারপর ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন ও ফরাসী ভাষা শেখেন। তাঁর দাদা আশুতোষ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাকে এবং তিনি সত্যেন্দ্রনাথ কন্যা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানিকে বিয়ে করেন। তিনি বীরবল ছদ্মনামে ও নিজনামে 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন— 'জয়দেব', 'সনেট পঞ্চাশত', 'পদচরণ', 'খেয়াল খাতা', 'ফুলদানি' প্রভৃতি তাঁর লেখা কবিতা ও গদ্যের গ্রন্থাবলী। 'সবুজপত্র' নামক একটি সাড়া জাগানো উচ্চাঙ্গের কিন্তু অনিয়মিত পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর সার্ধশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮ - ১৯৩৬)

আসল নাম আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ। বিশিষ্ট রুশ সাহিত্যিক। তিন বছর বয়সে বাবা ও এগার বছর বয়সে মা মারা যান। তারপর ভ্রাম্যমান জীবন ও বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ। ঘুরতে ঘুরতে জর্জিয়ার রাজধানী টিবলিসে পৌঁছান এবং সেখানে 'ককেসাস' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এরপর তার একের পর এক জনপ্রিয় বই বেরোতে থাকে। রুশ সাংস্কৃতিক জগতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। আনন্ত চেকভ, লিও তলস্তয় প্রমুখের সাথে একসাথে কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল মার্কসবাদী সমাজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। ভ্লাদিমির লেনিন ও আলেকজান্ডার বগদানভের সংস্পর্শে বলশেভিক আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯০৫-র ব্যর্থ বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেন। এর মধ্যে তিনবার জেল খেটেছেন। ধর পাকড় এড়াতে ১৯০৫ এ ফিনল্যান্ড, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। এই পর্বে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মা'। তারপর সাত বছর ইতালিতে থাকেন। তিনি প্রচুর নাটক, গল্প ও উপন্যাস লেখেন। ১৯১৩ তে দেশে ফিরে এসে বলশেভিক বিপ্লব আয়োজনে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান প্রতিরোধে অংশ নেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেখক-শিল্পীদের স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে তাঁর আপত্তি ছিল। ১৯২১ এ আবার ইতালি চলে যান। ১৯৩২ এ স্তালিনের বিশেষ আমন্ত্রনে তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু ১৯৩৪ থেকে গৃহে অন্তরীন হন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জাতীয় বীর ও বর্ণময় চরিত্র গোর্কি ১৯৩৫ এ মারা যান। তাঁর সার্ধ শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইনগমান বার্গম্যান (১৯১৮ -২০০৭)

বিশ্ববরেণ্য সুইডিশ চিত্র-পরিচালক ও নাট্যকার। ধর্মীয় নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে মানুষ বার্গম্যান এক গ্রীষ্ম অবকাশে কৈশোরে জামার্নীতে পারিবারিক বন্ধুর গৃহে কাটান এবং সেখানে নাৎসীবাদ ও হিটলারের উত্থান লক্ষ্য করেন। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করে রক্ষণশীল বাবার সাথে সংঘাত করে নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৭০ টি নাটক মঞ্চস্থ করেন। এরপর অজস্র সিনেমা ও টিভি ফিল্ম পরিচালনা। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির মধ্যে 'দ্য সেভেনথ- সিল', 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ', 'পারসোনা', 'ক্রাইস অ্যান্ড হুইসপারস্', 'ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার' প্রসিদ্ধ। করফাঁকির অভিযোগে ১৯৭৫ এ গ্রেফতার হওয়ার পর বেশীরভাগ সময় জার্মানির মিউনিখে থাকেন। মৃত্যুর আগে সুইডেনের ফারো দ্বীপে ফিরে আসেন। তাঁর বর্ণময় জীবনে পঞ্চম স্ত্রী বিশিষ্ট অভিনেত্রী ইনগ্রিড ভ্যানে রোসেন এবং অন্যান্য সঙ্গীনী ও সন্তানের জনক বিশিষ্ট অভিনেত্রী হ্যারিয়েট অ্যানডারসন, বিবি অ্যানডারসন এবং লিভ উলম্যান। তাঁর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিন (১৯১৮ - ২০০৮)

ধীর প্রবাহিনী ডন নদীর স্নেহচ্ছায়াময় রস্টভের বাসিন্দা, সৈনিক পিতার পুত্র, গণিত ও পদার্থবিদ্যায় কৃতী ছাত্র ও স্নাতক আলেকজান্ডার সলঝেনিৎসিনের আগ্রহ ছিল মার্কসবাদ ও সাহিত্যে। অল্প কিছুদিন শিক্ষকতার পর নাৎসি আক্রমণে আক্রান্ত পিতৃভূমির যুদ্ধে লাল ফৌজে যোগদান করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য সন্মানিত হন ও পদোন্নতি পান। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে স্তালিনীয় স্বৈরাচারের সমালোচনা করায় তাঁকে করারুদ্ধ করে তীব্র অত্যাচার করা হয়। কয়েক মাস লাবইয়াঙ্কা ও বুটিরকি জেলে রাখার পর তাঁকে আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ার কুখ্যাত গুলাগ লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হল। তারপর তিন বছরের জন্য কাঝাখাসস্তানের নোঙরা ফেলার জায়গায়। প্রবল অত্যাচার আর কঠোর পরিবেশে শরীর ভেঙ্গে গেল। ক্যানসারে জর্জরিত হলেন। কিন্তু অসীম সংকল্পে লিখে যেতে লাগলেন রেজিমেন্টেড রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর অবর্ননীয় গণহত্যা আর অত্যাচারের দলিল। আর অদ্ভুতভাবে তা মনে রাখতেন, লিপিবদ্ধ করতেন, আর বোতলবন্দি করে পুঁতে রাখতেন মাটির তলায়। এভাবেই ভূমিষ্ট হয়েছিল, 'দ্য ফার্স্ট সার্কেল', 'ওয়ান ডে ইন দ্য লাইফ অফ ইভান দেনিসোভিচ', 'ক্যানসার ওয়ার্ড', 'গুলাগ আর্কিপেলাগো'। যদিও স্তালিনের মৃত্যু হয়েছে ১৯৫৩ এ। ক্রুশ্চেভের আপেক্ষিক মুক্ত হাওয়ায় তাঁর নির্দোষ প্রমাণিত হতে ও ছাড়া পেতে পেতে হয়ে গেল ১৯৫৭। নীরবে ১২ বছর লিখে গিয়েছেন সলঝেনিৎসিন। ৬০-র দশক থেকে তিনি উপন্যাসগুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলেন। ইভান দেনিসোভিচ 'নভিমির' এ প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তুলল। কিন্তু ততদিন ক্রুশ্চেভ গৃহবন্দী হয়ে ক্ষমতায় এলেন রক্ষণশীল ব্রেজনেভ। আবার সেনসর। সলঝেনিৎসিন গোপনে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন পান্ডুলিপি। ইউরোপ থেকে প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিল। ১৯৭০ এ পেলেন নোবেল পুরস্কার। প্রবল নজরদাঁড়ি, বিরোধিতা ও সেনসরের পর বিতাড়িত হলেন দেশ থেকে ১৯৭৪এ। প্রথমে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্ক-ফুর্ট, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন্টে সাধকের মত নীরবে লেখালেখি করে কাটিয়ে দিলেন। 'আগষ্ট ১৯১৪', 'রেড হুইল' তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। তিনি যেমন স্বৈরাচারী সোভিয়েত শাসনের বিরোধী ছিলেন, তেমনই বিরোধী ছিলেন

পশ্চিমী ধনতন্ত্রের। ১৯৯৪ এ সোভিয়েত-উত্তর রাশিয়ায় ফিরে আসেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অসীমা চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭ - ২০০৬ খ্রী:)

বিশিষ্ট ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী। তাঁর মূল বিষয় ছিল জৈব রসায়ন ও ফাইটো মেডিসিন। একাধারে নিরলস গবেষক। নিষ্ঠাবান অধ্যাপিকা, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান রচয়িতা। কোন ভারতীয় মহিলা হিসাবে প্রথম ডক্টর অফ সায়েন্স। চিকিৎসক ইন্দ্রনারায়ন মুখোপাধ্যায় ও কমলা দেবীর সন্তান মেধাবী ছাত্রী অসীমা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স স্নাতক হন। এম.এস.সি ও ডি.এস.সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসক-নসিন, ম্যাডিসন, ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে যুক্ত হন। দেশে ফিরে প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইউনিভারসিটি কলেজ অফ সায়েন্সের অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে যুক্ত হন। ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজ উদ্ভিদ, মৃগী, ম্যালেরিয়া ও ক্যানসারের ওষুধ প্রভৃতির উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এলকালয়েড যৌগের উপর ৪০ বছর গবেষণা করে ৪০০-র মত প্রবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের জার্নালে প্রকাশ করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ও খয়রা অধ্যাপিকা থেকে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার, পদ্মভূষণ, সাম্মানিক রাজ্যসভার সাংসদ সহ বহু সম্মান ও পুরস্কার পান। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তাঞ্জোর বালাসরস্বতী (১৯১৮ - ১৯৮৪)

কর্ণাটকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ঘরানার বিশ্ববরেণ্য শিল্পী। ভারতনাট্যম্ নৃত্যধারার দিকপাল। তিনি ছিলেন সাতপ্রজন্মের বিখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির গীত-নৃত্যচর্চ্চার ধারক। তাঁর পূর্বমাতা পাপাম্মাল ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর তাঞ্জাভুর রাজপুরীর প্রধান সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী। বালাসরস্বতীর দিদিমা বীনা ধান্নামাল ও মা জয়াম্মাল দুজনেই ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পী এবং এদের প্রশিক্ষণে কঠোর অনুশীলনে বালা সরস্বতীর শিল্পী হয়ে ওঠা। সাত বছর বয়স থেকে নৃত্য প্রদর্শনীর শুরু হলেও তাঁর ঘরানার প্রথম শিল্পী হিসাবে ১৯৩৪ এ কলকাতায় নৃত্যকলা পরিবেশন করেন। উদয়শঙ্করের চোখে পড়ে যান এবং উদয়শঙ্কর তাকে দেশে বিদেশে পরিচিত করিয়ে দেন। এরপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। মাদ্রাজে নৃত্য আকাদেমী তৈরী করেন এবং নিজের ট্রুপ তৈরী করে ব্যাপকভাবে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে তিনি প্রবল জনপ্রিয়তা পান। তিনি কর্নাটকী ঘরানার সঙ্গীতের মধুর সুধার সাথে ভারতনাট্যমের অসামান্য শৈলীর এক চমৎকার সংমিশ্রন ঘটান। তিনি সঙ্গীত কলা শিক্ষামনি, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী, সঙ্গীতা কলানিধি পদ্মভূষন, পদ্মবিভূষণ প্রমুখ বহু সম্মান পান। তাকে নিয়ে প্রচুর বই ও চিত্রনির্মাণ হয়েছে তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের তৈরী ডকু ফিল্ম 'বালা' উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯ - ২০০৩)

''ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'', ''একটু পা চালিয়ে ভাই, বিপ্লব আসছে'' চমৎকার ও জনপ্রিয় লাইনের স্রষ্টা, 'কল্লোল' পরবর্তী যুগের আধুনিক বাংলা কবিতা রীতির পুরোধা, পদাতিক ও প্রতিবাদের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরে জন্ম ও শিক্ষা, পরে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ফিলজফিতে অনার্স-সহ স্নাতক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ-ইস্পাহানি সৃষ্ট ভয়াল দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুর ঢল, রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজপথে প্রতিদিন কোন না কোন বিক্ষোভ— এমন আবহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বামপন্থী আন্দোলনে অংশগ্রহন ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। ১৯৪০ এ ছাত্রাবস্থায় প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'পদাতিক'প্রকাশ। বিপ্লবী লেখক সোমেন চন্দের খুনের প্রতিবাদে 'অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যান্ড আর্টিস্ট এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহন ও কারাবাস। সহকর্মী ও স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বজবজে পাটশিল্পের শ্রমিকদের সাথে থাকা ও তাদের মধ্যে কাজ করা। প্রসিদ্ধ 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা। সত্যজিৎ রায়ের সাথে 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা। বাচ্চাদের জন্য মজার ছড়া লিখতেন। 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ', 'ফুলফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'এইভাই,' 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে,' 'বাঙালীর ইতিহাস', 'দেশ বিদেশের রূপকথা' তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ। পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমী, আনন্দ, সোভিয়েতল্যান্ড নেহরু, দেশিকোত্তম, জ্ঞানপীঠ, পদ্মভূষণ প্রভৃতি সম্মান। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গুরু বিপিন সিংহ (১৯১৮ - ২০০০)

বিশিষ্ট মনিপুরি নৃত্যশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের পরে তিনি মনিপুরি নৃত্যধারাকে দেশ ও বিদেশে জনপ্রিয় করে তোলেন। সাবেকি চিকিৎসক ও গায়ক পিতা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে তিনি ছোটবেলা থেকেই নাচ গান শিখেছিলেন। পরে মনিপুরি নৃত্য ঘরানা আহরণ ও বিস্তারে মনযোগী হন। এই পর্যায়ে তাঁর প্রধান শিক্ষক গুরু আমুদন শর্মা। পান মনিপুর রাজার সহায়তা। তিনি হয়ে ওঠেন মনিপুরি নৃত্যের অন্যতম শিল্পী। শুরু করেন তাঁর নৃত্য শিল্পের প্রদর্শন। সাবেকি, প্রথাগত ও উপজাতি নৃত্যধারার বৈশিষ্ট্যকে তিনি মনিপুরি নৃত্য ঘরানায় আত্মস্থ করেন। মন্দির প্রাঙ্গনের কৃষ্ণ আরাধনার অঙ্গ রাসনৃত্যকে আধুনিক মঞ্চের উপযোগী করে তোলেন। ইম্ফলে শুরু করেন গোবিন্দ নর্তনালয়

ডান্স একাদেমি। পরে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কলকাতা ও মুম্বাইতে। পুরুষতন্ত্রের নিগড় ভেঙ্গে মেয়েদের শৌর্যপূর্ণ নৃত্য 'পুংচোলর্ম' শেখান। তাঁর হাতে তৈরী হয় দর্শনা জাভেরি, কলাবতী দেবী, বিনোদিনী দেবী, গুনেশ্বরী দেবী, প্রীতি প্যাটেল, শ্রুতি ব্যানার্জী, লতাসনা দেবী, লায়লী বাসু, ইন্দ্রানী দেবী, মনোরমা দেবী, পৌষালী চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী রায়, বিম্ববতী দেবী, রঞ্জিনী বসুর মত নামী নৃত্যশিল্পী। আমৃত্যু মনিপুরি ভাষা ও সাহিত্য, মৌখিক ঐতিহ্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। পেয়েছেন সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, সারঙ্গদেব ফেলোশিপ, কালিদাস সম্মান প্রভৃতি। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮ - ২০০১)

বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শক্তিশালী গদ্যকার। কোন পাবলিসিং হাউস, বড় পত্রিকা, কোন গোষ্ঠীর সহায়তা ছাড়া, কোন সম্মান বা আর্থিক প্রাপ্তির কথা না ভেবে ক্রমাগত বুনে গেছেন সমাজের ভালমন্দ চরিত্রের এক একটি অন্যস্বাদের গল্প ও উপন্যাস। 'গড় শ্রীখন্ড', 'নীল ভুঁইয়্যা, 'রাজনগর', 'মধু সাধু খাঁ, 'তন্দ্রসিদ্ধি',.....। প্রথমে কোথাও না হলেও পরে অবিরত প্রকাশিত হয়েছে 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ', 'ক্রান্তি', 'গণবার্তা', 'বারোমাস', 'কৌরব', 'লাল নক্ষত্র' প্রভৃতি পত্রিকায়। পাবনার মানুষ। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার শহরে পড়াশুনা ও পরে থিতু হওয়া। পাকশি রেল কলোনিতে পোষ্ট অফিসে চাকরি করেছেন। অল্পসময়ের জন্য কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রচুর পড়তেন ও লিখে যেতেন। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক শহরে নিরালায় থেকে অনলসভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জালি।

লেফটেনান্ট ইন্দ্রলাল রায় (১৮৯৮-১৯১৮)

জন্ম কলকাতায়। অসাধারণ বৈমানিক ও যোদ্ধা। ব্রিটিশ রয়াল ফ্লাইং কর্পসে কর্মরত ছিলেন। মাত্র ১৭০ ঘন্টা বিমান চালিয়ে ১০টি বিমানযুদ্ধে জেতেন। এর সাথে বিপক্ষের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে দেন, পাঁচটি যুদ্ধ বিমান অকেজো করে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে মারা যান।

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৬৮ খ্রীঃ)

বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকার থেকে হিমাচল, হরিয়ানা, উত্তবপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের বিজেপি সরকার গুলি অজস্র প্রকল্প ও কর্মসূচীর এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামকরণ করেছেন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নামে, সাড়ম্বরে দীর্ঘসময় ধরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পালিত হল তাঁর জন্মশতবর্ষ। তাঁর সম্পর্কে তাই আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। তাদের দল ও ধারায় কোনও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা নেই, সাভারকার থেকে বাজপেয়ী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন প্রভৃতি অভিযোগের পাশাপাশি সামন্ত জাতীয়তাবাদী, সমাজবাদী ও বামপন্থীদের শিবির থেকে সঙ্ঘ পরিবারকে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে হয় যে তাদের কোনে তাত্ত্বিক নেতা নেই। তাই কংগ্রেস শিবির থেকে নেহরু বিরোধী গুজরাতি বল্লভভাই প্যাটেলকে (অবশ্যই নরম হিন্দু জাতীয়তাবাদী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বিপ্রতীপে) হাইজ্যাক করার চেষ্টা এবং পণ্ডিত দীন দয়ালকে বেশী বেশী করে আঁকড়ে ধরা।

উত্তরপ্রদেশের মথুরায় জন্ম দীনদয়াল উপাধ্যায় বাল্যে অনাথ হলে মামাবাড়িতে মানুষ। তাকে রাজস্থানের ঝুনুঝুনুর পিলানিতে পড়তে পাঠানো হয়। দশম শ্রেণীতে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে মেধাবী দীনদয়াল প্রথমে সেখানে বিড়লা কলেজে, পরে কানপুরে সনাতন ধর্ম কলেজ থেকে ইংরেজীতে স্বর্ণপদক নিয়ে স্নাতক, আগরার সেন্ট জনস্ কলেজ থেকে মাষ্টারস্ এবং প্রয়াগ থেকে বি এড ও এম এড ডিগ্রি লাভ করে কর্মজগতে প্রবেশ করেন। সনাতন ধর্ম কলেজে পড়ার সময় তিনি 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের (আর.এস.এস)' প্রতিষ্ঠাতা কে.বি. হেডগেয়ারের সংস্পর্শে এসে সহপাঠী সুন্দর সিংভান্ডারীর সাথে আর.এস.এস.এ যোগ দেন। তিনি রাজস্থানের সিকারের রাজার ও বিড়লার বৃত্তি ছেড়ে, চাকরির জগৎ ও মামাবাড়ির দাবী সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের চেষ্টা থেকে সরে আর.এস.এস-র সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪২এ নাগপুর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্প্রচারক হয়ে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর জেলার দায়িত্ব নেন। ক্রমে ক্রমে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের যুগ্ম প্রান্ত প্রচারক হয়ে ওঠেন। ১৯৪০ থেকেই তিনি মাসিক ' রাষ্ট্র ধর্ম' এবং পরে সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' ও দৈনিক 'স্বদেশ' পত্রিকা বের করে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে থাকেন। ১৯৫১ তে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বলরাজ মধোকরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করলে এটিকে সঠিক হিন্দুত্ববাদী ধারায় পরিচালিত করতে দীনদয়ালজীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫৩এ কাশ্মীরের কারাগারে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হলে তাঁর উপরই মূল দায়িত্ব পরে। তিনি ১৫ বছর জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মাধোক ও বাজপেয়ীর মধ্যবর্তী সময়ে সভাপতিও নির্বাচিত হন। তিনি স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, ধনতন্ত্র ও পশ্চিমী উদারতাবাদের বিরোধিতা করে সনাতনী হিন্দু ধর্ম; ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি এবং 'প্রকৃত স্বরাজে'র ভাবনা প্রচার করেন। বিশিষ্ট মার্কসীয় তাত্ত্বিক মানবেন্দ্র রায়ের 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম' দর্শনের বিপরীতে 'ইনট্রিগাল হিন্দুইজমে'র দর্শন সামনে নিয়ে আসেন। হিন্দি বলয়ে ৫০ ও ৬০ -র দশকে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনে এবং আর. এস. এস —জনসঙ্ঘের সম্প্রসারণে নানাজী দেশমুখ, সুন্দর সিংভান্ডারী ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি প্রচুর বই লেখেন এবং আর.এস.এস-জনসঙ্ঘ নিষিদ্ধ হওয়ার সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গোপন প্রচার চালাতেন ও মুখপত্র প্রকাশ করতেন। ১৯৬৮ তে ট্রেন যাত্রার সময়ে মোগলসরাই স্টেশনে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

ভারত ও বাংলার প্রাচীনতম আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণার কেন্দ্র। ভগিনী নিবেদিতা, অবলা বসুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্বজ্জনদের সহযোগিতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে ১৯৩১ অবধি পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। 'সিস্টেম বায়োলজি'র উপর পথিকৃত গবেষণা ছাড়াও পদার্থ বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ ও জীবনবিদ্যা, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, বায়োইনফরমেটিকস্, পরিবেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গবেষক ও আবিস্কারকরা ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু (উদ্ভিদের প্রাণের সন্ধান), দেবেন্দ্র মোহন বসু (ফোটোগ্রাফিক ইমালসন প্লেট আবিস্কার), শম্ভু নাথ দে (কলেরা টক্সিন আবিস্কার), শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় (ফিউশন নিয়ে গবেষণা), গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। কলকাতার মানিকতলার ক্যাম্পাস পরে বর্দ্ধিত হয়।

স্যফ্রোজেট অধিকার অর্জনের শতবর্ষ

মর্গানের গবেষণার উপর ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন মানব সভ্যতার আদি সাম্যবাদীস্তরে মানবসমাজ ছিল নারী কেন্দ্রিক বা নারী মুখ্য। পরিবর্তিতে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশেষত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের যাঁতাকলের সাহায্যে গোষ্ঠী, সামন্ত, রাজতন্ত্রের যুগে সমাজে পুরুষতন্ত্র জাঁকিয়ে বসে। আর সেই থেকেই নারীর সমানাধিকার অর্জনের লড়াই শুরু যা ইতিহাসে অবহেলিত ও অনুল্লেখিত। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে নারীর সমতা ও অধিকার অর্জনের লড়াই সংগঠিত রূপ পায়। ফরাসী বিপ্লবে ওপ্যারিস কমিউন- প্রতিষ্ঠায় নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে। অসংখ্য কবিতা, সাহিত্য, দেলক্রোয়ারদের অক্ষয় শিল্পকলায় যা অমর হয়ে আছে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে স্প্যফ্রোজেটস্ অর্থাৎ বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটের অধিকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। এমিলিন প্যানকহার্স্টের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ডব্লিউ.এস.পি..ইউ জোরালো আন্দোলন শুরু করেন। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ১৮৮১ তে ম্যান অফ আইলে বিষয় সম্পত্তির মালকিন মহিলারা, ১৮৮৩ তে নিউজীল্যান্ডে, ১৮৮৫ তে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায়, ১৮৬৯ তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উমিং ও ১৮৭০ এ ইউটাতে মহিলারা আংশিক ভোটাধিকারের অধিকার অর্জন করে। এরপর বহু জঙ্গী লড়াই, অনশন-কারাবরনের পর গ্রেট ব্রিটেনে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহিলাদের ভোটাধিকারের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ক্রমে অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বীকৃতি লাভ করে। ক্রিস্টাবেল প্যানকহার্স্ট, সোফিয়া দিলীপ সিং, এমিলি ডেভিসন, ফে হাবার্ড প্রমুখরা ছিলেন স্প্যফ্রোজেটস্ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী ও সংগঠক।

'স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নে'র সম্পাদকমণ্ডলী পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছে। পাঠানোর ঠিকানা : ssunnnayan@gmain.com

হারিয়ে যাওয়া মেয়েরা

- ভারতে নারী : পুরুষ অনুপাত : ৯৪৩:১০০০ (২০১১ জনগণনা)
- হারিয়ে যাওয়া মেয়ের সংখ্যা (পড়ুন হত্যা করা কন্যা ভ্রূণের) : ৬ কোটি ৩০ লক্ষ
- জীবিত দু'কোটি ১০ লক্ষ কন্যা পিতামাতার কাছে অনভিপ্রেত
- ভারতে শ্রমজীবী মহিলার সংখ্যা ১০ বছরে ১২% কমে দাঁড়িয়েছে ২৪%
- ৩৩.৪% ছেলের তুলনায় ৬৫% ১৫- ১৮ বছর বয়সী মেয়ে স্কুলে-কলেজে যায় না, গৃহস্থালী বা অন্য কায়িক কাজ অথবা ভিক্ষা করে।
- ৭৯ লক্ষ কন্যা বাল্যেই ১০ বছর বয়সের আগে বিবাহিত, যারা মোট বিবাহিতা নারীর ২.৩%। ৩০.২% বিবাহিতা নারীর বয়স ১৮ বছরের কম।
- জাতীয় জিডিপির ১৭% ভারতীয় নারীর অবদান, যেখানে বিশ্ব জিডিপির ৩৭% মহিলাদের অবদান।

মেয়েদের মধ্যে সেরা

মেয়েদের সার্বিক পরিস্থিতি বিচারে দেশে কেন্দ্রের 'জেন্ডার ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স', সমীক্ষায় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীনতার প্রভৃতি সূচকে সেরা গোয়া, কেরল ও মিজোরাম। প্রথম আটটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে সিকিম ও মনিপুর। দেশে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সবার সেরা মনিপুর। ঐ সমীক্ষায় সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে অরুনাচল প্রদেশ, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ।

কবিতা

কুয়ঁর নারায়ণের কবিতা :

[হিন্দি সাহিত্য জগতে কুঁয়র নারায়ণ (১৯২৭-২০১৭) এমন একজন সাহিত্যকার ছিলেন যার তুলনা খুব কম পাওয়া যায়। শান্ত সুন্দর, অনুভূতিপ্রবণ অথচ সত্যর প্রতি সদা জাগরুক এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বর্তমান কালের রাজনৈতিক সর্বগ্রাসী মনোভাবও তার সমাজ সচেতনতাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ফলে সম-সাময়িক ভাবনাও অত্যন্ত সহজভাবে তাঁর লেখনীকে ছুঁইয়ে গেছে। ৯০ বছর বয়সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কলম ছিল গতিশীল। যদিও সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরণ তবুও মূলতঃ তিনি ছিলেন কবি। অতি সম্প্রতি আমরা তাঁকে হারিয়েছি। নীচে তাঁর রচিত বাংলায় রূপান্তরিত কয়েকটি কবিতায় রইল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী। কবিতাগুলির জন্য হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্তান'-এর কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার রইল। অনুলিখন : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়]

অযোধ্যা

হে রাম ,
জীবন যথার্থই কটু স্বাদে ভরা।
যদিও তুমি এক মহাকাব্যের নায়ক
কিন্তু তোমারও ক্ষমতা নেই-
যা দিয়ে বিবেকহীনকে জয় করা যায়।
সংখ্যায় দশ/ বিশ নয়।
লাখ লাখ তার মাথা
আর তার দ্বিগুণ আছে হাত।
তবু তো জানা নেই, বিভীষণ এখন কার পক্ষে?

এর থেকে বড় দুঃখের আর কী হতে পারে!
সসাগরা সাম্রাজ্য তোমার আজ সীমিতমাত্র
এক সংকীর্ণ বিতর্কিত স্থানে।
এ অযোধ্যা এখন আর তোমার অযোধ্যা নয়।
আজ এই স্থান যোদ্ধাদের লঙ্কাপুরি।
'মানস' তোমার 'চরিত' নয়
খালি ভোটের দুন্দুভি।

হে রাম,
কোথায় সে ত্রেতা যুগ।
আর কোথায় আজকের হুজুগ!
কোথায় তুমি পুরুষোত্তম শ্রী রাম।
তার চেয়ে বেশী আজ নেতাদের মান।
তাই তোমার কাছে সবিনয় নিবেদন—
ফিরে যাও তুমি।
খুঁজে নাও কোনও ধর্মগ্রন্থ।
কিংবা পুরানের কোনও পাতা
থাকো সেখানেই, সকুশল-সপরিবারে।

হে রাম,
আজকের বনভূমির কোথাও
নেই সেই তপোভূমি
যেখানে ডেরা বেঁধেছিলেন
সেদিনের বাল্মীকি মুনি
এঁকেছিলেন রামায়ণ কথা,
চিরকালীন, চিরন্তন ভারত মানস গাঁথা।।

দেওয়াল

এখন আমি একটা ছোট্ট ঘর,
আর অনেক বড় পৃথিবীতে বাস করি।
একসময়, আমি অনেক বড় ঘর-
কিন্তু একটা ছোট্ট পৃথিবীতে বাস করতাম।

ছোট্ট দেওয়াল অনেক সময়
অনেক বড় ফারাক গড়ে দেয়।
আর দেওয়ালটাই যদি না থাকে
তবে তো একটা ঘরে-
গোটা পৃথিবীটাই এঁটে যায়।।

বিশ্বাসী/অবিশ্বাসী

একবার খবর রটে গেল—
যে কবিতা আর নেই।
খবরটা এত ছড়িয়ে পড়ল
যে সত্যি সত্যি কবিতা আর নেই।
বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে নিল
কবিতার মৃত্যু হয়েছে।
কিন্তু সন্দেহ করার লোক কিছু থাকেই,
তাদের সন্দেহ, এটা নাকি হতেই পারেনা।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানা-পোড়োনে।
শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল কবিতার প্রাণ।
এমনটা কিন্তু এই প্রথম নয়
অবিশ্বাসীদের একটা ছোট্ট সংশয়
বাঁচিয়ে দিয়েছে প্রাণ
অনেক নিরপরাধ তত্ত্বের।।

সাহিত্য

ভারতলক্ষ্মী নিবেদিতা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

চরিত্র পরিচয় :

১। খোকন :	এক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র
২। মা :	ঐ ছাত্রের মা
৩। ক্রিস্টিন :	নিবেদিতার বান্ধবী এবং সহকর্মী
৪। অবলা/ বো :	জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী
৫। নিবেদিতা :	পূর্বাশ্রমের নাম মার্গারেট নোবেল
৬। জগদীশচন্দ্র :	স্বনামধন্য বিজ্ঞানী
৭। রবীন্দ্রনাথ :	পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা
৮। শ্রী অরবিন্দ :	জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু
৯। বারীন্দ্র :	শ্রী অরবিন্দর ভাই এবং বিপ্লবী
১০। যতীন্দ্র :	বরোদা রাজের দেহরক্ষী ও বিপ্লবী
১১। হেমচন্দ্র, সত্যেন :	অনুশীলন সমিতির সদস্য ও বিপ্লবী
১২। সতীশচন্দ্র :	ঐ তৎসহ স্বামী বিবেকানন্দর ভাই
১৩। ভূপেন্দ্র নাথ :	ঐ
১৪। চিত্তরঞ্জন :	ব্যারিস্টার ও জননেতা
১৫। নীলরতন :	স্বনামধন্য চিকিৎসক
১৬। টেগার্ট :	ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার
১৭। ফুলার :	পূর্ববঙ্গের লে: গর্ভনর
১৮। র‍্যাটক্লীফ :	স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক
১৯। জাজ :	আলিপুর আদালতের বিচারক
২০। গোপাল :	পথচারি ও দর্শক
২১। রাখাল :	”
২২। ব্রজদুলাল :	”

।। প্রথম দৃশ্য।।

(একটা পড়ার ঘর। সেখানে এক ছাত্র বেশ জোরে জোরে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে।)

(চরিত্র : খোকন এবং তার মা)

Background- এ ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী instrument-এ বাজছে)

খোকন : ৫ই জুলাই ১৯০২ সাল। স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণে চলে গেছেন। গুরুজী নেই, এই সংবাদ পেয়ে সেই ভোরেই বেলুড়ে ছুটে এলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর মনের মাঝে ভীড় করে আসছে গুরুর সাথে পথ চলার কত আনন্দ ঘন স্মৃতি। এবার গুরু যাত্রা করলেন অমৃতলোকের পথে। কিন্তু তাঁর সামনে মর্তলোকের এখনো অনেক পথচলা বাকি। গুরুকে ছাড়াই সে পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। আর সে পথ চলায় ছিন্ন হল রামকৃষ্ণ সংঘের সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্কেরও। সংঘের সাথে তাঁর বিচ্ছেদের কারণ কী শুধুই আদর্শতগত! নাকি তার মাঝেও লুকিয়েছিল অন্য কোনও কৌশলও। হয়তো বা এটাও ছিল গুরুর নির্দেশ।

মা : এত মন দিয়ে কী পড়ছিস খোকন?

খোকন : মা, স্যার বলেছেন এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পরীক্ষায় সিস্টার নিবেদিতার ওপর প্রবন্ধ রচনা আসার সম্ভাবনা খুব। তাই বলেছেন খুব ভাল করে পড়তে।

মা : ও তাই বুঝি; সে তো আসতেই পারে। এ বছর তো ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ-শতবর্ষ। কিন্তু তুই এরকম শেষ থেকে পড়ছিস কেন? প্রথম দিকের কথা কিছুই তো শুনলাম না।

খোকন : শেষ থেকে কী বলছ মা। এ তো সবে শুরু। সবাই তো চেনা নিবেদিতাকে নিয়ে লিখবে। আমি লিখব অন্য নিবেদিতার কথা। যার কথা খুব কম লোকে জানে। ইনি কেবল স্বামীজির ভগিনী নিবেদিতা নন। ইনি হলেন রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা। শ্রী অরবিন্দের অগ্নিকন্যা, আর জগদীশচন্দ্রের The Lady with the lamp। ইনি হলেন ভারতলক্ষ্মী নিবেদিতা।

মা : সত্যি! সে তো তাহলে আমারও জানা নেই। খোকন তাহলে আমাকেই প্রথম শোনা তোর সেই ভারতলক্ষ্মীর কথা।

খোকন : সত্যি সত্যিই তুমি শুনবে মা! তাহলে শোনো।

***** Scene changing music *****

।। ২য় দৃশ্য।।

(জগদীশচন্দ্রের ল্যবরেটরি)

(চরিত্র : নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র ও ক্রিস্টিন)

নিবেদিতা : প্রফেসর বোস, আমরা দুজনে আপনার গবেষণাগারে এসেছি আপনার আবিস্কারকে সামনে থেকে দেখার জন্য। আপনি নাকি বিনা তারে তরঙ্গ নিক্ষেপ করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের একেবারে চম্‌কে দিয়েছেন! তা আমাদের যদি-সেসব একটু দেখান; ও হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই-ইনি হলেন আমার বান্ধবী ক্রিস্টিন। আর ক্রিস্টিন ইনি হলেন বিজ্ঞানী প্রফেসর জগদীশ চন্দ্র বোস।

জগদীশ : আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন ভগিনী নিবেদিতা, আর আপনিও সিস্টার ক্রিস্টিন। কিন্তু আমি তো এখন সেসব নিয়ে গবেষণা করছিনা। তাই তেমন কিছু দেখাতেও পারছিনা। আমায় ক্ষমা করবেন নিবেদিতা।

ক্রিস্টিন : What!! গবেষণা করছেন না! কিন্তু কেন? সারা পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা আপনার Next experiment-এর Result-এর জন্য Eagerly wait করছেন। আর আপনি তা বন্ধ করে দিলেন।

জগদীশ : হ্যাঁ, সিস্টার, আমি এখন অন্য গবেষণায় মন দিয়েছি।

নিবেদিতা : অন্য গবেষণা! সেটা কী বিষয়ে?

জগদীশ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে বিশেষ বিশেষ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় জড়, উদ্ভিদতন্তু ও প্রাণীপেশী প্রায় একইভাবে সাড়া দেয়। এমন কী, বারংবার উদ্দীপনায় তারা ক্লান্তও হয়ে পড়ে।

ক্রিস্টিন : How strange! আপনি পাগল হয়ে যাননি তো!

নিবেদিতা : উত্তেজনায় উদ্ভিদ সাড়া দেয়! ক্লান্তিবোধ করে! এসব তো প্রাণের অনিবার্য লক্ষণ! উদ্ভিদের মত জড়পদার্থে সেইসব লক্ষণ ধরা পড়ে আপনার যন্ত্রে? এ তো স্বামীজির কথা। তাঁর মুখে শুনেছি অদ্বৈত দর্শনে নাকি বলেছে সর্বভূতে একই চৈতন্যের প্রকাশ। এ তো আপনার রেডিও তরঙ্গের থেকেও অনেক বড় আবিষ্কার।

ক্রিস্টিন : প্রফেসর বোস, আপনি যা বলছেন আমাদের তা এখন দেখাতে পারবেন?

জগদীশ : কেন পারবোনা, এখনি তার প্রমাণ পাবেন।

নিবেদিতা : কিন্তু শুধু দেখালে তো হবেনা। আপনি যা বলছেন তা সত্যি হলে এখনি তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিজ্ঞান পত্রিকায় তা প্রকাশিত করতে হবে। না হলে এ আবিষ্কার চুরি হয়ে গেলে ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই মহান কৃতিত্ব বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতিই পাবেনা।

জগদীশ : কিন্তু আমার মনের ভাবনাকে আমি লিখব কি করে? সে তো ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। সে যে অসম্ভব।

নিবেদিতা : কেন আমি তো আছি। আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মতো আপনার ভাবনাকে লেখায় রূপ দেবে। জগতের কাছে প্রমাণ করে দেবে যে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র পরাধীন দেশের নাগরিক হলেও বিজ্ঞান চর্চায় অনেকের থেকেই শ্রেষ্ঠ।

জগদীশ : তা যদি হয় সিস্টার, না, না সিস্টার নয়, সিস্টার নয়। বয়সে ছোট হলেও আজ থেকে তুমি আমার জননী। আমার ভাবনা তবে তোমার লেখনীকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করুক।

নিবেদিতা : বেশ তবে আজ থেকে তুমিও আমার 'খোকা'।

ক্রিস্টিন : মাতা-পুত্রের এই পবিত্র মিলনে আমি থাকলাম Eye witness।

দৃশ্যান্তর—

***** Scene changing music *****

।। ৩য় দৃশ্য।।

(মেদিনীপুর রেল স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম)

(চরিত্র : সতীশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ, সত্যেন, নিবেদিতা)

(উপলক্ষ্য : অনুশীলন সমিতির প্রথম শাখা স্থাপন)

সতীশচন্দ্র : ছেলেরা, আজ ১৯০৩ সালের জুন মাসের প্রথম রবিবার। আমাদের অনুশীলন সমিতির পক্ষে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। গতবছর কলিকাতায় যার প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ মেদিনীপুরে তার প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। কলিকাতা থেকে সিস্টার নিবেদিতা আসছেন তার শুভ উদ্বোধন করতে। তোমরা দেখবে তাঁর যেন কোনও অসম্মান না হয়।

হেমচন্দ্র : সতীশদা, তুমি আমাদের সমিতির কমান্ডার। তোমার আদেশই শেষ কথা। কী বলো ভূপেন্দ্র!

ভূপেন্দ্র : হেম, সতীশদা মিছেই এত চিন্তা করছেন। নিবেদিতা মোটেই বিদেশিনী নন, একান্তই ভারতীয়। দেখনা এক লহমায় কেমন সবাইকে আপন করে নেন।

সতীশচন্দ্র : ঠিকই বলেছ ভূপেন। তবে কিনা এটাই আমাদের সাথে ওনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কিনা!

সত্যেন : শুনেছি উনি নাকি বাংলাতেই কথা বলেন। এমন কী রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করে বিদেশের সাহিত্যমহলে খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। এসব সত্যি নাকি ভূপেন্দ্র?

ভূপেন্দ্র : শুধু কাবুলিওয়ালা গল্পই নয় সত্যেনদা। উনি রামপ্রসাদী শ্যামা সঙ্গীতের পুরো অনুবাদ করেছেন ইংরাজীতে। এমন কী সাধক কমলাকান্তের গানও।

হেমচন্দ্র : সত্যি কোনও বিদেশিনী ভারত তথা ভারতীয়দের জন্য এতটা করছেন এটা ভাবাই যায়না।

সতীশচন্দ্র : আঃ হেম, তুমি বারবার বিদেশিনী কথাটা ব্যবহার করছ কেন? দেখছনা ঐ শব্দটা শুনলেই ভূপেন কেমন বিরক্ত হচ্ছে।

সত্যেন : ঠিকই বলেছেন সতীশদা, ভূপেন্দ্র হল গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই। তার সামনে নিবেদিতাকে বারবার বিদেশিনী বলে অভিহিত করলে রাগ তো করবেই।

ভূপেন্দ্র : যাক গে, এসব কথা বাদ দাও সত্যেন দা। কিন্তু স্টেশনে আজ এত মানুষ যাদের মধ্যে মহিলাও কম নয়। এরা এসেছে কেন?

হেমচন্দ্র : এরা এসেছে কাছ থেকে মেমসাহেব দেখবে বলে। একে মেমসাহেব তার ওপর সে নাকি বাংলা বলে।

সতীশচন্দ্র : নাঃ, হেম খালি ভূপেনের পেছনে লাগবেই। ওসব কথা এখন থাক। ঐ দেখ নিবেদিতার ট্রেন ঢুকে পড়েছে। ছেলেরা সবাই যে যার দায়িত্ব ঠিক ঠাক পালন কর। Attention।।

(ট্রেনের হুইসল থামার শব্দ)

সকলে : সিস্টার নিবেদিতা— হিপ, হিপ হুররে। Commander সতীশচন্দ্র বসু হিপ, হিপ, হুররে। অনুশীলন সমিতি-হিপ-হিপ-হুররে। সিস্টার নিবেদিতা হিপ,হিপ হুররে।

নিবেদিতা : থামুন, সকলে থামুন। এমন করলে আমি ফেরৎ ট্রেনে কলিকাতায় ফিরে যাব। (বেশ জোরের সাথে)

সতীশচন্দ্র : কেন সিস্টার, আমাদের কি কোনও ভুল হয়ে গেছে?

নিবেদিতা : এ কেমন জয়ধ্বনি, যেখানে কেবল ব্রিটিশদের অনুকরণ করা হচ্ছে। হিপ-হিপ-হুররে বলে তো ব্রিটিশরা আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। ভারতীয়রা কেন তাদের অনুকরণ করবে?

হেমচন্দ্র : কি করবো সিস্টার, আমাদের যে নিজস্ব কোনও জয়ধ্বনি নেই।

নিবেদিতা : নেই না, দাঁড়ান, আমায় একটু ভাবতে দিন।... হ্যাঁ আসুন তবে আমার সাথে গলা মিলিয়ে বলুন— ওয়া গুরুজী কি ফতেহ্। বোল বাবুজী কী খালসা।

সকলে : ওয়া গুরুজী কি ফতেহ্। বোল বাবুজী কী খালসা।।

নিবেদিতা : ওয়া গুরুজী কি ফতেহ্, বোল বাবুজী কী খালসা।

সকলে : ওয়া গুরুজী কী ফতেহ্ বোল বাবুজী কী খালসা।।

নিবেদিতা : ওয়া গুরুজী কি ফতেহ্, বোল বাবুজী কী খালসা।

সকলে : ওয়া গুরুজী কি ফতেহ্, বোল বাবুজী কী খালসা।।

নিবেদিতা : ধন্যবাদ, আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সতীশচন্দ্র : আসুন ভগিনী, আপনার সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। এ হলো হেমচন্দ্র কানুন গো, ইনি হলেন সত্যেন বসু, আর এ হলো.....

নিবেদিতা : ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। Younger brother of Swami Vivekananda। একে আমি খুব চিনি। তা আপনাদের কার্যক্রমের আয়োজন সম্পূর্ণ তো!

হেমচন্দ্র : হ্যাঁ সিস্টার। আমাদের কার্যক্রম পাঁচদিন ধরে চলবে। শরীর চর্চা, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধর পাশাপাশি প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় দেশ-মাতৃকার উপর আপনার Lecture থাকবে।

নিবেদিতা : সে সব তো ঠিক আছে হেমবাবু; কিন্তু এসব করে তো লোককে বেশীদিন সমিতিতে ধরে রাখতে পারবেন না। এসবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উদ্যোগের কথা কিছু ভেবেছেন? বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য —যেমন চড়কা-কাটা, কাপড় বোনা, সেলাই করা এইসব কিছু।

সতীশচন্দ্র : এ ব্যাপারটাতো ভেবে দেখা হয়নি সিস্টার।

নিবেদিতা : তাহলে ভাবুন সতীশবাবু। সময় কিন্তু বেশী নেই। আর গোপনীয় ব্যাপারটা কতটা তৈরি? (গলা নামিয়ে)

সত্যেন : ব্যবস্থা হয়েছে সিস্টার। শ্রী অরবিন্দ সুদূর বরোদা থেকে একটা রাইফেল পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেটা চালনা শেখানোর লোক কই?

নিবেদিতা : কেন সত্যেনবাবু আমিতো আছি। শুনুন, শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েদেরও আমি বন্দুক চালাতে শিখিয়ে দেব। দেখবেন, এরপর তারাও আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য লড়বে।

ভূপেন্দ্র : কিন্তু সিস্টার, পুলিশের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যে ওরা কিছু একটা আঁচ করতে শুরু করেছে। যা করার খুব সাবধানে করতে হবে।

নিবেদিতা : ভয় নেই ব্রাদার। পুলিশ আমাকে এখনো সন্দেহের তালিকায় রাখেনি।

দৃশ্যান্তর—

***** Scene changing music *****

।। ৪র্থ দৃশ্য।।

(বরোদায় শ্রী অরবিন্দর বাসভবন)

(চরিত্র : শ্রী অরবিন্দ, বারীন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা)

যতীন্দ্র : দাদা, সিস্টার খবর পাঠিয়েছেন যে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন।

অরবিন্দ : হ্যাঁ, ভাই যতীন, আমিও তারই অপেক্ষায় রয়েছি।

বারীন্দ্র : দাদা শুনলাম, নিবেদিতা বরোদা রাজপ্রাসাদে আসবার পথে দেশীয় কুটির দেখে How beautiful ! বলে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন, আবার College building-এর

ইউরোপীয় স্থাপত্য দেখে 'What an ugly pile' বলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন এবং তা শুনে এক আমাত্য নাকি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "Mr. Arabindo is she mad?"

অরবিন্দ : ভাই বারীন রাজ অমাত্যরা তো আর্ট সম্বন্ধে ক-অক্ষর গো মাংস।

(ঈষৎ হেসে) নিবেদিতার দৃষ্টি তারা পাবে কোথা থেকে?

যতীন্দ্র : কিন্তু দাদা নিবেদিতা এই দৃষ্টি পেলেন কোথা থেকে?

অরবিন্দ : নিবেদিতা কে তোমরা জাননা যতীন্দ্রনাথ। তিনি হলেন 'Kali the Mother" গ্রন্থের রচয়িত্রী। যে বইটি এখন সারা দেশের বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরছে। আরে ঐ তো তিনি এসে পড়েছেন।

নিবেদিতা : আমার প্রণাম গ্রহণ করুন শ্রী অরবিন্দ, আর আপনারাও।

অরবিন্দ : আপনাকেও আমাদের প্রণাম সিস্টার। পরিচয় করিয়ে দিই, এ হলো আমার ছোট ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। আর এ হলো বরোদা- রাজ্যের প্রধান দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারীন্দ্র ও যতীন্দ্র : প্রণাম সিস্টার।

নিবেদিতা : প্রণাম, কিন্তু শ্রী অরবিন্দ একথা তো বললেন না যে এরা দুজনেই আপনার প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির সদস্য।

অরবিন্দ : আপনি দেখছি সবই জানেন।

নিবেদিতা : শুধু এটুকুই নয়, আমি এও জানি যে আপনারই নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় সার্কুলার রোডে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর আপনি সেখানে গিয়ে হেমচন্দ্রের একহাতে গীতা আর অন্যহাতে তরবারী দিয়ে তাঁকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষাও দিয়েছেন।

যতীন্দ্র : সিস্টার আপনি এতকথা জানলেন কী করে?

নিবেদিতা : ভয় পাবেন না যতিনবাবু। মেদিনীপুরে আমি আপনাদের কাজটাকে আরো কিছুটা এগিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার রেখে আসা বন্দুক দিয়ে আমি শুধু ছেলেদের নয় মেয়েদেরও ফায়ারিং করা শিখিয়ে এসেছি।

বারীন্দ্র : তবে তো দাদার বিপ্লব-ভাবনায় আপনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন।

নিবেদিতা : কিন্তু শ্রী অরবিন্দ এত দূরে বসে তো বাংলায় বিপ্লব সংগঠিত করা যাবেনা। আপনি হলেন ভাবীযুগের দেশনায়ক। আপনাকে বাংলায় দরকার আপনি কলকাতাতে আসুন।

বারীন্দ্র : দাদার পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক। পশ্চিমে বরোদা থেকে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত মাকড়সার জালের মত সমিতির জাল বিছিয়ে তাতে বেছে বেছে সদস্য নেওয়া হবে। সেনাবাহিনীর ভারতীয় যোদ্ধাদের সাথেও থাকবে যোগাযোগ। তারপর একসাথে গ্রামে-শহরে-নগরে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের আগুন।

নিবেদিতা : চমৎকার পরিকল্পনা! কিন্তু এইভাবে আড়ালে থেকে তা কবে সম্পন্ন হবে?

অরবিন্দ : আমার প্রকাশ্যে আসার সময় হয়নি। তাই আড়াল থেকেই কাজ করছি। কিন্তু প্রকাশ্যে কাজ করার তেমন লোক কোথায়?

নিবেদিতা : কেন? আমি তো আছি, আমায় দিতে পারেন আপনার সে কাজের ভার। আপনি পরিকল্পনা তৈরি করুন। সে কাজে আপনি দক্ষ। কিন্তু তাঁকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে অভিজ্ঞতার দরকার তা আমার আছে শ্রী অরবিন্দ।

যতীন্দ্র : সিস্টার আপনি এ কী বলছেন! জানেন সে কাজে বিপদের কী সাংঘাতিক ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

নিবেদিতা : বিপদের ভয় পেলে তো আর নামা যাবে না ভাই।

অরবিন্দ : আপনার ক্ষমতা আমি জানি সিস্টার। এও জানি যে স্বামী বিবেকানন্দর আগেও আপনার এক গুরু ছিলেন। তিনি আপনার রাজনৈতিক গুরু। রাশিয়ার মহাবিপ্লবী পিটার ক্রপটিন। তার হাতেই আপনার বিপ্লবের হাতে খড়ি।

নিবেদিতা : ছিলেন কেন বলেছেন? তিনি এখনো আমার রাজনৈতিক গুরু।

অরবিন্দ : বেশ তো, তবে আপনিই নেতৃত্ব দিন আমার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের।

নিবেদিতা : না, সেটা সম্ভব নয়। স্বামীজী বলে গেছেন যে কোনও বিদেশির মাধ্যমে নয়, ভারতীয়দের মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে ভারতীয়রাই।

অরবিন্দ : বেশ তবে এস যতীন এস বারীন, আমরা সিস্টারের হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করি আজ থেকে ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আমরা তার জন্যই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলাম। বন্দেমাতরম।

সকলে : বন্দেমাতরম।।

অরবিন্দ : বন্দে মাতরম।

সকলে : বন্দেমাতরম।

অরবিন্দ : বন্দেমাতরম।

সকলে : বন্দেমাতরম।

দৃশ্যান্তর—

***** Scene changing music *****

।। ৫ম দৃশ্য।।

(শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি মহলের পদ্মাবক্ষে বজরা)

(চরিত্র : রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, অবলা বসু)

জগদীশ : কবিবর, এবার শিলাইদহে এসে আমরা খুব আনন্দ করলাম। বিশেষতঃ পদ্মাবক্ষে বজরায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এমন অনাবিল সঙ্গ আমার বহুদিন মনে থাকবে।

রবীন্দ্র : শুধু তোমাদের আনন্দের কথা বলছ কেন বিজ্ঞানী। আমিও কি কম আনন্দ অনুভব করলাম। তোমার সঙ্গ না হয় মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, অবলাকে নিয়ে এই যে অবকাশ যাপন আমার কাছে তা খুবই অর্থবহ মনে হয়েছে।

জগদীশ : এটা খুবই ভাল বলেছ কবি-'অর্থবহ'। সত্যি এখানে নিবেদিতাকে ক্রিস্টিন সহ আমন্ত্রণ করাটা খুবই প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্র : সেবারে বুদ্ধগয়ায় যে ঘটনাটা ঘটল। তার ওপরে আমাদের তো কোনও হাত ছিলনা। তবুও পরে মনে হয়েছে চেষ্টা করলে মনান্তরটা হয়তো মেটানো যেত।

জগদীশ : মনান্তর তো ছিলনা, ছিল মতান্তর। বৌদ্ধ মন্দিরের অধিকার বৌদ্ধদের হাতে থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। তা নিয়ে হিন্দুদের মাতব্বরী মেনে নেওয়া যায়না। কিন্তু সিস্টার তো মানতে চায়না। সে মন্দিরের কর্তৃত্ব শৈব মোহান্তদের হাতে রাখার পক্ষপাতি।

রবীন্দ্র : আচ্ছা বিজ্ঞানী তোমার মনে আছে বুদ্ধগয়ায় এক সন্ধ্যায় আমরা সকলে মন্দিরের চাতালে বসেছিলাম। এক ভিক্ষু তার ধূপ-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় ''ওং মনিপদ্মে হুম'' বলে ধর্ম চক্র আবর্তন করে যাচ্ছিল আর তাতে পরিবেশটা কেমন পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। আর তারপরই ঢাক- ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টার তীব্র শব্দে শৈব মোহান্তদের আরতি কিরকম কর্ণ-বিদারক লেগেছিল।

জগদীশ : মনে নেই আবার। তুমি কবি। তাই সেদিনের সেই স্মৃতিকে তুমি অমলিন করে রেখেছ তোমার 'পূজারিনী' কবিতায়। আমার সে ক্ষমতা নেই। তবে সবই মনে আছে।

রবীন্দ্র : অথচ দেখ, সেকথা বলতেই নিবেদিতা আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তারপর তো আর আমার সাথে কথাই বলেনি।

জগদীশ : যাক সেসব মিটে গেছে। ঐ দেখনা, তিনজনে কেমন পল্লীর মেয়ে-বৌদের সাথে গল্প করতে করতে এই জলযানের দিকেই আসছে।

রবীন্দ্র : এই যে অবলা, এসো এসো। তারপর তোমাদের প্রভাতকালের পল্লীভ্রমন হল কেমন?

অবলা : ওঃ, খুব মজা হয়েছে। সিস্টার তো গ্রামে গিয়ে মেয়েদের সাথে ঢেঁকিতে ধান কুটেছে আর ক্রিস্টিন কুলোয় করে ধান ঝাড়তে গিয়ে সারা মুখ একেবারে ধূলোয় মাখামাখি।

ক্রিস্টিন : বো, তুমি খালি আমাদের কথা বলছ। আর তুমি যে গোশালায় ঢুকে গরুর দুগ্ধ দোহন করতে গিয়ে Milk Can টা উল্টে দিলে- সেটা তো বলছ না।

অবলা : হ্যাঁ, ক্রিস্টিন, কিন্তু সেটাতে তোমাদের দেখতে গিয়ে হলো। নাহলে ও আর এমন কী কাজ?

নিবেদিতা : বো, আর বলার দরকার নেই। কারণ মিথ্যে বলা তোমার আসেনা। মিথ্যে বললেই তোমার মুখ লাল হয়ে যায়।

ক্রিস্টিন : O.God! Really বোর Face Reddish হয়ে গেছে।

অবলা : সিস্টার ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

জগদীশ : ঠিক আছে। ঠিক আছে। বুঝতে পারছি তোমাদের পল্লীভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে।

ক্রিস্টিন : কেবল Gayful নয় প্রফেসর খুব Sweety ও হয়েছে।

রবীন্দ্র : তা সেটা কীরকম ক্রিস্টিন।

অবলা : পল্লীর লোকেরা তো আমাদের ছাড়তেই চাইছিলনা। সিস্টারকে সবাই 'সাধুমা' বলে ডাকছিল। গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়াল। মেয়েরা গুড়-মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের খাঁজা, কদমা-বাতাসা আরো কত কি দিল।

জগদীশ : ইস সঙ্গে না গিয়ে খুব ভুল করে ফেললাম দেখছি!

নিবেদিতা : দুঃখ করো না খোকা, তোমাদের জন্যও নিয়ে এসেছি। সব ক্রিস্টিনের ঝোলায় ভরা আছে।

রবীন্দ্র : সত্যি, এমন একটা সুন্দর সকালে এমন গুনিজনসঙ্গে পদ্মার বুকে ভাসতে ভাসতে মনে হয় যেন কোন আনন্দলোকে পৌঁছে গেছি।

নিবেদিতা : কবি, আজ এই পদ্মার বুকে ভাসতে ভাসতে আপনার লেখা একটা গল্প শোনাতে হবে।

অবলা : হ্যাঁ, সেই 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটা। যতবার শুনি মনে হয় আরো একবার শুনি।

নিবেদিতা : না, ওটা নয়, নতুন কোনও গল্প।

রবীন্দ্র : বেশ, তবে গল্প নয়, 'গোরা' উপন্যাসের খসরার শেষটুকু তোমাদের শোনাব। ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে বেরোচ্ছে বটে, কিন্তু শেষটুকু ঠিক করে উঠতে পারছিনা। এখানে তোমার মতামতটা নেওয়াটা খুব জরুরী। তবে এখন নয়, বিকেলে গোধূলির আলোতে।

ক্রিস্টিন : খুব ভাল। Then সকালের মতা বিকেলটাও খুব আনন্দে কাটবে। এখন বরং একটা Tagore song হোক।

রবীন্দ্র : বেশ অবলা তবে একটা গান ধরো।

অবলা : কবিবরের যখন ইচ্ছে, তখন তো গাইতেই হয়। (গান) আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় .....

*** **Scene changing music** ***

।। ৬ষ্ঠ দৃশ্য।।

(দার্জিলিং এ জগদীশচন্দ্রের বাড়ি)

(চরিত্র : অবলা, নিবেদিতা, ডঃ নীলরতন সরকার, চিত্তরঞ্জন)

অবলা : ডক্টর সরকার কেমন দেখলেন সিস্টারকে?

নীলরতন : এখন আগের থেকে ভালো। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে। একে টাইফয়েড, তার উপর Acute Brain Fever। নীলরতন সরকারের চিকিৎসা নয়, সিস্টার এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন বসু পরিবারের সেবা-যত্নে।

অবলা : ডক্টর ভাগ্যিস আপনার কথায় সিস্টারকে দার্জিলিং-এ নিয়ে এসেছিলাম। ওঃ, কী দিনগুলোই না গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল আর বুঝি ধরে রাখা গেলনা সিস্টারকে। সারদা মা খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন তাঁর আদরের খুকীকে। কিন্তু সে তাকে চিনতেই পারলনা দেখে তাঁর কী হাপুসনয়নে কান্না!

জগদীশ : তবে ডাক্তার, শুধু পরিবার নয়। সে সময় মহামতি গোখলেও দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন সিস্টারের রোগশয্যার পাশে।

চিত্তরঞ্জন : সিস্টার কেমন আছেন এখন?

জগদীশ : আরে দেশবন্ধু যে! আসুন, আসুন। সিস্টার এখন একটু ভালো আছেন। ওদিকে কলিকাতার খবর কী? কার্জন তো শেষপর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ করেই ছাড়ল।

চিত্তরঞ্জন : ওসব কথা এখন থাক।

নীলরতন : হ্যাঁ, সিস্টারের কানে গেলে তিনি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। তেমনটা হলে কিন্তু বিপদ আরো বাড়বে।

নিবেদিতা : না দেশবন্ধু, উত্তেজিত আমি হবনা। আপনি আমায় সব বলুন, নাহলে আমি উৎকণ্ঠিত থাকবো। সেটাও কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

চিত্তরঞ্জন : বেশ তবে শুনুন। ৭ই আগষ্ট টাউনহলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিশাল জনসভা হয়েছে। বাংলার সব বড় বড় নেতৃত্বই তাতে যোগ দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্র থেকে তিলকও এসেছিলেন। সেখানে সারা দেশ জুড়ে বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।

নীলরতন : তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ কাজটি করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি জাতি-ধর্ম নিবির্শেষে ঐদিন রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একটি সুন্দর গানও রচনা করে তাতে সুর দিয়েছেন। ছেলেরা সেই গান গেয়ে কলিকাতার পথে মানুষের হাতে হাতে রাখী বেঁধেছে।

নিবেদিতা : বাঃ, এইজন্যই তো রবীন্দ্রনাথ। তা আপনারা কেউ শোনাতে পারবেন আমায় সেই গান।

জগদীশ : অবলা, তুমি চেষ্টা করে দেখবে নাকি?

অবলা : সেভাবে তো শুনিনি, তবু চেষ্টা করছি। তবে বাকিরাও গলা মেলান।

গান (সকলে) বাংলার মাটি, বাংলার জল...

নিবেদিতা : বা, বা, বা, বাঃ যেমন কথা তার তেমন সুর। দেশবন্ধু আমরাও করবো প্রতিবাদ সভা। কবির সুরে কবির গানে দার্জিলিং টাউন হলে আমরাও করবো রাখীবন্ধন উৎসব। ব্যারিষ্টার আপনি হবেন সভাপতি।

চিত্তরঞ্জন : সে না হয় হবে। কিন্তু তার আগে আপনাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে তো।

নিবেদিতা : আমি সুস্থ হয়ে গেছি ব্যারিষ্টার। আপনি দিন ঠিক করুন। কংগ্রেসের নেতারা সমতলে যে আন্দোলন শুরু করেছেন সে আন্দোলন আমরা ছড়িয়ে দেব পাহাড়েও। কিছুতেই বাংলা ভাগ হতে দেবনা।

নীলরতন : কিন্তু চিকিৎসক হিসাবে আমার একটা অভিমত আছে। তা হলো আপনার শরীর কিন্তু এখনো সেরে ওঠেনি। এ অবস্থায় পরিশ্রম, উত্তেজনা একেবারেই ভাল নয়। আপনার এখন পরিপূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আপনি বিদেশে চিকিৎসা করাতে পারেন।

নিবেদিতা : ডক্টর, শরীর আগে না দেশ? দেশবন্ধু দিন ঠিক করে দিলে সবাই আপনারা আসুন রাখীবন্ধন উৎসবে। আমার নিমন্ত্রণ রইল।

***** Scene changing music *****

।। ৭ম দৃশ্য।।

দৃশ্যান্তর

(বেনারস কংগ্রেস অধিবেশন)

(চরিত্র : বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, ভূপেন্দ্র, সতীশচন্দ্র)

বারীন্দ্র : ভাই ভূপেন্দ্র,বেনারস শহরটাকে দেখেছ। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে একেবারে ভোল পাল্টে গেছে।

ভূপেন্দ্র : হবে না কেন বল বারীন! এবারের এই অধিবেশনের সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের সিস্টার। উনি এবারের পরিচালন কমিটির সর্বেসর্বা।

বারীন্দ্র : কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছেনা। নিবেদিতা আমাদের মতই পূর্ণ স্বরাজে বিশ্বাস করেন। অথচ এবারে কংগ্রেস সভাপতি হলেন নরমপন্থী গোখলে। তাহলে নিবেদিতা গোখলের জন্য এতটা উদ্যোগী হয়েছেন কেন?

ভূপেন্দ্র : শুধু গোখলেকেই দেখলে বারীন। তিনি তো এখনো কাশীতে এসেই পৌঁছাননি। তার আগেই দেখ সিস্টারের তিল-ভান্ডেশ্বর গলির বাড়িতে সমস্ত চরমপন্থী, নরমপন্থী, মধ্যপন্থী নেতাদের ভীড় লেগেই রয়েছে।

হেমচন্দ্র : শুধু তাই নয়, স্টেটসম্যানের এডিটর র‍্যাটক্লীফ সাহেব, 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার রামানন্দবাবু সহ অনেক নামকরা পত্রিকার Editor দের তো ঐ বাড়িতে যাতায়াত লেগেই আছে। আর তাছাড়া ঐ পত্রিকাগুলোতে মাঝে মাঝেই An English Observer-এর কলমে যে Article গুলো বার হচ্ছে সেগুলোই বা লিখছে কে?

সতীশচন্দ্র : সব কিছু কি আর খালি চোখে দেখা যায় হেম? কিছু কিছু বুঝে নিতে হয়।

বারীন্দ্র : কী বলছেন সতীশদা! তার মানে নিবেদিতাই বকলমে...

সতীশ : বোঝ মন যে জান সন্ধান।

ভূপেন্দ্র : আসলে সিস্টার চান না যে কংগ্রেসের মত এতবড় একটা পলিটিকাল প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র জেদাজেদিতে ভেঙ্গে যাক। আর এটা তো মানবে যে গোখলে নরমপন্থী হলেও একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাছাড়া ব্রিটিশ গর্ভমেন্টের ওপর ওনার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই যে আমরা কাজ করার জন্য যেটুকু খালি জায়গা পাচ্ছি তার জন্য অনেকটাই সিস্টারের প্রভাবে গোখলের অবদান আছে।

সতীশচন্দ্র : আমার মনে হয় নিবেদিতা গোখলেকে চাপে রাখবে বঙ্গভঙ্গ এবং বয়কট আন্দোলন নিয়ে কংগ্রেসকে সক্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে।

বারীন্দ্র : হেম, দেখ দেখ; সভাপতি গোখলেকে নিয়ে জুড়িগাড়ি অধিবেশন মঞ্চের কাছে এসে পড়েছে। নিবেদিতা নিজে তার হাতে রুপোর গ্লাসে দুধ তুলে দিলেন সাথে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। গলায় পড়িয়ে দিলেন ফুল-কর্পূরে গাঁথা বিশ্বনাথের আশির্বাদী মাল্য। আরে! আরে! জুড়িগাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে ভলান্টিয়াররা নিজেরাই সভামঞ্চের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে গোখলের গাড়িকে। কিন্তু কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

সকলে : জয়, কংগ্রেস সভাপতি মহামতি গোখলের জয় জয়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জয়। জয়, ভারতের জয়। জয়, ভারতমাতার জয়। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম।

***** Scene changing music *****

।। ৮ম দৃশ্য।।

দৃশ্যান্তর

"কলিকাতার বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ি।"

(চরিত্র- শ্রী অরবিন্দ ও নিবেদিতা)

অরবিন্দ : সিস্টার এবার আমাদের প্রত্যাঘাতের সময় এসেছে। বিনা বিচারে ব্রিটিশ সরকার লাজপত রায়, অজিত সিং, কৃষ্ণ মিত্রের মত চরমপন্থী নেতাদের নির্বাসনে পাঠিয়েছে। তাদের অপরাধ তারা অন্যায়ভাবে বর্ধিত কৃষিকর দিতে কৃষকদের নিষেধ করেছিলেন। এবং তার স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

নিবেদিতা : হ্যাঁ, শ্রী অরবিন্দ। একইভাবে জামালপুরে ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রতিবেদন যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ করেছিল বলে ভূপেন্দ্রনাথের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিকার চাই। আর কথা নয়। এবার No more words, Let us deeds, deeds and deeds।

অরবিন্দ : শুধুমাত্র গুটিকয় বন্দুক-পিস্তলে আর কাজ হবে না। এখন চাই বোমা! আধুনিক বোমা বানাবার কৌশল আমাদের আয়ত্ব করতেই হবে।

নিবেদিতা : ঠিক, তবে তা করতে গেলে আমাদের ছেলেদের বিদেশে পাঠাতে হবে। এমন দেশে যেখানে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে তারা সহায়তা পাবে।

অরবিন্দ : হেমচন্দ্র কানুনগো আর উল্লাসকর দত্তর বোমা বানানোর প্রতি খুব উৎসাহ আছে। হেমচন্দ্রকে এজন্য প্যারিসে পাঠালে কেমন হয়?

নিবেদিতা : একেবারে Perfect choice। প্যারিসে হেমচন্দ্রের কাজ করতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই ব্যাপারটা আমি দেখব।

অরবিন্দ : দেশবাসীর ওপর এই সরকার চরম অত্যাচার করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। শুধুমাত্র 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়ার জন্য ১২ বছরের বালক সুশীল সেনের মুখ তারা চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। আর কংগ্রেসীরা এখনো পড়ে আছে আবেদন- নিবেদনের নীতি নিয়ে। সুরাট কংগ্রেসে তো এবার চরম গোলমাল হয়েছে। Audiance থেকে সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছে।

নিবেদিতা : শুনেছি সেসব কথা। তবে কাজটা সমর্থন যোগ্য নয়। কংগ্রেসের ওপর ব্রিটিশ সরকার তবু কিছুটা আস্থা রাখতো। এবার সে সুবিধাটুকুও থাকলনা।

অরবিন্দ : কিন্তু নিবেদিতা তুমি এখন সাবধানে থাকবে। এই মূহুর্তে তুমি পুলিশের চোখে একনম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি। কংগ্রেসের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ায় সরকার আর গোখলেকে পছন্দ করছে না। তাই পুলিশের ওপর গোখলের প্রভাব তেমন কার্যকরী নয়। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি কিছুদিনের জন্য হোমল্যান্ড থেকে ঘুরে আস।

নিবেদিতা : কথাটা আমিও মাঝে মাঝে ভাবছি। শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছেনা। ডঃ সরকারও একই পরামর্শ দিচ্ছেন। তাই এ সময় গেলে দুটো কাজ একসাথে হবে। পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়া যাবে। পাশাপাশি শরীরটাও একটু বিশ্রাম পাবে।

অরবিন্দ : আরো একটা কাজ হবে। সেটা হলো Bomb preperation। তোমার যাত্রা শুভ হোক ভগিনী নিবেদিতা।

***** Scene changing music *****

।। ৯ম দৃশ্য।।

দৃশ্যান্তর

(চরিত্র: চালর্স টেগার্ট, লে: গর্ভ: ফুলার ও র‍্যাটক্লীফ)

টেগার্ট : Welcome, welcome Mr. Ratclif. Sorry sorry to waste your busy time. Would you like to smoke?

র‍্যাটক্লীফ : No thanks. Its O.K. Police Commissioner Tegart.

টেগার্ট : Oh yes, Now I would like to introduce Mr.Fular, the Lt.Governor of East Bengal Division.

র‍্যাটক্লীফ : Good Morning Sir. I know you. It is very nice to meet you sir.

ফুলার : Very very good morning Sir. I knew you. It is same to me also.

টেগার্ট : O.K. Now let us come to the point. Mr. Ratclif টুমি বেঙ্গলের গুপ্ট সমিটি সম্বন্ডে কতটা কী জানে?

র‍্যাটক্লীফ : I can't catch your line Sir.

টেগার্ট : হাঃ, হাঃ, হাঃ Daily Statesman এর Intelligent এবং Experienced Editor টুমি, আর আমার Line টা ক্যাচ করতে পারবেনা! না কি করতে চাইবে না?

র‍্যাটক্লীফ : As you wish.

ফুলার : Well Mr. Ratclif বরিশালের Flood and Police torture নিয়ে যে Article গুলো টোমার Paper এ Publish হয়েছিল by An English Observer-এর নামে। Then who is really that an English Observer?

র‍্যাটক্লীফ : সে তো আমার জানার কথা নয়। Post Box-এ Article-এসেছে। আমি Edit করে Publish করে দিয়েছি।

টেগার্ট : But we know that an English Observer is none but Margaret Nobel. I mean Nevedita টোমাদের ভগিনী নিবেদিতা।

র‍্যাটক্লীফ : আপনারা যখন জানেন বলছেন, Then why ask me?

ফুলার : We know that। আমাদের নজর এড়াটে She is now in Europe. But it is not true. In disguise এখন সে Bengalএ আছে।

টেগার্ট : Yes, yes. আমরা আরও জানে যে টোমাডের নিবেডিটাই এখন বেঙ্গলের সব Secret Committee-র Brain এবং টার সার্টে টোমার Strong connection আছে। কী মিস্টার র‍্যাটক্লীফ?

র‍্যাটক্লীফ : Indeed indeed I have connection with Nivedita. But-তার সাথে গুপ্ত সমিতির কী সম্পর্ক আছে?

ফুলার : Mr. Ratclif. You are British citizen. But in spite of that টুমি ব্রিটিশ গর্ভমেন্টের বিরোটিটা করছে। টোমার Paper-এ টুমি even Lord Carzon কেও embarass করেছো।

র‍্যাটক্লীফ : Yes, yes I am a British citizen. So আমি ব্রিটেনের ভাল চাই। একজন Lord হয়েও Conference-এ নিজে মিথ্যে বলবে আর এদেশের লোকেদের Lier বলবে। আর এটার বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু লেখে আমার Paper এ তা হলে সেটা Publish করে I did nothing wrong।

ফুলার : And that article also composed by your Nivedita.

র‍্যাটক্লীফ : I do not know. But সেটা Publish হবার পর London-এর পার্লামেন্টে Carzon-এর Lordship নিয়ে Commission বসেছিল। And as a rerult he had to resign।

টেগার্ট : Mr. Ratclif হেমচন্দ্র কানুনগোকে Bommaking-এর ফর্মুলা শেখার জন্য Paris-এ কে টাকে পাটিয়েছে?

র‍্যাটক্লীফ : I do not know।

টেগার্ট : Hang your I do not, I donot know.Doyou know যে টোমাডের জন্য এরা innocent British servant-দের kill করবে। Even they dare to kill Kingsford।

ফুলার : Mr. Ratclif টুমি জানো কী, টোমাকে আমরা এখুনি রাজদ্রোহের অপরাধে Arrest করটে পারে।

র‍্যাটক্লীফ : তাহলে আর দেরী করছেন কেন?

টেগার্ট : হ্যাঁ, হ্যাঁ, করচে, করচে। কারণ টোমার ঐ Rubbish Stateman-এর London-এ A good number of readership আচে। Parliament-এর Labour Party-র Begger গুলো হৈ চৈ করে রানীকে Disturb করবে। টবে আমরাও জাল গুটিয়ে আনচে। কেউ ছাড়া পাবেনা। আগে টোমাদের ঐ গুপ্ত সমিতির Lumpen গুলোকে ফাঁসিটে ঝুলাবে। টারপর বোঝাপড়া টোমার মট Treacherous দের সাটে।

র‍্যাটক্লীফ : Mind your Language. Mr. Tegart, Otherwise.....

টেগার্ট : What otherwise! Do you threat me? Get out Get out immediately. Out.

***** Scene changing music *****

।। ১০ম দৃশ্য।।

দৃশ্যান্তর

(আলিপুর জজ কোর্টের বাহিরে ও ভিতর)

(চরিত্র: গোপাল, রাখাল, ব্রজদুলাল। চিত্তরঞ্জন ও জজসাহেব)

গোপাল : আরে ও রাখাল তাড়াতাড়ি কর যাবি তো।

রাখাল : কোথায় বল তো গোপাল দা?

গোপাল : এই দেখ ভুলে গেলি। আরে আজ তারিখ কত? ইংরাজী ৬ই মে, ১৯০৯। আজই তো আলিপুর আদালতে মুরারীপুকুর বোমার মামলার রায় বেরুবে। জজব্যাটা কজনকে যে ফাঁসিতে ঝোলাবে কে জানে?

ব্রজদুলাল : কিন্তু গোপালদা, এখনো তো ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস তার বলা শেষ করেন নি গো।

গোপাল : তা তুমিও যেমন ব্রজদুলাল। আরে দেশবন্ধুকে তো দশ মিনিটেই থামিয়ে দেবে। সাহেব-জজ-ব্যারিস্টারদের সাথে আমরা এঁটে উঠতে পারি নাকি? চল বাবা তাড়াতাড়ি চল। দেখনা সব লোক ছুটছে সেখানে। এর পর আমরা আর ঢুকতে পারবোনা।

ব্রজদুলাল : না গোপালদা, তুমি এটা ঠিক বললে না। ব্যারিস্টার সি.আর.দাসকে তুমি জাননা! উনি শ্রী অরবিন্দকে ঠিক বাঁচিয়ে নেবেন।

গোপাল : হ্যাঁরে ব্রজ, আমি কী চাই যে এইসব সোনার টুকরো ছেলেরা সব ফাঁসিকাঠে ঝুলুক! কিন্তু এরা হলো রাজার জাত। এদের গায়ে যখন হাত পড়েছে এরা তার কঠিন প্রতিশোধ নেবে।

রাখাল : আচ্ছা গোপালদা, শুনেছি ব্যারিস্টার দাসের ফিস প্রচুর। উনি বিনা পারিশ্রমিককে শ্রী অরবিন্দর জন্য লড়ছেন-ব্যাপারটা কী বলোতো?

ব্রজদুলাল : হ্যাঁ, গোপালদা, আমিও শুনেছি যে উনি নাকি পাক্কা সাহেব। ওনার জামা-কাপড়ও নাকি বিলেত থেকে কেচে আসে!

গোপাল : আরে বাবা, আমি কী আর অতশত জানি? তবে এইজন্যই তো তিনি দেশবন্ধু। আর এও শুনেছি যে নিবেদিতার অনুরোধেই নাকি তিনি এই মামলা লড়ছেন। থাকগে চল, এখন কোর্টে পৌঁছে গেছি, তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢোক, নাহলে কিছুই যে দেখতে-শুনতে পাবোনা।

.....Short Gap with crowd noise...

জজ : Order, order, keep silence please. Now Barister Das Please conclude year pleeding

(pin drop silence)

চিত্তরঞ্জন : Me Lord. সবশেষে আমি এটাই আপনার নিকট Appeal করছি। যে আজ থেকে অনেক অনেকদিন বাদে এই Controversy silent হয়ে যাবে। এই যে এত হৈ-চৈ, হট্টগোল, এত আন্দোলন সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে কাঠগড়ায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গত হয়ে যাবেন। কিন্তু সেদিন এই মানুষটিকেই আবার দেশাত্মবোধের কবি রূপে, জাতীয়তাবাদের ঋষিরূপে, মানবতার প্রেমিকরূপে মানুষ তাঁকে মনে রাখবে। তাঁর মৃত্যুর অনেক অনেকদিন বাদেও তাঁর বানী ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। আর তা শুধু ভারতে নয়। ভারতের দেশ-কালের সীমানা পার করে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়েও তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।

মি. লর্ড, তাই বলি ঐ যে মানুষটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেটা কেবল আদালতের কাঠগড়া নয় উনি দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের উচ্চ আদালতের কাঠগড়ায়। Thats all। এরপর আমার আর কিছু বলার নেই। বাকি রায় ঘোষনার দায় Me Lord আপনার।

(প্রবল হাততালি আর হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়)

জজ : Order, Order!! এই মামলায় সমস্ত অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ সওয়াল-বয়ান পরীক্ষা করে আদালত মুরারীপুকুর বোমার মামলায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে মূল অভিযুক্তদের মধ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তর মৃত্যুদন্ড, ত্রিশজনের সশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা এবং বাকি সতেরজনকে এই মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হচ্ছে যার মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ।

Court in now adjourned till tomorrow.

(আবার প্রবল উত্তেজনা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল)

***** Scene changing music *****

।। ১১ তম দৃশ্য।।

দৃশ্যান্তর

(দার্জিলিং-জগদীশ চন্দ্রের বাসভবন)

(চরিত্র : জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, ড:সরকার, অবলা বসু ও নিবেদিতা)

গোপাল : হোমল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর এবারে সিস্টারের শরীরটা ক্রমশই খারাপ হতে থাকল।

জগদীশ : আসলে ব্যাপারটা কী জান অবলা, অনেকগুলো দুঃখজনক ঘটনা একসাথে ঘটল তো। প্রথমে সিস্টারের মায়ের মৃত্যু। তারপর একান্ত সহায় ওলি বুলও গত হলেন। এদিকে শ্রী অরবিন্দ তার সমস্ত কাজের ভার সিস্টারের হাতে দিয়ে পন্ডিচেরী চলে গেলেন। অন্যদিকে অর্থের অভাবে স্কুলের অনেকগুলো বিভাগ বন্ধ করে দিতে হলো। অর্থ সংগ্রহের জন্য লেখালেখির কাজ তাকে অনেক বাড়িয়ে দিতে হলো। প্রচুর পরিশ্রম তাকে একা একা করে যেতে হল।

নীলরতন : আরও কী জানেন প্রফেসর, কেবল শরীর নয়, মনটাও ভেঙ্গে গিয়েছিল তাঁর। বাংলায় যে বিপ্লবের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, বারীন-যতীনের দলাদলিতে আর হঠকারিতায় সব পন্ড হয়ে গেল। পুলিশের নজরদারিতে পড়ে গেলেন তিনি।

অবলা : ঠিকই বলেছেন ডক্টর। আর সেই কারনেই পূজার ছুটিতে একটু আনন্দ আর হৈ-চৈ করে কাটাবেন বলে আমাদের সাথে দার্জিলিং চলে এলেন সিস্টার। দারুন কাটছিল দিনগুলো। হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আরে! দেশবন্ধু যে আসুন, আসুন।

চিত্তরঞ্জন : কাল ঘরে ফিরে সারারাত খালি ভেবেছি সিস্টার আজ কেমন থাকেন? আর বুঝি কোনও আশা নেই না ডাক্তার?

নীলরতন : চেষ্টা তো অনেক করলাম দেশবন্ধু। পাহাড়ে রক্ত আমাশা বড় মারাত্মক ব্যাধি। তার সাথে নিমোনিয়া। কলিকাতার নিয়ে গেলে হয়তো Better Treatment দেওয়া যেত। কিন্তু যাতায়াতের ধকল নিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

জগদীশ : ডাক্তার, সিস্টার ধরেই নিয়েছেন আর সময় নেই। তাইতো শান্ত চিত্তে আমায় নিয়ে তাঁর সব দায়-দায়িত্বের উইল করলেন। হাত দুটো ধরে বললেন- খোকা আমার মেয়েদের তুমি দেখো।

চিত্তরঞ্জন : এইতো সেদিন, ম্যালে টাউন হলে আমার সাথে দেখা। অমার হাতে একটা গোলাপ তুলে দিয়ে বললেন এটা আমার কৃতজ্ঞতার প্রতীক। শ্রী অরবিন্দকে আপনি ছাড়া আর কেউ মুক্ত করতে পারতো না। কত খুসি দেখেছিলাম সেদিন সিস্টারকে।

অবলা : চুপ করুন, সবাই চুপ করুন। সিস্টার যেন কিছু বলছেন। দেখি কান পেতে কিছু শুনতে পাই কিনা!

নিবেদিতা : অসতো....মা...সদগময়....., তমসো....মা.... জ্যোতির্গময়....। মৃত্যোর্মা...অমৃতং....গময়...The boat.... is...sinking...The....boat....is.....sinking .....But.....I....will....see the....sunrise.... again.....। তরী ডুবছে....তরী ডুবছে...কিন্তু...আমি আবার...সূর্যোদয় দেখবো.....আবার সূর্যোদয়...।

গান : Background এ ''আছে দুঃখ আছে মৃত্যু....''

***** Scene changing music *****

।। ১২ তম দৃশ্য।।

(খোকনের পড়ার ঘর) চরিত্র : খোকন এবং তাঁর মা

অবলা : বুঝলে মা, শেষটুকু একটু জোরে জোরে পড়লেই মুখস্থ হয়ে যাবে। ১৩ই অক্টোবর, ১৯১১। হিমালয়ের তুষারাবৃত্ত শিখর নবীন সূর্যালোকে ঝলমল করে উঠল। সেই আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত হলো ভগিনী নিবেদিতার নশ্বর দেহ। কিন্তু তিনি এখন যাত্রা করেছেন অমৃত লোকের উদ্দেশ্যে। মাত্র ৪৪ বছর বয়সেই শেষ হয়ে গেল এক মহৎ জীবন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রস্তাবে বলেছিলেন—নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিবার এমন আশ্চর্য শক্তি আর কোনও মানুষে প্রত্যাশা করি নাই। গুরুর দেওয়া নাম তিনি সার্থক করেছিলেন। 'নিবেদিতা',

(ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ) –একি তুমি কাঁদছ মা?

জগদীশ : হ্যাঁ বাবা, কাঁদছি, ভুলের জন্য পরিতাপ করছি।

খোকন : কেন? কী হয়েছে মা?

মা : তাঁর নামাঙ্কিত স্কুলে পড়েই বড় হলাম। কিন্তু কই এভাবে তাকে তো কোনওদিন দেখিনি। কেউ তো দেখায়নি। না বাবা, আমরা পারিনি। কিন্তু তোরা পারবি। আগামী প্রজন্ম পারবে এই মহাজীবনের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ করতে। প্রার্থনা করি ভারতলক্ষ্মীর আশির্বাদ নিয়ে তোরা এগিয়ে যাবি নিজেদের জীবনলক্ষে। আয় বাবা আয়, দুজনে মিলে প্রণাম করি সেই মহামানবীকে।।

গান : ''আজি ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী...।''

* * * সমাপ্ত * * *

অভিনন্দন

- ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা হকি দলকে এশীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য
- ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা কাদম্বি শ্রীনাথকে এক বছরে চারটি সুপার সিরিজ জেতার জন্য
- বক্সিং-এ ফিরে এসে মেরি কমের এবং সরিতা দেবীর এশীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে পদক জয়ের জন্য
- বিশ্ব ভারত্তোলনে সোনা জেতার জন্য সইখম মীরাবাই চানুকে
- আঁচল ঠাকুরকে তুরস্কের আলপাইন এদজার আন্তর্জাতিক স্কি টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে স্কিয়িং-এ ভারতের প্রথম পদক জয়ের জন্য
- স্থপতি বালকৃষ্ণ দোশিকে প্রথম ভারতীয় হিসাবে স্থাপত্যের নোবেল 'প্রিজকাল পুরস্কার' পাওয়ার জন্য
- ফুটবলে মিনার্ভা পাঞ্জাবকে আই লিগে এবং চেন্নাইয়ানকে আই.এস.এল জেতার জন্য
- মহিলাদের একদিনের বিশ্ব ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপ্তি ও প্রথম ২০০ উইকেট পাওয়ার জন্য বাংলা ও ভারতের ফাস্ট বোলার ঝুলন গোস্বামীকে
- ভারতের যুব ক্রিকেট দলকে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ জেতার জন্য
- ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দলকে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের সিরিজ জেতার জন্য
- বিরাট কোহলিকে বিশ্ব ক্রিকেটের তিন ফর্মাটেই অসামান্য সাফল্যের জন্য
- গত দেড় দশকে সুইজারল্যান্ডের টেনিস কিংবদন্তী রজার ফেডেরারের ২০টি গ্রান্ড স্ল্যাম (আটবার উইম্বলডন, ছ' বার অস্ট্রেলিয় ওপেন, পাঁচবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন এবং একবার ফরাসী ওপেন) জেতার জন্য

■ অদম্য গৌরী :

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বুলেট বৃষ্টি করেও থামানো যাচ্ছে না এই নির্ভীক স্পষ্টবাদী লেখিকা-সাংবাদিক-সম্পাদিকা-সমাজকর্মীকে। তার মৃত্যুর পর শুধু দেশ জুড়ে প্রতিবাদই নয় এখন দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিবাদী আন্দোলনকারীরা সম্পদ সন্ধান করে গৌরীর সঙ্কল্প ও সংগ্রামে, তার অদম্য প্রাণশক্তি আর চিন্তাশীল লেখনীতে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ মিডিয়া', 'কমিউনিকেশন অফ কালচার' এবং 'সাউথ এশিয়ান উইমেন ইন মিডিয়া' মিলে ২৯ জানুয়ারি গৌরীর জন্মদিনে উদ্বোধন করল তাঁর লেখাপত্র, সম্পাদকীয় প্রভৃতি নিয়ে সংকলন 'দ্য ওয়ে আই সি ইট : আ গৌরী রিডার'— সংকলন : চন্দন গৌড়া, নবায়ন। ব্যঙ্গালুরুতে গৌরী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ডাকে গৌরী দিবসে উপস্থিত থেকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ.এস. দুরাইস্বামী, প্রকাশ রাজ, কবিতা লঙ্কেশ, জিগনেস মেবানী, সেলা রশিদ, কানাইয়াকুমার, রিচা শর্মা, আইরম শর্মিলা প্রমুখরা গৌরীর পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখা ও দেশ থেকে বিজেপি হটানোর আহ্বান রাখেন।

ভাষ্য

ডোকলাম ও তারপর :

ভারতের সিকিম ও ভূটানের সীমান্ত সংলগ্ন এবং শিলিগুড়ি করিডোরের নিকটবর্তী ভূটানের ডঙলাঙ বা ডোকলাম অঞ্চলের অনেকটা ভেতরে ঢুকে চীনা লাল ফৌজ সৈন্য চলাচলের আধুনিক রাস্তা ও সেনা বাহিনীর বাঙ্কার বানাতে থাকে। ভারতীয় সেনা ভারত সীমান্তবর্তী ভূটানের ডোকালায় গিয়ে বাধা দেয়। তারপর ১৬ জুন ২০১৭ থেকে ৭৩ দিন ভূটানের জনহীন ৯০ বর্গ কি.মি. ডোকলাম মালভূমিতে ভারত ও চীনা সেনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। প্রবল শক্তিশালী চীনা ড্রাগনের সমস্ত রক্তচক্ষু ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেও ভারতীয় সেনার সাহসী প্রতিরোধ মোদী সরকার সাফল্য হিসাবে দেখাতে থাকে। এই ক্রমবর্দ্ধমান সীমান্ত ও যুদ্ধ উত্তেজনার মধ্যে চীনের অনড় মনোভাব মোদি সরকারকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভোলের টক্কর নীতি থেকে বিদেশ সচিব জয়শঙ্করের কূটনৈতিক দৈত্যের নীতির দিকে মনোভাব পরিবর্তন করায়। ভারত সেনা বাহিনী সরিয়ে নেয়, তারপর চীনও। কিন্তু অচিরেই চীন চীনা সীমান্তে সিঞ্চেলাতে সেনাসংখ্যা ও সেনা বাহিনীর তৎপরতা বাড়িয়ে উত্তর ডোকলামে পুনরায় অস্থায়ী শিবির ও বাঙ্কার তৈরী করে সেনা রেখে রাস্তা তৈরী করতে শুরু করে। তাদের বক্তব্য ডোকলাম তাদের এলাকা, সেখানে তাদের সেনা পাহারা দেবে এবং রাস্তা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি ভূটানকে প্রস্তাব দেয় ডোকলামের এলাকাটি তাদের ছেড়ে দিয়ে উত্তরে দুটি বিতর্কিত এলাকা নিয়ে নিতে।

ভারতের উপর নজরদাড়ি রাখতে এবং প্রয়োজনে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাকী ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে ঊষর ডোকলাম আধিপত্যবাদী চীনের রণকৌশলগত অগ্রাধিকার। এর পশ্চাদপটে সমগ্র চীন-ভারত সীমান্তে চীন আধুনিক সব ঋতুর রাস্তা, পরিকাঠানো ও আধুনিক সেনা শিবির নির্মাণ করেছে। সেনা, সাঁজোয়া গাড়ি ও ক্ষেপনাস্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে লাসা ও সিগাৎসে বিমানঘাঁটির। বিপরীতে ভারত-চীন সীমান্তে ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় সেনার পরিকাঠামো দুর্বল, রাস্তা ঘাট ভাঙ্গাচোরা, দুর্গম। দীর্ঘ পায়ে হেঁটে বা টাটু ঘোড়ায় সীমান্তে পৌঁছতে হয়। সীমান্ত আগলানো সম্ভব হয়না। ম্যাকমোহন লাইন ও লাইন অফ কন্ট্রোল ছাড়িয়ে চীনা সেনা আকছার ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়ে, মহড়া করে, ছবি তোলে, রাস্তা বানায়। অরুনাচলের টুটিং, মেচুকা; উত্তরাখন্ডের চামেলি, হিমাচল প্রদেশের স্পিতি; জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখের দৌলত বেগ, চুশুল, প্যাঙ্গোয়ান প্রভৃতি এলাকায় ডোকলাম ঘটনার পরও চীনা সেনা ঢুকেছে। এখন তাদের নজর সিকিম-ভূটান সীমান্তে চুম্বি উপত্যকা ও দক্ষিণ ডোকলামের মালভূমি ছাড়িয়ে জাম্পেরি শৈলশিখর। এই অঞ্চল দিয়েই বয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ তোরসা নালা, আমো চু প্রভৃতি নদী। এতদিন 'দুর্বল' কংগ্রেস সরকার বিষয়টির প্রতি চোখ বুজে ছিল, চোখ বুজে ছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। 'নয়া চীনা সম্রাট ' জিন পিং-র নেতৃত্বে পরাক্রান্ত চীনা ফৌজের দাপটে এবং তথাকথিত ভারতপ্রেমী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফাঁকা আওয়াজে 'সবল' মোদি সরকার টক্কর দিতে গিয়ে পিছু হটেছে। সীমান্ত ও সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে। হাসিমারা, বাগডোগরা, পানাগড় ও শিলঙ বিমান ঘাঁটিতে আধুনিক সুখোই বিমান এনেছে। কিন্তু সীমান্তে কোন নির্মাণের কাজ চীনা সেনা করতেই দিচ্ছে না। তাই ডোকলাম ও চীন সীমান্ত ভারতের কাছে একদিকে কাঁটা অন্যদিকে অরক্ষিতঃ রয়ে গেল। এরই মধ্যে চীনের সেনা হেলিকপ্টার উত্তরাখণ্ড ও লাদাখ সীমা দিয়ে ঢুকে ছবি তুলে নিয়ে গেছে।

ক্যাটালোনিয়ার ভবিষ্যত :

দক্ষিণ ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী দেশ স্পেনের দক্ষিণ অংশে বাসক বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন দীর্ঘদিনের। এর সাথে যুক্ত হল দেশের পূর্বাংশের ক্যাটালোনিয়ার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ২০০৬ সালে স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার ও কাতালন প্রশাসনের মধ্যে যে অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি হয়, ২০১০ এ মাদ্রিদের সাংবিধানিক আদালত তা বাতিল করলে ১০ লক্ষ ক্যাটালোনিয়ান বিক্ষোভ দেখান। ২০১২ থেকে ক্যাটালোনিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলন জোর পেতে থাকে এবং ২০১৭ তে তা বিক্ষোভ বিদ্রোহে উত্তাল হয়ে ওঠে। যাকে দমন করতে স্পেন সরকারকে সামরিক বাহিনী নামাতে হয়। স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নেওয়া হয়। ভেঙ্গে দেওয়া হয় সংসদ। গ্রেফতার হন প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট ও আন্দোলনের নেতা কার্ল পুইদঁ, অন্যান্য নেতা ও পুলিশ প্রধান। রেফারেন্ডাম প্রতিহত করা হয়।

ক্যাটালোনিয়ানদের পাল্টা মিছিলও বেরোয় জাতীয় ঐক্যের দাবীতে। ক্যাটালোনিয়া স্পেনের ৬.৩% (৩২,১১৪ বর্গ কি.মি.), জনসংখ্যা স্পেনের ১৬% (৭৫ লক্ষ)। জাতীয় আয়ের ২০% অর্জিত হয়। দেশের বিদেশি বিনিয়োগ ও রপ্তানীর ২৫% ধারন করে। দেশের রাসায়নিক, ওষুধ, মোটরগাড়ি প্রভৃতি শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ক্যাটালোনিয়ার শহর ও শিল্প শহরগুলি। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত বার্সিলোনা ফুটবল ক্লাব। আপাতত দমিত হলেও ভেতরে ভেতরে এই আন্দোলন ধিকি ধিকি জ্বলছে ক্যাটালোনিয়াবাসীদের মনে।

সালিসবারি ঘটনা নিয়ে ব্রিটেন-রাশিয়া কূটনীতি যুদ্ধ :

ব্রিটেনের সালিসবারি শহরে ব্রিটেনে আশ্রিত প্রাক্তন রুশ গোয়েন্দা সেরগেই স্ক্রি-পাল ও তার কন্যা ইউলিয়ার আশ্চর্যজনকভাবে অজ্ঞান ও গুরুতর অসুস্থতা এবং তাদের শরীরে বিষাক্ত নার্ভগ্যাস 'নভিচক' পাওয়া যাওয়ায় ব্রিটেন ও রাশিয়ার সম্পর্ক খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। স্ক্রিপাল রুশ গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির এজেন্ট ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা এম.১৫-র হয়ে ডবল এজেন্টের কাজ করছেন এই অভিযোগে রাশিয়া তাকে গ্রেফতার করে। চার বছর জেল খাটার পর ২০১০ এ ধৃত ১০ জন রুশ চরের সাথে ১০ জন ব্রিটিশ চরের বিনিময়ের সময় ব্রিটেনে এসে আশ্রয় নেন। অতীতে ব্রিটেনে আশ্রিত কয়েকজন রুশ চর যারা ব্রিটেনের হয়ে কাজ করেছিল তাদের কেজিবি খাবারের সাথে তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়াম মিশিয়ে দিয়ে মেরে ফেলে। এবার তাই ক্রুদ্ধ উগ্রজাতীয়তাবাদী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে কঠোর অবস্থান নেন। ৫৭ জন রুশ কূটনীতিক ও দূতাবাস কর্মীকে বহিস্কার করেন। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপে ব্রিটেন কোন অতিথি পাঠাবে না জানিয়ে দেন এবং রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ব্রিটেন সফর বাতিল করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে ভ্লাদিমির পুটিনের রাশিয়া অনুরূপ পদক্ষেপ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতিকদের বহিস্কার করে। ব্রিটেনের বিরোধী নেতা জেরোমে করবিন বলেছেন যে সাধারণ দেশবাসীর নজর ফেরাতে থেরেসা মে এইসব কাজকর্ম করাচ্ছেন। ব্রিটেন-রাশিয়া কূটনৈতিক যুদ্ধ কোথায় পৌঁছয় দেখার বিষয়। ইতিমধ্যে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ও সংস্থার মাধ্যমে ব্রিটেন রাশিয়ার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার সরকারি মুখপাত্র বলেছেন যে ব্রিটেন নিজেদের ইনটালিজেন্স এজেন্টদের দিয়ে এই কান্ড ঘটিয়ে রাশিয়ার বদনাম করেছে। ব্রিটেন যথাসময়ে রাশিয়ার প্রত্যুত্তর পাবে।

অপরাধীদের পাশে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানরা

নারী, শিশুও শ্রমিক ঘাতী ইউনিয়ন কার্বাইড প্রধান কেনেথ অ্যান্ডারসনকে বিদেশে পালাতে সাহায্য করেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহ ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী; ভারতীয়দের ও ভারতীয় ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পালানো ললিত মোদী, বিজয় মাল্য, নীরব মোদীদের বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে কেন্দ্রের মোদি সরকার ও বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

জলাতঙ্ক চিকিৎসায় ভারতীয় চিকিৎসকের কৃতিত্ব

মারণ ব্যাধি জলাতঙ্কে বহু মানুষ প্রতিবছর মারা যায়। এর প্রতিষেধক ব্যয়বহুল, সাধারণের পক্ষে কেনা সম্ভব নয় এবং সরকারকেও যোগাড় করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়। হিমাচল প্রদেশের সিমলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চিকিৎসক উমেশ ভারতী জলাতঙ্ক প্রতিরোধে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টীকা (Anti Rabies Vaccine) মাংসপেশীর (Intramuscular) পরিবর্তে চামড়ার নীচে (Intradermal) দিলে অনেক কম পরিমাণে লাগে, একই রকম কার্যকরী থাকে এবং খরচ দশভাগের এক ভাগ লাগে। এর সাথে ক্ষতস্থানে অল্প পরিমাণে Rabies Immunoglobin (RIG) দিলে অত্যন্ত সফলভাবে জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করা যায়। ডা: ভারতী গত পাঁচ বছরে ৭,০০০ কুকুর বা অন্য জন্তুর কামড়ের রোগীর উপর তার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন। অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার নতুন, সস্তা, টীকা সাশ্রয়ী, কার্যকরী পদ্ধতির স্বীকৃতি দিল।

দেশ জুড়ে দলিত বিক্ষোভ ও আন্দোলনে গুলিচালনার প্রতিবাদ এবং নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের দাবী জানাই।

বিশিষ্ট চিকিৎসাগবেষক এবং শিশু, যক্ষ্মা ও এইচ.আইভি-এইডস্ বিশেষজ্ঞা এবং বর্তমানে ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান, কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (I.C.M.R)'-র ডিরেক্টর জেনারেল, ডা: সৌম্য স্বামীনাথন 'বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার (W.H.O)' ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হলেন যা ভারতীয় হিসাবে প্রথম।

স্মরণিকা

গিরিজা দেবী
(১৯২৯ - ২০১৭)

সেনিয়া ও বেনারস ঘরানার কণ্ঠ শিল্পী। তাঁর পূরব অঙ্গের গায়কিতে ঠুংরি, দাদরা, টপ্পা, কাজরি শুনিয়ে শ্রোতাদের বিমোহিত রাখতেন। বেনারসে জন্ম। অবস্থাপন্ন পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ছিল। পিতা রামজী রাই ছিলেন সঙ্গীত রসিক ও হারমোনিয়াম শিল্পী। তাঁর প্রথম গুরু সরযূপ্রসাদ মিশ্র। পরে অনেকের কাছে শিখেছেন। জীবনযাত্রা ও সঙ্গীত চর্চায় শৃঙ্খলা ছিল তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেনারসের সঙ্গীত প্রেমী ব্যবসায়ী মধুসূদন জৈনের সাথে বিয়ে হয়। বেতারে প্রথম আসেন ১৯৪৯ এ ও এলাহাবাদে প্রথম সঙ্গীত অনুষ্ঠান করেন ১৯৫২ তে। তারপর দেশে বিদেশে অসংখ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু ধনীগৃহে ব্যক্তিগত মেহাফিলে গাইতেন না। পরে কলকাতাস্থিত 'সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমী'র প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান বিজয় কিচলুর আহ্বানে তিনি ও ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁন ছাত্রছাত্রীদের তালিম দিতে কলকাতায় চলে আসেন। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে ছিলেন মাতৃসমা। তিনি পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার-বহু সম্মানে ভূষিতা হন।

সুপ্রিয়া দেবী
(১৯৩৩ - ২০১৮)

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আকীর্ন তৎকালীন বাংলার আইকন নারী চরিত্র ঋত্বিক ঘটকের পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা'র- নীতা এবং 'কোমলগান্ধার'-র অনুসূয়া চলে গেলেন। আদি নিবাস ফরিদপুর হলেও কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা বারমার রেঙ্গুনে ওকালতি করতেন। সেখানেই জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান বারমা আক্রমণ করলে তারা উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। দীর্ঘাঙ্গিনী সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারিনী, বাংলা সিনেমার সোফিয়া লোরেন কৃষ্ণা ছিলেন নৃত্যে পটিয়সী। প্রতিবেশীনী চন্দ্রাবতী দেবীর উৎসাহে ১৯৫২ তে উত্তমকুমারের বিপরীতে 'বসু পরিবার' চলচ্চিত্রে আবির্ভাব। তারপর 'প্রার্থনা', 'শ্যামলী', 'মর্মবানী', 'সোনার হরিণ', একের পর এক চলচ্চিত্রে অভিনয়। ফিল্মে নামকরণ হয় সুপ্রিয়া। ১৯৫৪তে বিশ্বনাথ চৌধুরীর সাথে বিয়ে। তাঁর অভিনীত সফল চলচ্চিত্রের সংখ্যা প্রচুর। 'আম্রপালি,' 'শুন বরনারী,' 'স্বরলিপি', 'তিন অধ্যায়', 'সন্ন্যাসী রাজা', 'সিস্টার', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'শেষ ঠিকানা' 'ইমন কল্যান', 'দেবদাস', 'যদি জানতেম', 'রক্ততিলক', 'কাল তুমি আলেয়া', 'শুধু একটি বছর', 'দূর গগন কে ছাও মে', 'অন্ধঅতীত,' 'লাল পাথর', 'বিলম্বিত লয়', 'মন নিয়ে', 'বাঘবন্দীর খেলা,' 'অয়নান্ত', 'আকাশ ছোঁয়া,....।' কয়েকটি হিন্দি ফিল্মেও অভিনয় করেন। পদ্মশ্রী, ফিল্ম ফেয়ার, বি এফ জে এ প্রভৃতি সম্মাননা পান। কাগজের কলমে ও সমাজচর্চায় তাঁর অভিনয়কে ছাপিয়ে গেছিল বাংলা সিনেমায় 'মহানায়ক' উত্তমকুমারের সাথে জীবনযাপন। শেষ জীবনে টেলিচিত্রে অভিনয়ে (জননী) ও রান্না করার পারদর্শিতার জন্য (বেনুদির রান্না) সুনাম কুড়িয়েছেন।

শশী কাপুর
(১৯৩৮ - ২০১৭)

ভারতের সিনেমা জগতের রূপবান, ভদ্রলোক, চিরনবীন নায়ক ও সহনায়ক। জন্ম কলকাতায়, বিদেশী নাটক দেখতে গিয়ে অভিনেত্রী জেনিফার কেন্ডেলের সাথে প্রেম কলকাতায় এবং বিয়ের পর প্রথম ঘরসংসার কলকাতার সদর স্ট্রীটের ফেয়ারলন হোটেলে। পৃথ্বীরাজ কাপুর ও রামা দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র বিখ্যাত রাজ ও শাম্মি কাপুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশীর নাটকে অভিনয় মাত্র চার বছর বয়সে, আর ১১ বছর বয়সে প্রথম সিনেমায় অভিনয় করেন 'আগ' ছবিতে, তারপর 'আওয়ারা'য়। খুব অল্পবয়সেই পৃথ্বী থিয়েটারে যুক্ত হওয়া। অভিনয়, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা। নায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ১৯৬১ এ 'ধর্মপুত্র' ফিল্মে। এরপর কুড়ি বছরে ১১৬ টি ছবি। তার মধ্যে ষাট সত্তর দশকের হিট ছবি 'দিওয়ার', 'কভি কভি', 'নমক হালাল', 'কালাপাথর', 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্,' 'শর্মিলি,' 'নিউ ডেলহি টাইমস্', 'সিদ্ধার্থ', 'ওয়াক্ত', 'ফোকিরা', 'ঘর এক মন্দির', 'ইন কাস্টাডি' প্রভৃতি। ১৯৭০ এ শশী ও জেনিফার একত্রে অভিনয় করেন 'বম্বে টকি'তে। ১৯৮০ তে তৈরী করেন নিজেদের ফিল্ম কোম্পানী 'বালা'। তারপর '৩৬, চৌরঙ্গী লেন,' 'জুনুন', 'বিজেতা', 'কলিযুগ', 'উৎসব' প্রভৃতি বিখ্যাত পরিচালকদের দিয়ে বিখ্যাত সব ছবি তৈরী। এখানেই থেমে না থেকে জেমস্ আইভরি ও ইসমাইল মার্চেন্টের সাথে যুক্ত হন। যৌথ উদ্যোগে তৈরী হয় 'দ্য হাউসহোল্ডার', 'হিট অ্যান্ড ডাস্ট', 'শেকস্‌পিয়ারওয়ালা'র মত ছবি। শশী-জেনিফারের তিন সন্তান কর্ণ, কুনাল ও সঞ্জনা প্রাথমিকভাবে অভিনয় জগতে এলেও পরে থাকেন নি। বলিউডের সব চাইতে প্রভাবশালী ফিল্ম পরিবারের সদস্য হয়েও শশী ছিলেন আলাদা। তাঁর না ছিল কোন স্ক্যান্ডাল, না ছিল কোন স্টারডম বা গ্ল্যামার রচনা। যে কোন রোলে অভিনয় করতে আপত্তি ছিল না। ১৯৮৪ সালে জেনিফারের মৃত্যুর পর ভেঙ্গে পড়েন এবং নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে নেন। তাঁকে ২০১১ তে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৫ এ দেওয়া হয় দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার।

পন্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
(১৯৩৩-২০১৮)

সেনিয়া- শাহ্‌জাহানপুর ঘরানার বিশিষ্ট সরোদিয়া যার যন্ত্রের উপর অসম্ভব দখল থাকা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক জনপ্রিয় পথে না গিয়ে গুরু রাধিকা মোহন মৈত্র, তাঁর গুরু ওস্তাদ মহম্মদ আমির খাঁনদের

'বাজ' বা রীতি অক্ষুন্ন রেখে গেছেন। রাজশাহীর মানুষ। জন্ম বিহারের ভাগলপুরে। বাবা ছিলেন উচ্চপস্থ আমলা। বাড়িতে সঙ্গীত চর্চার পরিবেশ ছিল। ১১ বছর বয়স থেকে সরোদ শিক্ষা। তাঁর চমৎকার বোলকারি ও লয়ের মিশ্রন এবং রাবাব অঙ্গের বাজনের জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৯ থেকে আকাশবানীতে বাজাতে শুরু করেন। তারপর দেশ বিদেশে প্রচুর অনুষ্ঠান করেছেন। বিভিন্ন ঘরানার বহু বন্দিশকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। বাদ্য নিয়ে ছিল বিস্তর পড়াশুনা। পদ্মভূষণ, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার সহ বহু সম্মান-না পান। যুক্ত ছিলেন আইটি-সি সঙ্গীত রিসার্চ আকাদেমির যন্ত্র সঙ্গীত বিভাগের প্রধান হিসাবে। সরোদ যদি তাঁর নেশা ও প্যশন হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল তাঁর পেশা ও জীবন। শিবপুর বি.ই. কলেজের কৃতী মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার দীর্ঘদিন সি.ই.এস.সি তে চাকরি করেন।

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি
(১৯৪৫ - ২০১৭)

চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষ দিকে তীব্র বামপন্থী আন্দোলনের অভিঘাতে যখন ভারতের সেই সময়কার একমাত্র, বৃহৎ ও শাসকদল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে চূর্ণ, সত্তরের শুরুতে ইন্দিরা গান্ধী-সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় অধিকৃত রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় যে তরুণ তুর্কী ছাত্র নেতাকে ধরে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ায় তাঁর নাম প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরে জন্ম। দেশভাগের পর তাঁদের পরিবার পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে চলে আসে। রায়গঞ্জ কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। উত্তাল ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্রসঙ্ঘর্ষের পর্বে ছাত্রপরিষদ নেতা, ভাল সংগঠক ও বাগ্মী হিসাবে কংগ্রেসের রুশপন্থী দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়দের 'প্রগতিশীল' লবির চোখে পড়া। কংগ্রেসের বাবু কালচারের বিপরীত সাধারণ পরিবার থেকে লড়াই করে উঠে এসে পার্টিতে প্রতিষ্ঠা। ঝেড়োগতিতে উত্থান। ১৯৭০-'৭১ এ তরুণ বয়সে এ.আই.সি.সি.-র সদস্য পদ লাভ,রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে নিবাচন এবং 'বিতর্কিত' লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা সংসদীয় কেন্দ্রে বিপ্লবী গনেশ ঘোষকে হারিয়ে লোকসভায় নির্বাচন। ১৯৭৩ এ প্রদেশ কংগ্রেস সাধারন সম্পাদক। ১৯৮০-'৮২ এবং ৮৫' ও ৯৮ তে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। দ্বিতীয়বার সাংসদ ১৯৮৪ তে হাওড়া থেকে, পরে আরও তিনবার সাংসদ হিসাবে রায়গঞ্জ থেকে নির্বাচিত। ১৯৮৫'-৮৮ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। ১৯৯৯-২০০৪ অবধি ত্রয়োদশ লোকসভায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক। ২০০৪ এ কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে তিনি কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী। মাঝে ১৯৭৮ এ সঞ্জয় গান্ধীর সাথে মনোমালিন্যে ও জরুরি অবস্থার বিরোধিতায় তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তারিক আনওয়ার প্রভৃতি নেতাদের সাথে কংগ্রেস (স) গঠন করেন। পরে ১৯৮২ তে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ প্রচুর জঙ্গী তরুনকে তিনি কংগ্রেসে নিয়ে এসেছিলেন। কুড়ি বছর ধরে ছিলেন 'অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে'র সভাপতি এবং ২০০৫ ফিফা জামার্নী বিশ্বকাপে ম্যাচ কমিশনার। তাঁর স্ত্রী প্রাক্তন নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন সাংসদ দীপা দাশমুন্সি। ২০০৮ এ স্নায়বিক পক্ষাঘাতের পর চেতনাহীন অবস্থায় দিল্লীর একাধিক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

বেলা দত্ত
(১৯২৩- ২০১৭)

জন্ম খুলনায়। বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে খুলনা, বালুরঘাট ও বাঘের হাটে পড়াশুনা। তারপর গ্রাম সেবা সমিতির ও স্কুল শিক্ষিকার কাজ। উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি। সেখানে প্রথমে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি ও পরে বামপন্থীদের বৃহত্তর রাজনীতিতে যোগ দান। 'অমৃত বাজার পত্রিকার' ধর্মঘটী কর্মচারীদের আন্দোলনের সমর্থনে যোগ দিতে গিয়ে কবি-সম্পাদক সরোজ দত্তের সাথে আলাপ ও পরিণয়। সেই সময় কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেলা চলেছেন। পরিবারের প্রয়োজনে 'ক্যালকাটা টেলিফোনসে' রাতে ডিউটি, দিনে কলেজ ও রাজনীতি, এর সাথে বাবা-মার শুশ্রুষা। তখন শহর জুড়ে চলছে দাঙ্গা হাঙ্গামা। ১৯৪৭ এ সরোজ দত্তের সাথে ধর্মীয় আচারহীন বিয়ে। মায়ের দেওয়া গয়নার পুঁটুলিটা দান করে দিলেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রোটারি মেসিন কেনার জন্য। তখন সারা বাংলাজুড়ে তেভাগার কৃষক জাগরণ শুরু হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বেলা 'মহিলা আত্মরক্ষী সমিতি'তে যোগ দিয়ে চলে গেলেন হাওড়ার জোমজুড়ে। 'পদ্মা' নামে ডোমজুড়, দক্ষিণবাড়ি, হাটাল, চাঁপাডাঙ্গা অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে লাগলেন। ওদিকে একের পর এক পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে, কৃষকের ধানের গোলা-খড়ের চাল পুড়িয়ে, কৃষক যোদ্ধাদের ধরপাকড় করে, কৃষক রমনীদের ধর্ষণ-অত্যাচারের শ্বেত সন্ত্রাস নামিয়ে আনল সরকার। এর মধ্যে সফল প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে বেলাদের একটি সশস্ত্র স্কোয়াড দক্ষিণবাড়ি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে নষ্ট করে দেয় ও বেশকিছু রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। আন্দোলন যখন তুঙ্গে সিপিআই নেতৃত্ব আন্দোলন তুলে নেয়। পরে নকশাল বাড়ি কৃষক আন্দোলন ও বিপ্লবী পার্টির সমর্থনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান বেলা দত্ত। কলকাতা ময়দানে সরোজ দত্তকে খুন করার ও তাদের পরিবারের উপর প্রবল অত্যাচারের পরও বেলা দত্ত তাঁর অবস্থানে অনড় ছিলেন। কুসংস্কারমুক্ত চিন্তা আর নতুন সমাজের স্বপ্ন নিয়ে আমৃত্যু স্বাধীন স্বতন্ত্র স্বনির্ভর জীবন কাটিয়েছেন। যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। দেহদান করে গেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির লক্ষ্যে।

যশবন্ত চ্যবন
(১৯২০ - ২০১৭)

বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, তাত্ত্বিক, জঙ্গী শ্রমিক নেতা এবং মহারাষ্ট্রের লাল নিশান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। বিচারকের সন্তান, কৃতী

ছাত্র যশবন্ত চ্যবন মাত্র ১৭ বছর বয়সে বামপন্থী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এস.কে. লিমায়ে ও শ্রীপাদ অমরুত ডাঙ্গের নেতৃত্বে কোলাপুর সহ বিভিন্ন শহর ও শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হন। সেই সময়কার বস্ত্র শিল্প ধর্মঘট সংগঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সংগঠক ছিলেন। ১৯৪২ এ 'ভারত ছাড়ো' সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তার লাইনের (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে 'পিতা' সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ব্রিটেন) বিরোধিতা করায় লিমায়ে, চ্যবন প্রমুখকে সি.পি.আই থেকে বের করে দেওয়া হয়। সেইসময় তাঁরা ১৯৪৩ এ 'নবজীবন সংগঠন' তৈরী করে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করে যেতে থাকেন। পুনরায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীন-সোভিয়েত সংঘাতের প্রেক্ষিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন হয়ে সিপিআই ও সি পিআইএম হলে চ্যবনের নেতৃত্বে বামপন্থী শক্তি মহারাষ্ট্রের বুকে ১৯৬৫ তে লাল নিশান পার্টি তৈরী করে। চ্যবন সবসময়ে কর্মসূচীর ভিত্তিতে বামদলগুলির ঐক্য এবং কাজ ও আন্দোলনের ভিত্তিতে বামকর্মীদের ঐক্যের কথা বলে এসেছেন। শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থে ৮০-র দশকে দত্ত সামন্তের ট্রেড ইউনিয়নের সাথে বস্ত্রশিল্পে লাল নিশান দলের শ্রমিক সংগঠন 'কাপড়া কামগর সঙ্ঘ' মিশে যায়। পরে রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে ২০১৭ তে লালনিশান পার্টি সিপি আই তে মিশে যায়।

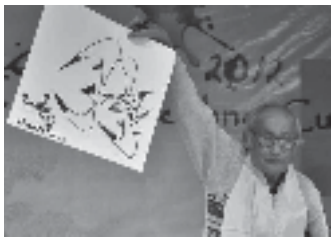

চন্ডী লাহিড়ি
(১৯৩১ - ২০১৮)

জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট,। সারা জীবন আঁকা, কার্টুন, লেখালেখি, অ্যানিমেশন নিয়ে মেতে ছিলেন। জন্ম নবদ্বীপে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ। ছাত্রাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোমা বাঁধতে গিয়ে একটি হাত নষ্ট হয়। ১৯৫১ সালে 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। পরে কার্টুন আঁকা শুরু করেন। ১৯৬২ তে কার্টুনিস্ট হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। আনন্দবাজারের 'তির্যক' এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের 'থার্ড আইয়ের' মাধ্যমে পাঠকদের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। এরপর ক্যালিগ্রাফি ও অ্যানিমেশন মাধ্যম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেন। বাংলা সিনেমায় অ্যানিমেশন প্রয়োগেরও তিনি অন্যতম পথিকৃত। 'ধন্যি মেয়ে', 'মৌচাক', 'হংসরাজ' প্রভৃতি জনপ্রিয় বাংলা সিনেমায় তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। লিখে গিয়েছেন বেশ কিছু বই। 'গগনেন্দ্রনাথ : কার্টুন ও স্কেচ' 'বিদেশীদের চোখে বাংলা'.....।

ভানু বসু
(১৯৬৫ - ২০১৭)

বিশিষ্ট টেলেকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার। স্বাধীনতা সংগ্রামী ননী গোপাল বসুর নাতি, বিশিষ্ট ধ্বনি বিজ্ঞানী ও 'বোস কর্প'-র প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার অধ্যাপক অমর গোপাল বসুর পুত্র। ভানুর উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম.আই.টি.তে। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মালিক ভানু 'স্পেকট্রামওয়ার' ও 'সুলভ সাউন্ড সিস্টেমে'র উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সফটওয়ার ভিত্তিক রেডিও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, ওয়ারলেস ও মোবাইল ফোন চালনার ক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহার করে, সেলফোন-অ্যান্টেনা ব্যবস্থা প্রবর্তনে। এইসব কর্মকান্ডের ফলে পুয়েতো রিকো থেকে রোয়ান্ডার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল পরিষেবা চালু করা যায়। ভানু বসু ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আর্মি সায়ন্স বোর্ডে'র সদস্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ব্রডব্যান্ড কমিশন ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'-র কমিশনার এবং ভারতের 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ টেলিম্যাটিক্স'-র পরামর্শদাতা। প্রচুর সম্ভাবনা অনুদ্ঘাটিত রেখে মাত্র ৫২ বছর বয়সে চলে গেলেন।

এয়ার চিফ মার্শাল অর্জন সিংহ
(১৯১৯ - ২০১৭)

পাঞ্জাবের লায়ালপুরে, বর্তমানে পাকিস্তানের ফায়সলাবাদ, এক শিখ, কৃষক, যোদ্ধা, পরিবারে জন্ম। চার পুরুষের সামরিক যোদ্ধা। তাঁর পূর্বপুরুষ মূলত অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। ঠাকুর্দার পিতা ইঙ্গ-অফগান যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি পরিবারের প্রথম বিমানবাহিনীতে আসেন ও কমিশনড অফিসার হন। পাঞ্জাবের মন্টোগোমারীতে শিক্ষা, পরে রয়াল এয়ার ফোর্সের ক্র্যানওয়েল কলেজে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। ১৯৩৮ এ পাইলট অফিসার হিসাবে 'ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে'র এক নম্বর স্কোয়াড্রনে যোগ, ১৯৪৩এ স্কোয়াড্রন লিডার হওয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, বিশেষত আরাকান রনাঙ্গণে, কৃতিত্বের জন্য 'ফ্লাইং ক্রশ' সম্মান পান। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসাবে প্রথম লাল কেল্লার উপর পরিক্রমা করেন। বহু বিমান বাহিনীর প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন এবং আম্বালা এয়ার ফোর্স স্টেশন, ওয়েস্টার্ন কমান্ড সহ বহু দায়িত্ব সামলেছেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯৬৪ তে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা চিফ অফ এয়ার স্টাফ হন এবং ১৯৬৫-র পাকিস্থান যুদ্ধে অসামান্য পারদর্শিতা দেখান। মূলত এই কৃতিত্বের জন্য তাকে পদ্মবিভূষণ (১৯৬৯) এবং পাঁচতারা খচিত 'এয়ার চিফ মার্শাল (২০০২)' মর্যাদা দেওয়া হয়। একমাত্র স্যাম মানেকশ ছাড়া ফিল্ড মার্শাল স্তরের এই মর্যাদা আর কোন ভারতীয় সামরিক অফিসার পাননি। এছাড়াও প্রচুর পুরস্কার পান। ১৯০৭ এ অবসরের পর সুইজারল্যান্ড, ভাটিকান, কেনিয়া, রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্রদূতের কাজ করেন, দিল্লীর লেফটেনান্ট গভর্নর ছিলেন এবং জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য ছিলেন।

কালাচাঁদ দরবেশ
(১৯৩৪-২০০৭)

অবিভক্ত বংলার ঐতিহ্যশালী দরবেশি, মুর্শিদি ও মারফতি গানের পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত

শেষ উত্তরাধিকার। পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পী রাধাচন্দ্র দরবেশে কাছে দরবেশি গানের শিক্ষা। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে ছিল বসবাস। সত্তর দশকের মাঝামাঝি অবধি এই সুশিক্ষিত মানুষটি ধূপগুড়ির ঠুনকির-ঝড় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপর এই অনিত্য জগৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করে দরবেশি সাধনামার্গ অনুসরণ করে, পথের অন্বেষণে নিশ্চিত আয়ের পথ ছেড়ে ধরলেন মাধুকরি এবং দরবেশের সহজ অনাড়ম্বর জীবন। সেই থেকে ২০০৭-'০৮ অবধি উত্তরবঙ্গের পথে ঘাটে, স্টেশনে, ট্রেনের কামড়ায়, হাতে স্বরাজ যন্ত্র নিয়ে রঙচঙে জোব্বাপড়া দাড়িওয়ালা কালাচাঁদ দরবেশের গান শোনা যেত। ''হৃদয় কপাট দেখ না খুলে, ঘরের মানুষ ঘরেই খাড়া....।'' প্রভৃতি চমকপ্রদ দরবেশি গান শুনে পর্যটকদের একটু থমকে যেতেই হত। শেষদিকে তাঁর দরবেশী গানের স্বীকৃতি মেলে। দেশ বিদেশের বহু সঙ্গীত আসর, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মশালা, অনুষ্ঠান, সহজিয়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়তে থাকে। ১৯৮৯ তে পন্ডিত রবিশঙ্করের সাথে কাজ করেন। ১৯৯০ এ লন্ডনের 'ভারতমেলা'য় অমিতাভ বচ্চন তাঁর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন, তবলায় সঙ্গত করেন পন্ডিত জাকির হোসেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্মান দেয়, দেয় আর্থিক সহায়তা। তাঁর কাজের উপর বেশ কিছু গবেষণা হয়। কিন্তু ততদিনে তাঁর বয়স বেড়েছে, শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাউল-ফকির- দরবেশি মতে, একই শরীরের আধারে তিনবার মানুষের জন্ম। একবার শৈশবে, দ্বিতীয়বার দীক্ষা-শিক্ষা লাভের পর। তৃতীয়বার অমোঘ মৃত্যু এই মাটির শরীরে পৌঁছনোর পর সহজ সাধকরা গান গায়, আনন্দ করে। সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত দরবেশ কালাচাঁদ সম্ভবত সেই আলোর আবাহনে পৌঁছে গেছেন।

ধূমপানের ধোঁয়া

- ভারতের তামাক শিল্পের আয়তন ১১০০ কোটি ডলার
- তামাক শিল্প থেকে শুল্ক আয় হয় : ৩১০ কোটি ডলার
- তামাক শিল্প থেকে বিদেশী মুদ্রা আসে : ৭৬.৮ কোটি ডলার
- ভারতের ধূমপায়ীর সংখ্যা : ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ
  (বিশ্বের ধূমপায়ীর ১২%, প্রাপ্ত বয়স্ক ভারতীয়দের ১৪.১%, পুরুষ ধূমপায়ীর অনুপাত ২৪.৩%)
- ক্যানসারে পুরুষ রোগীর মৃত্যুর ৪২% তামাকজনিত
- ধূমপায়ীরা ধূমপানের পিছনে প্রতি মাসে গড় খরচ করে : ১,১৯৩ টাকা

মহারাষ্ট্রের লাল কিষাণ মিছিলের দাবীদাওয়া

- কৃষকদের সম্পূর্ণ ঋণ মকুব
- ফসলের ন্যূনতম দাম হবে চাষের পুরো খরচের দেড় গুণ
- অরণ্যের অধিকার আইনের রূপায়ন
- নদী সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিল করে আদিবাসীদের জমি রক্ষা
- খরা কবলিত এলাকায় জলের বন্দোবস্ত
- আদিবাসী-কৃষকদের জমি দখল বা জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা
- লাঙল যার, জমি তার
- গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জন্য পেনশন
- পোকামাকড় ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণ

'আশা' দিদিরা যেখানে 'প্যাডম্যান'

মহিলাদের অল্প খরচে ঋতুকালীন স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করে কোয়েম্বাত্তুরের অরুণাচলম মুরুগান্থম শিরোনামে এসেছিলেন। তাকে নিয়ে বলিউড 'প্যাডম্যান' ফিল্ম নির্মাণ করে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর ১লা ফেব্রুয়ারী '১৮ থেকে আটটি স্বাস্থ্য জেলায় 'আশা' কর্মীদের মাধ্যমে স্বল্পদামে গরীব মহিলাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করতে শুরু করেছেন। টেন্ডার করে স্বাস্থ্য দপ্তর ১১ টাকা দরে এক একটি ন্যাপকিন প্যাকেট কিনেছে। এবার ভর্তুকি দিয়ে ছ-টাকায় এক একটি ন্যাপকিন প্যাকেট বিক্রি করা হচ্ছে। এই ছ টাকার এক টাকা পাচ্ছেন 'আশা' কর্মী ও পাঁচ টাকা সংশ্লিষ্ট 'রোগী কল্যাণ সমিতি'। 'আশা' কর্মীদের মাসে একটি ন্যাপকিন প্যাকেট বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ স্মরণিকা

মানবাধিকারের মুক্ত কণ্ঠই আসমা জাহাঙ্গীর

আসমা জিলানি জাহাঙ্গীর— এক অত্যাশ্চর্য নাম। সাহস, নেতৃত্ব, নিষ্ঠা, ভালবাসা, দায়বদ্ধতা ও মেধা— ইত্যাদি আরও কিছু বিশেষণের সমাহারের চেয়েও তিনি অধিক। উপমহাদেশে তিনি মানবাধিকার আন্দোলনের এক অসামান্য নেত্রী। এই উপমহাদেশে তো নয়ই এই গোলার্ধেও তাঁর মত দ্বিতীয় কোন নেত্রী মানবাধিকার আন্দোলনকে এভাবে মেলে ধরতে পারেন নি। পাকিস্তানের অকুতোভয় সংবাদপত্র 'ডন' আসমার প্রয়াণের পর যে সমস্ত লেখা ছেপেছে তা এক কথায় অনবদ্য, অসাধারণ। আসমা-র আসমা হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর সাহস, স্বাভাবিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, মানবাধিকার আন্দোলনে তাঁর দায়বদ্ধতা ও সর্বোপরি নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্ত করতে তাঁদের প্রতি তাঁর অসম্ভব মমত্ব ও ভালবাসা তাঁকে মানবাধিকার আন্দোলনে কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে।

তাঁকে মেইলে, চিঠিতে, বহু মঞ্চে মুখ নিঃসৃত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিছু যুবক তাঁর বাড়ির দেওয়ালে নানান অপকর্ম করে তাঁর ক্ষতি করার অপচেষ্টা করেছে। বালোচিস্তানে তাঁর গাড়িতে চড়া অবস্থাতেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টাও রয়েছে। তাঁকে হিট লিস্টেও রাখা হয়েছে। কিন্তু অকুতোভয় অসমাকে মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে নিরস্ত করা যায়নি। তিনি যাঁদের অধিকারের আন্দোলনে অকুতোভয় হয়ে সাহস অর্জন করেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় যা তাঁকে দায়বদ্ধ করে তোলে। তিনি সামিয়াকে অনভিপ্রেত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে মুক্ত করতে লড়েছিলেন। লড়েছিলেন নারীরা তাঁদের পছন্দের পুরুষ সঙ্গী যাতে বেছে নিতে পারেন তার জন্য, যে কোন পরিস্থিতিতে নিপীড়ন, একনায়কত্ব ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সরব হয়েছেন পরিণতির কথা না ভেবেই। 'ডন' পত্রিকায় সাম্প্রতিক এক লেখায় আই এ রেহমান 'কিভাবে তিনি আসমা' হয়ে উঠলেন লেখার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন— সাংবাদিক জুগনু মহসিন তাঁর গ্রামের বিবাহিত পুরুষদের শুধিয়েছেন এই বলে যে স্ত্রীদের প্রতি সঠিক আচরণ না করলে তিনি কিন্তু আসমা'র সাহায্য নিতে বাধ্য হবেন। জেনারেল জিয়ার পুলিশের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ সালে লাহোরের মলে তিনি ব্যারিকেড গড়ে সামনের সারিতে থেকে আইনজীবী ও মহিলাদের উপর নিগ্রহের নিন্দা করেছিলেন। যে আইনজীবীদের অধিকার আন্দোলনে লড়ে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরাই পরে তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন।

জেণ্ডার প্রশ্নে ন্যায় বিচার চাওয়া তাঁর অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়লেও পুরুষরা দুরবস্থার মধ্যে পড়লে তাঁদের পক্ষেও দাঁড়িয়েছিলেন। গিলগিট বালটিস্তানের জনপ্রিয় নায়ক বাবা জন এবং ওকারার কৃষক নেতা মেহর সাত্তার-এর হয়ে লড়েছেন। ওই দুজন আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি বন্ধুয়া শ্রমিকদের মুক্তির জন্য লড়েছিলেন। এঁরা পঞ্জাবে সিন্ধ্ প্রদেশে ইটভাটা ও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ২০০৭ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত নিখোঁজ মানুষের এবং অপহৃত নাগরিকদের সন্ধান পেতে লড়াই জারি রেখেছিলেন। জীবনের শেষ কটা বছর ধরে আসমা সরকারি ব্যবস্থাপনার গণতান্ত্রিকীকরণ, আইনের শাসন, অবৈধভাবে আটক করা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে জনগণের অধিকার সংরক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সন্তানের অধিকারে জোর করে কর্তৃত্ব বজায় রাখার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন। পাকিস্তানের আইনি রেকর্ডে তাঁর নাম খোদাই হয়ে গিয়েছিল। মালিক গুলাম জিলানি জিলানি ছিলেন আসমার পিতা। সে দেশে একনায়কতন্ত্র অবসানের দাবিতে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর আন্দোলনের জেরে পাকিস্তান সরকার তাঁকে জেলে পোরে। আসমা এই কেসে লড়েছিলেন এবং পিতাকে জেল থেকে মুক্ত করেছিলেন। মামলায় তিনিই ছিলেন আবেদনকারী যেখানে রায় কর্তৃত্ববাদীকে একজন দখলকারী হিসাবে ঘোষণা করে। পাকিস্তানে কোন ব্যক্তিই এমনকি সে দেশের মানবাধিকার কর্তাব্যক্তিরাও তাঁর মত করে একনায়কত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। এমন কি বাগাড়ম্বরসর্বস্ব পারভেজ মোশারফ নাগরিক সমাজের বাঘা বাঘা নেতৃত্বকে প্রতারিত করলেও আসমা জাহাঙ্গীর তাঁর (মোশারফের) একনায়কত্ব মানতে অস্বীকার করেন। নীতিবাগীশ ব্রিগেড তাঁকে ভুল বুঝলেও তিনি তাঁর প্রবল দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে গণতন্ত্রের পক্ষে লৌহদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথে অর্ধেক পথ না ছাড়ার সৌজন্যে।

স্বাধীন আইনি ব্যবস্থা (জুডিশিয়ারি) এবং আইনজীবীদের স্বাধীনভাবে কাজকর্মের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এমনকি পারভেজ মোশারফ যখন বিচারকদের ছুঁড়ে ফেলেছেন, উৎখাতে করেছেন, তাঁদের স্বস্থানে বজায় রাখতে তিনি দৃঢ় সংকল্প হয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফরাসি বিপ্লবে বিজয়ের পরে আদর্শ বীরপুরুষ ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর পাল্টি খাওয়া দেখে প্রকৃত নেতারা যেমন হতাশায় ভুগেছিলেন তাঁর অবস্থাও ঠিক তাঁদের মতই হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি হতাশাগ্রস্ত না হয়ে সুপ্রীম কোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনিই মহিলা হিসাবে পাকিস্তানে সুপ্রীম কোর্টের বার এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন। আসমা ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লাহোর থেকে এল এল বি ডিগ্রি নিয়ে ১৯৭৮ সালে পাশ করেছিলেন। পাকিস্তানের হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এইচ আর সি পি) যুগ্মভাবে গঠন করেছিলেন এবং এইচ আর সি পি-র চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

জেনেভাতে ১৯৮৬ সালে আসমা চলে যান এবং সেখানেই এইচ আর সি পি প্রতিষ্ঠা। যুগ্মভাবে, ১৯৯৩ পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের

সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। এরপর তিনি এইচ আর সি পি-র চেয়ারম্যান হন। আসমা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার হিসাবে কাজ করে পাকিস্তানের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন যার স্বীকৃতি দেওয়া হয় না অথবা অনেকেই জানেন না। নীতি ও কৌশলের প্রশ্নে আপোষ না করে তিনি এইচ আ সি পি-তে চারটি প্রদেশের বিচারক, আইনজীবী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সমাবেশিত করেছিলেন কমিশনের যৌথ ও গণতান্ত্রিক চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। তিনি এত বছর ধরে পাকিস্তানে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় যে আন্দোলন সংগঠিত করে গেলেন তা বজায় রাখার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর অনুগামীদের উপর। যাঁরা তাঁর কাছ থেকে নারীদের আইনি সহায়তার ট্রেনিং পেয়েছেন, মানবাধিকার কর্মী হিসাবে তাঁর অধীনে থেকে কাজ করেছেন কিংবা তাঁর অধীনে আইন ব্যবসা করতে ট্রেনি হয়ে থেকেছেন। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লক্ষ্যে অবিচল থেকে মেধা প্রয়োগে দায়বদ্ধ হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে লড়তে পারলে আসমার স্বপ্ন তাঁরা ও আসমার সমর্থকরা সার্থক করে তুলবেন। **—নিত্যানন্দ ঘোষ**

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ (১৯৪৭-২০১৮)

অগ্রনী পরিবেশবিদ্, পরিবেশ বিজ্ঞানী, জলাভূমির প্রহরী, পূর্ব কলকাতার অনন্য জলাভূমির রক্ষাকর্তা। ১৯৪৭ এ জন্ম। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি উচ্চ চাকুরে। কিন্তু তিনি এর বাইরে গিয়ে লক্ষ্য করলেন পৃথিবীর অন্যতম ঘিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন কলকাতা মহানগরীর পশ্চিম দিকে বইছে মিষ্টি পানীয় জলের অফুরন্ত স্রোত গঙ্গা আর পূর্বদিকে রয়েছে ১২,৫০০ হেক্টার বিস্তৃত পৃথিবীর বৃহত্তম শহর সংলগ্ন জলাভূমি যা একসময় সুন্দরবনের সাথে যুক্ত ছিল এবং এখনও জলপথে সুন্দরবনের নদীগুলির সাথে যোগাযোগ আছে। এই অনন্য জলাভূমিতে কলকাতার প্রতিদিনকার টনটন ও গ্যলন গ্যলন বর্জ্য (Solid and liquid waste) ফেলা হচ্ছে। কলকাতার সব ক্লেদ বিনা প্রতিবাদে সে গ্রহণ করছে, তারপর প্রাকৃতিক সেডিমেন্টেশন, অক্সিডেশন, স্যাক্রোফিকেশন প্রমুখ প্রক্রিয়ায় বিনামূল্যে সে বর্জ্যের ট্রিটমেন্ট করে এক অসাধারন বাস্তুতন্ত্র নির্মাণ করেছে। আর এই পরিবেশ বান্ধব বাস্তুতন্ত্র আবাহমান কাল থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ কৃষক মৎস্যজীবী ও অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করে। উপরন্তু কলকাতা মহানগরীকে প্রতি বছর সে ১৫০ টন তাজা সব্জী ও ১০,৫০০ টন তাজা মাছ উপহার দেয়। পূর্ব কলকাতার এই অনন্য জলাভূমি, সেখানকার কৃষিজীবী মৎস্যজীবী মানুষ হয়ে গেল তাঁর সমস্ত আগ্রহ ও গবেষণার ধ্যান জ্ঞান। এর ম্যাপ বানালেন, এর উপযোগিতার উপর তথ্যপ্রমাণ সাজালেন। তারপর প্রায় একক প্রচেষ্টায় এর অনন্যতাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে জয় করলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি পেল আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন জলাভূমি হিসাবে 'রামসার' স্বীকৃতি। দেশে 'অশোকা ফেলো' সহ বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি বিদেশে পেলেন 'ইউ এন গ্লোবাল ৫০০ পুরস্কার (১৯৯০)' ও 'লুক হফম্যান অ্যাওয়ার্ড (২০১৬)।'

কিন্তু বৃহৎ পুঁজি, দূর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রী-আমলা-মাফিয়া-বিল্ডার-প্রমোটারদের প্রবল লোভ এই জলাভূমির প্রতি। শহর বাড়ছে। লাভজনক বহুতল, রাস্তা, শপিং মল, ফ্লাইওভার বানাতে হবে। পরিবেশ রক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, দূষণ সংশোধন এসবে কাজ নেই। যেভাবে হোক, রাষ্ট্রশক্তি, মাংসপেশী, টাকার টোপ দিয়ে দখল ও গ্রাস কর এই জলাভূমি। সরকারি মদতে ক্রমশ দখল শুরু হল এই জলাভূমির। আর তা রক্ষার্থে এক অসম যুদ্ধে নামলেন এই প্রবীণ পরিবেশবিদ্। আদালতে কেসের ছড়াছড়ি। তাঁর ফাঁকেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতিদের সাহায্যে নীরব সরকার ও নির্লিপ্ত নাগরিকদের সামনে হত্যা শুরু হল কলকাতার ফুসফুস ও বৃক্ক পূর্ব কলকাতার এই অনন্য জলাভূমি। এছাড়াও সমাজের একদম অপাঙতেয় কাগজ কুড়ানিদের নিয়ে পথিকৃত কাজ করে গেছেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ এ তাঁর মৃত্যু পরিবেশ আন্দোলনে এক বড় শূন্যতার সৃষ্টি করল। **— সবুজ দত্ত**

দীপঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনাবসান আর্সেনিকের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন যিনি

সালটা ১৯৮২। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ধরা পড়ল একটি রোগ— আর্সেনিকোসিস। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল, মাটির তলার জল পাম্প করে তোলার ফলে জলস্তর নেমেছে দ্রুত, আর সঙ্গে সঙ্গে মাটির গভীরে থাকা 'আর্সেনিক' রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ মিশছে ভূগর্ভের জলে আর সেখান থেকে খাদ্যশৃঙ্খলে— যা গ্রহণ করে মানুষের হচ্ছে মারাত্মক রোগ-আর্সেনিকোসিস। কিভাবে একে আটকানো যায়? কিভাবে মানুষ বুঝবেন কোন অঞ্চলের জলে মিশে আছে আর্সেনিক? এ নিয়ে যারা ভাবিয়েছিলেন বাঙালিকে তাদের মধ্যে এক নক্ষত্রের পতন ঘটে গেল। অধ্যাপক বিজ্ঞানী দীপঙ্কর চক্রবর্তী— যিনি একটা লড়াই-এর নেশা নিয়ে ক্লাসরুমের বাইরে বেরিয়ে বিজ্ঞানকে হাতে-কলমে ব্যবহার করে, মানব কল্যাণের চেষ্টা করে গেছেন আজীবন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ-এর অধিকর্তা হিসেবে তিনি যখন কাজ শুরু করেছেন তখন থেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্ত খবর আসছিল আর্সেনিকোসিসের, প্রথমে কিছু পত্র-পত্রিকার পাতায় উঠে এসেছিল এই বিপদের কথা। তবে বাঁচার উপায় কি হতে পারে? এ নিয়ে ভাবছিলেন অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর কর্মস্থলে জলের পরীক্ষার। ১৯৯৬ সাল থেকেই তাঁর কেন্দ্রে জলের নমুনা নিখরচায় নিয়ে যেতেন অনেক বিজ্ঞানকর্মী, অনেক সংগঠন। আর্সেনিকের সমস্যা মূলত দক্ষিণবঙ্গের। কোথাও এই সমস্যা ডেকে এনেছিল সামাজিক সমস্যাকেও। ১৯৯৬ সাল একটি ঘটনা সেকালের বাঙালির চোখে মেলে ধরেছিল সংবাদপত্রগুলি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম

আর্সেনিক দূষিত জেলা মুর্শিদাবাদ-এর ডোমকল ও জলঙ্গী অঞ্চলের অনেক গ্রামের যুবক-যুবতীদের বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছিল এই আর্সেনিকের প্রকোপ। শুধু মুর্শিদাবাদ নয় আর্সেনিক দূষণের কবলে অনেকেই এভাবেই মৃত্যুমুখী পঙ্গু হচ্ছিলেন ১৯৯০-এর দশকে। দীপঙ্কর চক্রবর্তী এক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছিলেন বাস্তবতাকে। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের অজ্ঞতাই আর্সেনিকদূষিত জল পানে বাধা করছে। সেজন্যই তিনি বিনামূল্যে জলের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। নব্বই দশকে তিনি যখন এই ভাবনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তখন সরকারি হিসেবের খাতায় খুবই কম বরাদ্দ ছিল আর্সেনিকের সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু দীপঙ্কর চক্রবর্তীর এই ভাবনা ভাবিয়েছিল অন্যদের। সরকারি পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে দীপঙ্কর চক্রবর্তী যখন বিনামূল্যে জলের নমুনা পরীক্ষা করেছেন তখন তিনি একই সঙ্গে প্রভাবিত করে গেছেন, তৈরি করে দিয়ে গেছেন এ রাজ্যের একদল কাজপাগল মানুষকে। বিভিন্ন সংগঠন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে জলের নমুনা নিয়ে। যেমন কাঁচড়াপাড়ার মানুষজন এক্ষেত্রে তাঁর এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল, ১৯৯০-এর দশকেই। আবার পাশাপাশি অন্য অনেক সংস্থা নিজেরাই অতি স্বল্প দামে জল পরীক্ষার ব্যবস্থার করেছিল কলকাতায় ও তার আশেপাশে, তাঁর ভাবনা ভাবিয়েছিল একালের অনেক মানুষকেই, যারা আজও এক্ষেত্রে সরকারি পরিকাঠামো বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়ে চলেছেন। নদীয়া জেলার চাকদার, হুগলি জেলার চুঁচুড়ার, বিজ্ঞান কর্মীরাও একাধিকবার দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁর সুরাহার খোঁজে, প্রতিকারের খোঁজে। শুধু নদীয়া বা উত্তর চব্বিশ পরগনার মানুষজনই নন, তার ভাবনা ভাবিয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের অনেক মানুষ জনকেই। তবে ভাবতে তিনি বাধা করেছিলেন তাঁর কলম দিয়ে। সরকারি বয়ানের উল্টোপথে হেঁটে তিনি বার বার বলেছেন এ রাজ্যের আর্সেনিক দূষণ-এর ভয়াবহতার কথা, তাঁর কলমে বার বার উঠে এসেছিল ভূগর্ভস্থ জলের বিকল্প ব্যবস্থার কথা। তবে তিনি চিরকালই মনে করে এসেছেন নিরাপদ পানীয় জল বিনামূল্যে পানের অধিকার মানুষের থাকা উচিত। আজকের প্যাক করা জলের বোতল বা ব্যরেলের দশ-কুড়ির টাকার রমরমা বাজারে যারা মাতোয়ারা তাদের থেকে তিনি আলাদা ছিলেন। মানুষকে সচেতন করতে তিনি খবরের পাতায় লিখেছেন একাধিক নিবন্ধ, যাতে তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার কথা— উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বর্ধমান ও নদীয়া। তবে তিনি এটিও সরকারি বক্তব্যের বিপ্রতীপে বলতে চেয়েছেন যে, এই জেলাগুলি যেহেতু কলকাতাকে ঘিরে আছে, তাই কলকাতাও এই সমস্যার বাইরে নেই। তিনি বার বার বলার চেষ্টা করেছেন, বৃষ্টির জল-এর ব্যবহার, পুকুর ও নদীর জলের ব্যবহার এর কথা। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৯৫-১৯৯৮ এই সময়পর্বে তার সহকারীদের সঙ্গে কলকাতা পুরসভার এলাকাভুক্ত ৪৯০টি গভীর নলকূপের জল পরীক্ষা করেছিলেন এবং ৪৩৯টি অগভীর নলকূলের জল পরীক্ষা করেছিলেন। গভীর নলকূপগুলির জলের মধ্যে আর্সেনিক সহনমাত্রার উপরে ছিল মাত্র ৬টি, কিন্তু অগভীর নলকূপগুলির মধ্যে ২০৯টিই ছিল আর্সেনিক সহনমাত্রার উপরে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঠিক করে দেওয়া সহনমাত্রাকেই তিনি এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এক্ষেত্রে পুরসভাকে জানানোর পর পুরসভা সেই সব নলকূপগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছিলেন অন্য সমস্যার কথা। কলকাতার অনেক বহুতলের জলের সিংহভাগ বা পুরোটারই জোগানদার মাটির তলার জল। তিনি ১৯৯০-এর দশকে এই কাজ করতে গিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে এই গভীর নলকূপের মাধ্যমে বহুতলগুলিতে জল উত্তোলনের ফলে অতি দ্রুত কলকাতার মাটির গভীরে থাকা নলকূপগুলির জলও আর্সেনিকযুক্ত হয়ে পড়বে। তিনি শঙ্কা করেছিলেন ফ্লোরাইড দূষণেরও।

তাঁর এই ভাবনার কথা বলতে গেলে অবশ্যই উঠে আসবে আরেক প্রয়াত মাস্টারমশাই-এর কথা, অধ্যাপক মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে। যিনি বলেছিলেন, লিখেছিলেন শুধুমাত্র আর্সেনিক নিয়েই নয়, ফ্লোরাইড-এর দূষণ নিয়েও। দীপঙ্কর চক্রবর্তী কি মণীন্দ্রনারায়ণের প্রভাবেই এগিয়েছিলেন, নাকি সময় তাঁকে ভাবিয়েছিল? এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলবে হয়তো, কিন্তু তাঁর কথা মনে পড়বে অনেকেই যখন ভেসে আসবে গণসঙ্গীত, কেউ গাইবেন এই গান—

'যমুনা শুকায়, নর্মদা শুকায়, শুকায় সুবর্ণরেখা,
গঙ্গা হল নোংরা নালা, কৃষ্ণা কালো রেখা।
তোমরা খাবে পেপসি-কোলা, বিসলেরীর বোতলে,
আমরা কোথায় বল, তেষ্টা মেটার জল...
ও ভাই তেষ্টা মেটার জল'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে স্নাতকোত্তর পাঠ এবং গবেষণা। সেখানেই তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। ২০০৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিলেও যুক্ত ছিলে পঠন-পাঠনের সঙ্গে। দীর্ঘ ৭৫ বছরের জীবনে তিনি যে ধারা তৈরি করে গেছেন, তাতে আর্সেনিক-এর খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়ার বিষয়ের ওপরও জোর দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার মৃত্যুর পরেও কাজ-এর ধারা অব্যাহত রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ-এর বর্তমান অধিকর্তা ও দীপঙ্কর চক্রবর্তীর ছাত্র তড়িৎ রায়চৌধুরী। **— মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়**

নন্দীবাবু স্মরণে (অনিল কুমার নন্দী) (১৯২৪ - ২০১৮)

৯৩ বছর পূর্ণ করে আমাদের নন্দী বাবু (অনিল কুমার নন্দী) চির বিদায় নিলেন।

১৯৭৩ সাল। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমরা। তখনই নন্দী বাবুকে চেনা। নাম বা কি কাজ করেন জানতাম না। নন্দী বাবু নামটাও পরে জেনে ছিলাম। উনি কলেজ অধ্যক্ষ এর স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। ছাত্র দরদী এক কর্মচারী। তখন আমাদের পুরানো অফিস ছিল কলেজ গেটের ডান দিকে।

তারপর অনেক বছর পেরিয়েছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসরের পর আমাদের 'হেলথ সার্ভিসেস এসোসিয়েশন (এইচএসএ)', পশ্চিমবঙ্গ এর কাজকর্ম দেখে দিতেন। অফিসের দিনগুলোতে দেড় ঘন্টা ট্রেন পথ পেরিয়ে জয়নগর মজিলপুর থেকে শিয়ালদায় আসতেন। তীব্র গরম, কনকনে শীত, ঝড় বা বৃষ্টি নন্দী বাবুর বাধা ছিল না। বলতেন- এই কাজে আসলে আমি ভালো থাকি। এলাকার পরিচিত ও বন্ধুরা ট্রেনে বসার জায়গা রাখতেন।

১৯৯৯ সালে সংগঠন অফিসে আবার দেখা। আমি বলতাম "আপনি তো এইচ.এস.-এর মালিক।" প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন সংগঠনকে। সংগঠনের স্বর্ণযুগে আন্দোলনের ওঠানামা দেখেছেন। তার গল্প করতেন। নেতৃত্বের কাজের কত গল্প শোনাতেন। সংকটের দিনে আমাকে একান্তে ডেকে একদিন বললেন-আমি সাম্মানিক এবার নেব না। ওই টাকা সংগঠনের কাজে লাগান। প্রতিবছর বাৎসরিক মিটিং এ সবার আগে এসে রেজিস্ট্রেশন খাতা নিয়ে অপেক্ষা করতেন। নন্দী বাবুর শৃঙ্খলার কাছে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যেত।

নন্দী বাবুর ৮৫তম জন্মদিনে আমরা অফিসে অনুষ্ঠান করেছিলাম। উনি কেঁদে ফেলেছিলেন। আমরা একবার কয়েকজন (ডা: মন্ডল, ডা: সিং, ডা: কোনার ও আমি) নন্দী বাবুর বাড়ি যাই। এতো আপ্লুত হয়ে ছিলেন যে উনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, আমরা এসেছি।

নন্দী বাবুর প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি। নন্দী বাবুর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

— স্বপন জানা।

নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার

৯ মার্চ ২০১৮ এক ঐতিহাসিক রায়ে ভারতের শীর্ষ আদালত পরোক্ষ নিষ্কৃতি মৃত্যুর অধিকার এবং তার জন্য আগাম উইল করার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দিল। এর ফলে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এমন কোনও মৃতপ্রায় ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধে কিংবা হৃদযন্ত্র বা শ্বাসযন্ত্র চালু রাখার কৃত্রিম ব্যবস্থা বন্ধ করা যাবে। অথবা, মৃত্যু নিশ্চিত, এমন রোগ যন্ত্রণায় জরাজীর্ণ কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকের অনুমতিতে বাইরে থেকে কোনও মারণ পদার্থ প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানো যাবে। এর জন্য কোনও ব্যক্তি উইল করেও যেতে পারবেন যাতে তাকে জীবনমৃত অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখে যন্ত্রণা না দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে আক্রান্ত ধর্ষিতা মুম্বাইয়ের কে.ই.এম. হাসপাতালের সেবিকা জীবনমৃত অবস্থায় বিরাজ করা অরুণা শনবাগের নিষ্কৃতি মৃত্যু চেয়ে মামলা করেছিলেন মুম্বাইয়ের সমাজকর্মী পিঙ্কি ভিরানি। ২০০৯ তে ১০ বছর বাদে তারও স্বীকৃতি মিলল। ৪৩ বছর চলৎশক্তিহীন জীবনমৃত অবস্থায় থেকে ২০১৫ তে অরুণা মারা যান। প্রথমে নেদারল্যান্ডসে ২০০২ সালে তারপর একে একে উন্নত দেশগুলিতে এই আইন চালু হয়। মস্তিষ্কের মৃত্যু হলেই মৃত ঘোষণা করা হয়। ফলে বিপুল অর্থের অপচয় রোধ করা যায়, সময় ও শ্রম বাঁচে, প্রতিস্থাপনের সুবিধা হয়।

আর.এস.এসের শাখা বৃদ্ধি

২০১৮ এ নাগপুরে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর.এস.এস.) ' সর্বোচ্চ নির্ণায়ক সভা 'অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা'য় আর.এস.এসের সাধারণ সম্পাদক সুরেশ ভাইয়াজী যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দেখা যাচ্ছে ২০০৪-২০১০ অবধি কমে গেলেও ২০১১ থেকে দেশে আর.এস.এসে.-র শাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০১৭ এ পৌঁছায় ৫৭,১৬৫ তে। গত এক বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮,৯৬৭ তে। প্রতিদিন সকালে স্থানীয় মাঠ বা পার্কে আর.এস.এসের এই সমাবেশই হল তার সংগঠকদের সাথে তৃণমূল কর্মীদের এবং কর্মীদের সাথে জনগণের যোগাযোগের মূল কেন্দ্র। এই সভাতেই আর.এস.এস. ভারতীয় ভাষা ও লিপিগুলি শক্তিশালী ও উন্নত করার ডাক দেয়। তারা আরও জানায় আর.এস.এসের মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে প্রায় ১.২৫ লাখ শহুরে শিক্ষিত ও সচ্ছল যুবক আর.এস.এসে যুক্ত হতে চায়। সুরেশ ভাইয়াজী যোশি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত হন। সভাপতি মোহন ভাগবত। সহ সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সোনি, দত্তাত্রেয় হোসবেলে, কৃষ্ণগোপাল, ভাগাইয়া, মনমোহন বৈদ্য ও মুকুন্দ। অরুণ কুমার অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ।

ঝঞ্ঝাসময় শৈশব : (ডব্লিউ এইচ ও-ইউনিসেফ-ইউ এন এফ পি এ)

- ২২% বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়েরা শারীরিক ও যৌন হিংসার শিকার
- ৫৬% মেয়ে ও ৩০% ছেলে রক্তাল্পতায় ভুগছে
- ১০% তামাক ও অন্য নেশার শিকার
- ৭.৩% ভুগছে মানসিক রোগে
- ৫.৩%-র পৃথুলতা
- ২২,০০০-র বেশী প্রতি বছর মারা যায় পথদুর্ঘটনায়
- বয়ঃসন্ধিক্ষণে বিয়ে হওয়া মেয়েদের মাত্র ১৩% গর্ভনিরোধের সুযোগ পায়

প্রধান রচনা

জলাভূমি কমছে, বিপদগ্রস্ত শহর, নির্লিপ্ত নাগরিক

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

২ ফেব্রুয়ারি। আরও একটি বিশ্ব জলাভূমি দিবস এল এবং গেল। জলাভূমি ভূগর্ভস্থ জলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী। অথচ সারা দেশ জুড়ে নির্বিচারে তা ধ্বংস হয়ে চলেছে।

২ ফেব্রুয়ারি আবার জলাভূমি দিবস। এল এবং গেল। কষ্ট হয় লিখতে যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাস্তুতন্ত্র অথচ কী অবহেলায় পড়ে থাকে। দেশের সমস্ত ভুগর্ভস্থ জলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী। বন্যা ধরে রাখার আধার। খাদ্য সরবরাহকারী। দরিদ্রতম মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জায়গা। কলকাতার লোক সুন্দরবনকে বাঘের বাসা হিসেবে কদর দেন। অথচ তাদের কিছুতেই খেয়াল পড়ে না যে কত প্রচণ্ড ঝড়ঝাপটা বাদাবন রুখে দেয়। তবুও জলাভূমিতে ভোট নেই। তাই বুদ্ধিমান রাজনীতির খেলুড়েরা অনুপস্থিত। তাঁরা অন্য ময়দানে খেলাধুলা করেন। একটা কথা আমরা সকলে বুঝেছি— রাজনীতির চত্বরে সবচেয়ে আগে শহিদ হয় সত্য কথন। তাঁদের পাঠশালা বর্ণপরিচয় দিয়ে শুরু হয় না। তাই আবার জলাভূমি দিবসে যখন তাঁরা নিয়ম করে ক'বার হেঁচকি তোলেন, আমরা তাতে আমল দিই না। সত্তর বছর ধরে ঠকতে ঠকতে এইটুকু আত্মসম্মানবোধ কিছুটা হলেও হয়েছে।

■ শহরের জলাভূমি :

এ বারে বিশ্ব জলাভূমি দিবসের বিষয়বস্তু শহরসংলগ্ন জলাভূমি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু কারণ এই ধরনের জলাভূমির উপরই নগরায়ন তথা কংক্রিটায়নের খুব চাপ। চাপ দেন উন্নতিকারী স্মার্ট সিটির পূজারীরা আর বিরাট বিরাট রাস্তা আর উড়ালপুল বানানোর সরকারি তথা বেসরকারি উদ্যোগমুখীরা। ঠিক কতটা বেগে আমরা শহর সংলগ্ন জলাভূমি হারাচ্ছি তার সঠিক হিসেব করা সহজ কাজ। আমাদের দেশে এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যথেষ্ট উঁচু মানের। কিন্তু এ সবের কোনও হিসেব নেই। কত পিএইচ ডি এল গেল অথচ কেউ এই কাজে হাত দিলেন না। কোন কাজের কী গুরুত্ব না বোঝেন ছাত্রেরা, না বোঝেন তাদের শিক্ষকরা। উদাহরণ কাছেই আছে। ১৯৮৬ সালে টানা সাত মাস রোদে জলে দাঁড়িয়ে হিসেব করা হয়েছিল ১৪৭ টন সবজি উৎপন্ন হয় ধাপার চাষে যা কিনা পূর্ব কলকাতার জলাভূমির অংশ। গত তিরিশ বছর পরের পর ডক্টরেট হয়েছেন এই জলাভূমি নাড়াচাড়া করে, অথচ একজনও আর একবার মাপবার পরিশ্রম করলেন না বা তাঁদের শিক্ষকরাও করালেন না।

সংরক্ষণ উৎসাহী মানুষের খুবই অভাব। সরকার তো বোজাতে পারলেই বাঁচে। ভেবে দেখুন একদা ব্যাঙ্গালোর, বর্তমানে বেঙ্গালুরু শহরটি তো সরোবরের জন্যই বিখ্যাত ছিল। ২০০টার উপর বিরাট বিরাট সরোবর ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আজ দু-এক দশকে তা কমে ৫০-এর নীচে চলে গেছে। বর্ষার সময় শহর ডুবে যাচ্ছে। অথচ এই বেঙ্গালুরুতেই ভারতের সবচেয়ে বেশি সংগঠন নাম করেছেন পরিবেশ সংরক্ষণে। ইকোলজি নিয়ে ওখানেই পড়াশুনা শুরু করেন মাধব গ্যাডগিল। ভারতে গোড়াপত্তন করেন ইকোলজি পাঠের।

তবুও সবার চোখের আড়ালে সরোবর বুজিয়ে বাড়ি আর রাস্তা হয়ে গেল। পশ্চিম উপকূলের বনাঞ্চলে ক'টা পাখি কমে গেল তার হিসেব নিশ্চয় জরুরি কিন্তু ইকোলজি বা পরিবেশ সংগঠনের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সরোবর হারিয়ে যাওয়ায়। তাও এত দ্রুততার সঙ্গে যে বলা যাবে না যে দেখতে পারেনি।

ভালো মিটিং করা, ভালো লেকচার দেওয়া ভালো কিন্তু তার থেকে আরও ভালো কাজের কাজ করা। বিশেষত আপৎকালীন অবস্থায়। ভাবি

লোকঠকানো নাটকের এতই প্রয়োজন? এবার মূল কথায় ফিরে আসি : শহর সংলগ্ন জলাভূমির সংরক্ষণ।

■ পূর্ব কলকাতা :

শহর সংলগ্ন জলাভূমির সংরক্ষণের বিচারের নিরিখে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র নিঃসন্দেহে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি। তিরিশ বছরেরও আগে এ কাজ শুরু হয়েছিল। নিয়মনিষ্ঠ ভাবে মানচিত্র আঁকা হয়েছিল। এলাকার মানুষের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। যত্ন নিয়ে গবেষণা হয়েছিল। সংরক্ষণের পথ বেরিয়েছিল তাই থেকেই। আজও বেরোচ্ছে। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি পৃথিবীর একমাত্র দৃষ্টান্ত যা কিনা শহর সংলগ্ন মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির উপর টিকে আছে।

> এ বারে বিশ্ব জলাভূমি দিবসের বিষয়বস্তু শহরসংলগ্ন জলাভূমি। ঠিক কতটা বেগে আমরা শহর সংলগ্ন জলাভূমি হারাচ্ছি তার সঠিক হিসেব করা সহজ কাজ। আমাদের দেশে এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যথেষ্টই উঁচু মানের। কিন্তু এ-সবের কোনও হিসেব নেই। কত পিএইচ ডি এল গেল কেউ এই কাজে হাত দিলেন না।

অল্প হলেও কিছু এনজিও মাঝে মাঝে আওয়াজ তোলেন। মাঠে নেমে পড়েন। যাঁরা দিল্লির লোদি রোডের আশেপাশে শীতের আমেজে গোল টেবিলের আয়োজনে সেজেগুজে জলাভূমি দিবস পালন করেন তাঁরা তেমন আমল দেন না পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে জেনে নিতে। তবে কিনা পরিশেষে খাওয়া দাওয়া ভালো হয়। সুশান্ত পরিবেশও বটে।

কী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মোটা মাইনে পাওয়া জলাভূমি বিশেষজ্ঞরা? 'কখনও না' নির্দেশ দিয়েছিলেন ময়লা জল ঢোকার ব্যবস্থায়। এক ফোঁটাও যেন না ঢোকে ময়লা জল। তার পর ধমক পেয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা বেশ চাইলে দেব। 'চাইলে দেব'র মানে কী? তাঁদের জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য যে তাঁরা এমন একটা জলাভূমি সংরক্ষণের উপর মতামত দেবার সুযোগ পেয়েছেন। অথচ কোনও কাজ না করে, কিছু না জেনে। মানুষকে সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা নাকি জলাভূমি বিশেষজ্ঞ।

কী অসম্ভব বেসামাল হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জলাভূমি সংরক্ষণের কাজটি। তাঁদের ক্ষমতা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করতেও কলম সরে না। তাঁরা জানেনও না যে ১৯৯২ সালে এই কলকাতার জলাভূমির উপর দাঁড়িয়ে জলাভূমি সদ্ব্যবহারের অ-আ-ক-খ শেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন রামসার কর্তৃপক্ষ। গভীরে আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনা ধরেই আমার সুযোগ হয়েছিল পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে রামসার স্বীকৃতির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে। পুরো দশ বছর সময় লেগেছিল এই কাজে। ২০০২ সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি রামসার স্বীকৃতি পায়। আমরা জানি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাবতীয় তৎপরতা বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত। এ ময়লা পরিষ্কার করায় বর্তমান সরকার কত দূর পারবেন লক্ষ্য রাখতে হবে।

■ দিপোর বিল :

এর পর আমরা গৌহাটি সংলগ্ন দিপোর বিল নিয়ে আলোচনা করব। গৌহাটির পাশে দিপোর বিল একটি অসামান্য জলাভূমি। বিবরণে যাব না কারণ, উৎসাহী পাঠক আজকাল সহজেই তার নাগাল পেতে পারেন। ভারতে যে দু'টি জলাভূমি শহর সংলগ্ন এবং বিরাট— অর্থাৎ পূর্ব কলকাতা এবং দিপোর বিল, দুটোই রামসার স্বীকৃত। একই বছর অর্থাৎ ২০০২, এই দুই বিলের সংরক্ষণের শিক্ষা জড়ো করলে শহর সংলগ্ন জলাভূমির উপর সবচেয়ে ভালো পথের সন্ধান পাওয়া যেত। এ ভাবে এখনও ভাবাই হয়নি। পথের সন্ধান তো দূরস্থান।

ষোলো বছর হয়ে গেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবার পর। আজও ঠিকমতো মানচিত্র তৈরি হয়নি। লাগাতার ধমক খাচ্ছেন ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের জজসাহেবের কাছে। সরাসরি জলাভূমির উপর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে শহরের জঞ্জাল নিয়মিত ফেলা হয়। আরও মজার কথা এই জলাভূমিতেই ভাগ ভাগ করে পাট্টা দিয়ে রেখেছে সরকার বাহাদুর। এরই মধ্যে হাতি চলাচলের পথে রেললাইন পাতা হয়ে গেছে। হাতিরা হকচকিয়ে গেছে।

■ অন্ধ যুগ :

সারা জলাভূমি জুড়ে কোথায় কত বিষাক্ত পদার্থ আছে তার ভালো কিছু রিপোর্ট আছে। কিন্তু এই মৃত্যুর পরোয়ানা মানুষকে বা সরকারকে তেমন আর নাড়ায় না। মানুষ কী চায় তা বোঝার ক্ষমতা আমার উত্তরোত্তর কমে যাচ্ছে। মৃত্যুকে এ ভাবে আলিঙ্গন করার প্রবণতা আমার কাছে উদ্বেগের উপলব্ধি। দশ বছরে আগে থেকে ফলে বিষ, ফসলে বিষ, সবজিতে বিষ, জলে বিষ— এ সবই খবরে বেরোচ্ছে। অথচ কিছুই দাগ তেমন কাটেনি নাগরিক সমাজে। নিছক বিজ্ঞাপনের দাপটে মানুষের সমস্ত সৎ চিন্তা, সুবুদ্ধি আর দেখবার চোখ খোয়া গেল। পৃথিবী এখন বিজ্ঞাপনদাতাদের মুঠোয় আর মুঠো ফোনের কবজায়। জলাভূমি ভোগে যাওয়া কোনও ব্যাপার নয়। [সৌজন্য : 'এই সময়']

বিশেষ রচনা

ব্রহ্মান্ডে ডানা মেললেন অধ্যাপক হকিং

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

স্টিফেন হকিং জীবজগতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি-বিকাশ-মৃত্যুর নিয়মেই ১৪ মার্চ, ২০১৮-তে ৭৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। কি আশ্চর্য! এদিন আইনস্টাইনেরও জন্মদিন। এ এক আশ্চর্য সমাপতন। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানী অধ্যাপক রাষ্ট্রনেতা, সাধারণ মানুষের ভিড়ে কোথায় খুঁজবো স্টিফেন হকিং-কে?

একজন অত্যাশ্চর্য প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, বিশ্বাসের জগতে ঘোষিত নাস্তিক ও নিরীশ্বরবাদী যাঁর নিজস্ব দুনিয়ায় স্বর্গ এবং ভগবানের কোন স্থান ছিল না, একজন সমাজ-আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ যিনি খ্যাতির উতুঙ্গ চূঁড়ায় বসেও মানুষের সাথে পাশের বাড়ির মানুষটির মতো মেশেন, এমনকি অবলীলায় একথা বলতে পারেন— ''আমরা পুঁজিবাদ নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছি, রোবট নিয়ে নয় (We should really be scared of capitalism, not robots)'' (*Huffington Post,* 9/10/2015)

একটি বিখ্যাত ছবি আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৮-তে আমেরিকার হাতে আক্রান্ত ভিয়েতনামের মানুষের সমর্থনে "Vietnam Solidarity Campaign"-এর মিছিল। বাঁদিক থেকে ছড়িতে ভর দিয়ে স্টিফেন হকিং, ১৯৬০-এর দশকের প্যারিস ছাত্র অভ্যুত্থানের নেতা তারিক আলি, অসংখ্য পুরস্কারজয়ী অসামান্য অভিনেত্রী ও Workers' Revolutionary Party-র সদস্য ভানেসা রেডগ্রেভ এবং অন্যান্যরা।

কিন্তু এতোগুলো পরিচয়ে বিজ্ঞানী হকিং-এর পরিচয় ঢাকা পড়ে গেলে চলবে না। ওটাই তাঁর প্রাথমিক পরিচয়। অন্যসব পরিচয় এর অনুসারী। অক্সফোর্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখে জন্ম নিলেন হকিং। সেইদিন উদযাপিত হচ্ছিল বরেণ্য মহাকাশ ও পদার্থবিদ গ্যালিলিও গ্যালিলাইয়ের ৩০০ তম প্রয়াণ দিবস। ১৯৫৯ সালে এ স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে ভর্তি হন তিনি। তাঁর বাবাও ওখানকার ছাত্র ছিলেন। ছিলেন বিজ্ঞানী। তিনি একসময় ভারতের লক্ষ্ণৌতে পোস্টেড ছিলেন। সেইসময় বালক হকিং ভারতে আসেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর সহ অনেক জায়গায় ঘোরেন। অক্সফোর্ডে পাঠরত অবস্থায় তিনটে বিষয় ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে উদ্দীপক— মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ, থার্‌মোডায়ানামিক্স এবং কোয়ানটাম বলবিদ্যা। খুব মন দিয়ে ক্লাসের ধরাবাঁধা পড়া না পড়লেও ১৯৬২-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে গ্র্যাজুয়েশন সমাপ্ত করলেন। এরপরে ২১ বছর বয়সে (১৯৬২ সাল) এলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসময় থেকেই তাঁর দেহে ডাক্তারি পরিভাষায় "Amytrophic Lateral Sclerosis, ALS বা "Lou Gehrig's Disease"-এর লক্ষণ পরিস্ফুট হতে শুরু করে। ডাক্তারবাবুরা সে সময় ২-৩ বছরের বেশি আয়ুর আশা করেননি কিন্তু আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে এবং প্রযুক্তি আর চিকিৎসাবিদ্যার ওপরে নির্ভর করে আরো ৫৬ বছর বেঁচে রইলেন পৃথিবীকে আরেকটু বেশি সমৃদ্ধ করার জন্য।

যেকথা হচ্ছিল, কেমব্রিজে সে সময়ের সবচেয়ে নামী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের (Fred Hoyle) কাজ দেখার, বোঝার সুযোগ পেলেন। কদিন বাদেই পি এইচ ডি শেষ করার পরে সুযোগ পেলেন আরেক বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞ রজার পেনরোজের (Roger Penrose) সাথে কাজ করার। এসবের ফলে তাঁর অতি সক্রিয় সৃজনশীল মস্তিষ্কে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা অংকের নিয়মে বাঁধা পড়তে লাগলো। তাঁর কয়েকটি যুগান্তকারী ভাবনা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা চর্চার ইতিহাসকে ভিন্নভাবে দেখতে এবং ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। ইংরেজিতে বললে সময়-স্থান (space-time)-এর মাঝে singularity-এর ধারণা। Singularity কি? সহজ উদাহরণ দিয়ে বললে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার করা ক্যালকুলেটরে কোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যেমন ক্যালকুলেটর "error" মেসেজ দেবে, তেমনি মহাবিশ্বের কোনস্থানে ঘনত্ব এত বেশি কিংবা space-time-এর বক্রতা (curvature) অসীম হয়ে যায়, তখন space-time-এর স্বাভাবিক বোধ হারিয়ে যায়। দুটো ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছিল বলে হকিং এবং সহকারী বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন— (১) বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির মুহূর্তে (Big Bang) এবং (২) ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বরের ক্ষেত্রে। হকিং-এর তাত্ত্বিক এবং আংকিক প্রতিপাদ্য ছিল এরকম একটা sigularity-র জন্য ব্ল্যাক

হোল তৈরি হয়েছে, উল্টোটা নয়। ১৯৭৪ সালে অনুমান করলেন, ব্ল্যাক হোল সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়, এখান থেকে কোন রশ্মিই নির্গত হয় না, এ ধারণা ঠিক নয়। অংক কষে দেখালেন, ব্ল্যাক হোল থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় এক ধরনের অতি ক্ষীণ চরিত্রের বিকীরণ। এই বিকীরণের নাম দেওয়া হয়েছে ''হকিং রেডিয়েশন''। এভাবে শক্তি বেরিয়ে গিয়ে বহুকাল বাদে এরা উবে যাবে যাকে বলা হয় ''ব্ল্যাক হোল ইভাপোরেশন।''

১৯৭৯ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Lucasian Professor of Mathematics হিসেবে যোগ দিলেন। এই পদে একসময় নিউটন ছিলেন, এতটাই মর্যাদাপূর্ণ এই অধ্যাপনার পদ। ২০০৯-এ তিনি ৩০ বছর এ পদে থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ততোদিনে একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত তাঁর গলার স্বর নষ্ট হয়ে গেছে। কৃত্রিম স্বরে তিনি কথা বলতেন। যান্ত্রিক রোবটের মতো স্বরে।

তিনি যে কাজটি আংশিকভাবে করলেন তা হল বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র (gravitational wave)-এর আবিষ্কার, গত বছর নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছে, এবং প্ল্যাঙ্কের ধারণানুযায়ী কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা (sub-atomic particle)-র কাজের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

বিজ্ঞানের সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হল A Brief History of Time। সর্বকালীন বেস্ট সেলারের একটি— এক কোটির ওপরে বিক্রি হয়েছে, ৩৫টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ঐ বইয়ে তিনি লিখলেন— I have described to form a complete unified theory that would cover everything in the universe. বিজ্ঞান আর রাজনীতির মধ্যে সুসম্পূরক নির্ধারণ করতে গিয়ে আইনস্টাইনকে উদ্ধৃত করলেন— ''সমীকরণগুলো আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজনীতি বর্তমানের জন্য কিন্তু সমীকরণগুলো শাশ্বত সময়ের জন্য।''

ঈশ্বর নিয়ে, স্বর্গ নিয়ে, ধর্মব্যবস্থা নিয়ে হকিং-এর বিশেষ কোন মাথাব্যথা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন বৈজ্ঞানিক অভীপ্সা আর অনুসন্ধান, বিশ্বাস করতেন মানবসভ্যতায়। বিজ্ঞানের শিক্ষায় ও ধারণায় শিশুদের মনোজগত, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বিকাশ সিঞ্চিত করার জন্য তিনি পরেরপর কয়েকটি বই লিখলেন— Black Hole and the Baby Universes (1993), The Universe in a Nutshell (2001), The Theory of Everything (2003), A Briefer History of Time (2005), George's Cosmic Treasure Hunt (2009) , The Grand Design (2010), My Brief History (2013)। পদার্থবিদদের জন্য তাঁর প্রথম বই লেখা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে — The Large Scale Structure of Space-Time.

কি করে ভুলি তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি— The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge (বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু অজ্ঞানতা নয়, জ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা)।

ভারি কৌতুক করে তাঁর A Brief History of Time-এ একটি নিরীহ মন্তব্য করেছিলেন— মহাবিশ্ব তৈরির আগে ঈশ্বর ঠিক কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন? তিনিই জানাচ্ছেন এর কোন উত্তর সেন্ট অগাস্টিনের কাছে ছিল না। NASA-র তরফে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধায় জানানো হয়েছে— His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity." বিনম্র প্রণতি আমাদের। চলুন তাঁর বইগুলো পড়া যাক।

ভাইব্রান্ট গুজরাটে স্বাস্থ্যের বেহাল দশা

প্রবল ঢক্কানিনাদিত ভাইব্রান্ট গুজরাটে প্রান্তিক ও পশ্চাদপর ভূজ জেলার সরকারি জেলা বা সিভিল হাসপাতালটি 'দান' করা হয়েছে এক কর্পোরেট সংস্থাকে 'ব্যবসা' করার জন্য। আদিবাসী অধ্যুষিত আরেক পশ্চাদপর দাহোদ জেলার সিভিল হাসপাতালকে 'বিক্রি' করে দেওয়া হয়েছে আমদাবাদ কেন্দ্রিক জাইডাস-ক্যাডিলা বৃহৎ ওষুধ কোম্পানীর 'মুনাফা' করার জন্য। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যে দখল নেওয়ার পরপরই জাইডাস - ক্যাডিলা সমস্ত ইউজার চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে, রেড ক্রশের বিনামূল্যে দান করা রক্ত বহুমূল্যে রোগীর বাড়ির লোককে বিক্রি করা হচ্ছে। মাত্র সাতজন চিকিৎসক নিয়ে জেলা হাসপাতাল চালানো হচ্ছে। তাদেরও আবার কোনো ডিগ্রি নেই। এরা নাকি আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, এরাই এলোপ্যাথী চিকিৎসা করছে। এর বিরুদ্ধে আদিবাসী ও দলিত কৃষকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন যার নেতৃত্বে ছিলেন গুজরাটের জনপ্রিয় দলিত ও যুব নেতা এবং নির্দল বিধায়ক জিগ্নেশ মেভানি।

উন্নয়ন প্রসঙ্গে

দিনাজপুরের গত বছরের বন্যা এবং তার কারণ অনুসন্ধান

রূপক কুমার পাল

দুই দিনাজপুরে আবারও ফিরে এলো বড় মাপের বন্যা। শেষবার দেখা গিয়েছিল ১৯৮৮ সালে। সপ্তাশি এবং অষ্টাশি পরপর দু'বছর আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে একই মাপের বন্যা হয়েছিল। রায়গঞ্জ ঘেঁষা কুলিকের জলস্তর পৌঁছেছিল ৩১.০৩ মিটার। ২০১৭ তে জলস্তর উঠেছে আগের তুলনায় প্রায় ৭ সেমি বেশি। তবে বন্যার আগমন কিন্তু ঘটেছে সেই ১৫ আগস্টের আশপাশেই।

গত প্রায় এক-দেড় দশক ধরে মানুষের মনে এক বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়েছে, এ নদীগুলোতে আর বন্যা আসবে না। নদী মৃতপ্রায়। প্রবাহ দিনকে দিন কমছে, চরা পড়ছে। বর্ষায় নদীর দু-কূল কানায় কানায় পূর্ণ হওয়াই এখন দায়। আর শুখা মরসুমে তো কিছু নদী আছে যেগুলো একেবারে খটখটে থাকে, নদী খাতের তলদেশে হেটে বেরানো যায়। গাঁয়ের ছেলেরা সেখানে দিব্যি খেলাধূলা করে। কিন্তু কেন এমনটা হলো? লোক মুখ জানাজানি হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করে জল আটক করেছে। সেচের প্রয়োজনে। এই বাঁধই নদীমৃত্যুর কারণ।

একথা ঠিক যে, আয়েত্রী নদীতে সমজিয়া বর্ডার থেকে কিলোমিটার খানেক দূরে বাংলাদেশে একটা রাবার ড্যাম তৈরি হয়েছে। সেকারণে আত্রেয়ীর জলপ্রবাহ আগের তুলনায় বেশ খানিকটা কমে গেছে। পতিরাম থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত নদীতে অজস্র চর তৈরি হয়েছে। পুনর্ভবাতেও তৈরি হয়েছে ড্যাম। বাংলাদেশের কোমরডাঙ্গায়। গরমের সময় ওনদীতেও আর আগের মতো জল থাকে না। ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত নদীখাত একেবারেই শুকিয়ে যায়। গত কয়েকবছর হলো, দুই জেলাতে তাই নাগরিক উদ্যোগে নদী বাঁচাও আন্দোলন গড়ে উঠেছে। স্লোগান উঠেছে ওই বাঁধ ভেঙে ফেলতে হবে। সরকারের কাছে একাধিকবার আবেদন করা হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে জয়েন্ট রিভার কমিশন তৈরিকরে নদীগুলোকে মুক্তি দিতে হবে যাতে নদীতীরবাসী অন্ততঃ শুখা মরসুমে জল পেতে পারে। সরকারি উদ্যোগও ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হচ্ছিল। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একাধিক সেমিনার আয়োজিত হেয়েছে। পোস্টার ব্যানার নিয়ে নাগরিক মিছিল, পথসভা এসব চোখে পড়েছে বারবার। সবখানে একই রকম দাবি-- বাঁধ ভাঙা হোক, নদীতে ড্রেজিং করা হোক, কেননা বাঁধের কারণে ভাটির অংশ নদীতে মজে গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, বাঁধই কি নদী মৃত্যুর একমাত্র কারণ। কেননা টাঙ্গন, চিরামতি, কুলিক, নাগর এই নদীগুলোতে তো বাঁধের কোনও অস্তিত্ব নেই। তাহলে এদের মরণদশা হলো কেন? আরো প্রশ্ন নদী যদি মরেই যাবে তাহলে এ বছর সে মরা নদীতে এত বড়মাপের বন্যা এলো কী কারণে? চতুরদিকে নানারকম জল্পনা। কেউ বলেছেন, এ বন্যা তো আসলে তিস্তা ব্যারেজের জলছাড়ার কারণে। ব্যারেজের জমা জল আমাদের ডুবিয়েছে। কেউ আবার নেপালের অতি বর্ষণকে দুষছেন। কোশি নদী দিয়ে নেপালের অতিবৃষ্টিরি জল দুই দিনাজপুরে বন্যা ঘটিয়েছে। আবার কেউ বলছেন আগস্ট মাসে উত্তর বাংলার ভারি বর্ষণই একমাত্র কারণ। কিম্বা এ সবগুলোই একসাথে ঘটেছে। আর কুলিক-টাঙ্গন-নাগরে বাঁধ নেই বটে, তবে বাংলাদেশের কৃষকরা নিশ্চয়ই ওদের উৎসমুখ আটকে চাষাবাদ করছে। তা না হলে এমনভাবে নদী শুকিয়ে যাবে কেন। সন্দেহ জাগে, এ সব কোনও কষ্টকল্পনা নয় তো! একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

আসলে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে কৃৎকৌশলের অহঙ্কার আর প্রযুক্তির আস্ফালন মানুষকে প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। জীবনজীবিকার প্রশ্নে মানুষের প্রকৃতি নির্ভরতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে বিস্তর। জল-জঙ্গল-মাটি এসব এখন মানুষের কাছে শুধুই মুনাফা নির্মাণের ক্ষেত্র। নদীর গতিবিধি, বন্যা হওয়া না হওয়ার কারণ, নদীর বাঁচা-মরার রহস্য, এসবের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক, মানুষের জীবনশৈলি নির্মাণে এদের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে জনমানসে সুস্পষ্ট ধারণা দীর্ঘ সময় ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল সেসব হারিয়ে গেছে আমাদের অজান্তেই। আর তাই জন্ম নিচ্ছে নানান কষ্ট কল্পনা। মিথ। লোকায়ত বিশ্বাস। স্বাভাবিকভাবেই নদীর একাল সেকাল নির্মাণে আমরা ব্যর্থ নদীর ভবিষ্যৎবানী তৈরিতে।

অধিকাংশ মানুষই এখন মনে করেন, নদী নিছক একটা প্রবাহমান জলধারা, যার একটি উৎস আছে, মোহনা আছে, ডান তীর আছে,

আছে বাম তীর। আর তাই ইচ্ছে করলেই খাল কেটে নদীর জল নিয়ে যাওয়া যায় বহুদূরের চাষের জমিতে, কারখানায়, শহরের বসত এলাকায়। ইচ্ছে করলেই বাঁধ দিয়ে জল আটকে বিদ্যুৎ তৈরি। নদী কেনা বেচা। ভোগদখল ইত্যাদি।

কিন্তু নদীবিজ্ঞানের ধারণায়, নদী হলো একটা 'সিস্টেম'। একটা ব্যবস্থাপনা। পৃথিবীতে যে বিরাট জলচক্র রয়েছে যেখানে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে স্থলভাগে পৌঁছয়, বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে এবং নির্দিষ্ট খাত ধরে আবারও সমুদ্রে ফিরে আসে, নদী হলো সেই জলচক্রের একটি অংশ। সুতরাং মাটি, মাটির তলার জলভান্ডার, জঙ্গল, পাহাড়-সমতল, সমুদ্র, ঋতুচক্র, ভূতাত্ত্বিক অস্থিরতা এসবের পারস্পারিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে নদীর বাঁচা-মরা, বন্যা হওয়া না হওয়া ইত্যাদি। মানুষের কাজকর্ম, মানুষসহ অন্যান্য জীবের জীবনশৈলি এসবের সঙ্গেও নদীর ভালমন্দ জড়িয়ে রয়েছে। শুধু নদীবিজ্ঞান কেন, পুরোনো যেসব মানুষ জীবনের বেশিরভাগটাই কাটিয়েছেন নদীর বুকে তারাও নদী সম্পর্কে এমনই খোলামেলা ধারণায় বিশ্বাসী। তাদের বলার ভাষা অবশ্য খানিক আলাদা। তবে ক্ষমতাবান নদী কারবারিদের কাছে তাদের বক্তব্য কেবলমাত্র অর্থহীন এক প্রলাপ। আর তাই বর্তমান সময়ে নদী-মানুষের সম্পর্কে এত বিশৃঙ্খলা।

প্রত্যেক নদীর একটি নির্দিষ্ট অববাহিকা রয়েছে। অর্থাৎ নদী খাত থেকে তার চারপাশে কতদূর পর্যন্ত অঞ্চলের জল ওই নদীর বা উপনদী দিয়ে বয়ে যাবে সেটা প্রাকৃতিকভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। পাহাড়ি এলাকায় গেলে অববাহিকার সেই সীমানা সহজেই চোখে পড়ে। সেখানে উচু শৈলশিরা প্রাচীরের মতো নদীঅববাহিকাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সমতলে সেই প্রাচীর এত নীচু যে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তবে প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা জানে, কোথায় ঝরে পড়লে কোন নদীদিয়ে বয়ে যেতে হবে। কখনও এক নদী অববাহিকার বৃষ্টির জল অন্য নদী অববাহিকায় যাবে না। ভূমির ঢাল অনুযায়ি ওদের গতিপথ যে নির্দিষ্ট করা আছে!

উত্তর ভারতের নদী মানচিত্রে চোখ রাখলে স্পষ্ট দেখা যাবে কোশি নদী নেপাল থেকে নেমে এসে সরাসরি গঙ্গায় মিশেছে। কোশির পূর্বদিকে এমন ছোট ছোট অনামি অনেক নদী পাওয়া যাবে যেগুলো ফুলহার কিম্বা মহানন্দায় মিশেছে। একেবারে পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর রয়েছে মেচি নদী যা মহানন্দায় মিশেছে, তবে অনেক ভাটির দিকে এবং বামতীরে। ফলে নেপালের নদীগুলোর বয়ে আনা জল মহানন্দার ডানতীর থেকে মহানন্দাকে অতিক্রম করে বামতীরে পৌঁছবে এ ধারণা নদীর পথ চলার যে নীতি তার পরিপন্থী। ওদিকে আত্রেয়ী একেবারে পৃথক অববাহিকার নদী। বাংলাদেশে চলন বিলে গিয়ে জল ঢালে। চলন বিল থেকে বেরিয়ে আবার বোরাল নামে গঙ্গার এক শাখাতে গিয়ে পড়েছে। আর এদের কারোর সঙ্গেই তিস্তার কোনও সংযোগ নেই। ১৭৮৭ সালের আগে তিস্তার জল তিনটি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিশতো। একটি পূনর্ভবা, দ্বিতীয়টি আত্রেয়ী আর তৃতীয় স্রোতটি হলো করতোয়া সম্ভবত এই ত্রিস্রোতা থেকেই তিস্তা নামটি এসেছে। তেমনটাই অনেকের মত। ১৭৮৭ সালের বিধ্বংসি বন্যায় তিস্তা এই তিনটি স্রোত ফেলে খানিক দক্ষিণ-পূর্বে গতিপথ পাল্টে বাংলাদেশে যমুনায় গিয়ে মেশে। একেবারে ভিন্ন অববাহিকা। দুই দিনাজপুরের নদীগুলোর সাথে এর এখন আর কোনও সম্পর্কই নেই। সুতরাং আমরা তিস্তার জলে ডুবছি এ ধারণা পুরোপুরি কল্পনাশ্রিত।

যে কোনও নদী অববাহিকাতে বৃষ্টির পর বৃষ্টির জল কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা অংশ সেই মুহূর্তেই বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। একটি অংশ ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে থাকা গাছপালা, ঘরবাড়ি, আবর্জনা এসবকিছু দ্বারা শোষিত হয়। একটা অংশ মাটির ছিদ্রে প্রবেশ করে মাটিকে সরস করে। মাটির ধারণক্ষমতা থেকে বেশি জল চলে সেটা চুঁইয়ে মাটির অনেক গভীরে থাকা ভৌমজলস্তরকে পুষ্ট করে। একটি অংশ অববাহিকায় ছড়িয়ে থাকা জলাশয়, পুকুর খানাখন্দ এসবে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের রিচার্জ করে। এইরকম সমস্ত চাহিদা পূরণ হওয়ার পর বা বলা যায় সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে তাদের নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী সম্পৃক্ত করার পড় বাড়তি যে জল অবশিষ্ট্য থাকে সেটা ভূমির ঢাল বরাবর গড়িয়ে নদীতে গিয়ে মেশে, তৈরি করে নদী প্রবাহ। গন্তব্য

অন্য কোনও নদী অথবা সাগর। আবার রেকমও হয় যে, গাছপালা, মাটি ইত্যদি সর্বোচ্চ ২০ মিলিলিটার জল শুষে নিতে পারে, কিন্তু ওই এক ঘন্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৫০ মিলিলিটার, এক্ষেত্রে বাড়তি ৩০ মিলিমিটার নদীপ্রবাহ তৈরি হবে। শুখা মরসুমে যখন বৃষ্টির জল নেই তখন মাটির তলার ভৌমজল নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়। আর তাই খরাতেও নদী বহমান থাকে। দুই দিনাজপুরের যে নদীগুলোর কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি সেগুলো সবই বর্ষায় বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয় আর শুখা মরসুমে পুষ্ট হয় ভৌমজলে। কিন্তু গত এক-দেড় দশক হলো, ভৌম জলস্তরের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর তাই খরায় সমস্ত নদীগুলো সব শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন কীভাবে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো, কেন হলো এব্যাপারে পড়ে আসছি। এই মুহূর্তে বরং আরও খানিকটা তত্ত্ব ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

প্রত্যেক নদী অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের একটি ছন্দ আছে। আমাদের দেশে বছরে চার মাস বর্ষা, জুন থেকে সেপ্টেম্বর। বছরের মোট বৃষ্টির প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ ঝরে পড়ে বর্ষার এই চার মাসে। কিন্তু এক অববাহিকা থেকে অন্য অববাহিকায় গেলে বেশ খানিকটা আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে যাই হোক, কোন মাসে কতটা বৃষ্টি হয় তারও একটা হিসেব থাকে। আবার কোথাও ১০ বছর, কোথাও ১৫ বছর, কোথাও বা ২০ বছর বা তার বেশি এইরকম সময়ের ব্যবধানে খানিক অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। যেমন ভারি বর্ষণ কিম্বা প্রবল খরা। দীর্ঘ সময়ের নিরিখে সেটাও কিন্তু ওই সামগ্রিক ছন্দেরই অংশ বিশেষ। আর ওই যে বলছিলাম বৃষ্টির জল কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়, এখন কোন মাসে বৃষ্টির জল কতটা কোন খাতে যাবে অর্থাৎ কতটা মাটির ছিদ্রে পৌঁছবে, কতটা গাছপালা শোষণ করবে, কতটা ভৌমজলস্তরকে পুষ্ট করবে এবং কতটা নদী দিয়ে বয়ে যাবে সেটা অববাহিকার চরিত্র অনুযায়ি নির্দিষ্ট হিসেবে বাঁধা। সেটা নির্ভর করে অববাহিকায় কি ধরণের গাছপালা আছে, কি ধরণের মাটি আছে, ভূমির চরিত্র কেমন, সমতল নাকি চড়াইউৎরাই, এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, চাষাবাদের পদ্ধতি কেমন, কোন ফসল কখন উৎপন্ন হয়, এই সব নানা বিষয়ের ওপর। শুধু তাই নয় কতটা জল কোন খাতে ব্যয় হবে সেটা বর্ষার শুরুতে একরকম, মাঝপথে একরকম, আবার শেষের দিকে আরেকরকম।

জুন মাসে বর্ষার শুরুতে যে বৃষ্টি হয় তার বেশিরভাগটাই ব্যয় হয় মাটিকে সরস করতে, মাটির তলার ভৌমজলভান্ডারকে রিচার্জ করতে। খানাখন্দ, জলাশয়-পুকুর ইত্যাদিকে রিচার্জ করতে। নদীপ্রবাহ আহামরি কিছু বাড়ে না। জুলাইতে শুরু হয় রোপগারার কাজ। জমিতে আলবেঁধে কৃষক বৃষ্টির জল আটকে রাখে চাষের প্রয়োজনে। ফলে জুলাইয়েও বৃষ্টির পুরোটা নদীতে মিশতে পারে না, তবে জুনের তুলনায় বেশি নদীপ্রবাহ তৈরি হয়। এর মধ্যে বৃষ্টির দিন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে অবশ্য নদীতে জলপ্রবাহ কমাবাড়া হয়। ওদিকে জমিতে আটকে রাখা জল থেকে মাটি এবং ভৌমজলভান্ডারের রিচার্জ চলতে থাকে পুরোমাত্রায়। আর তাই আগষ্ট মাসে মাটি এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের অন্যান্য সবকিছুই ভেজা থাকে, একেবারে সম্পৃক্ত অর্থাৎ কিনা ওতে আর বাড়তি জলধারণ সম্ভব নয়। খানাখন্দ, পুকুর-জলাশয়ও একেবারে ভরাট। এখন যেটুকু বৃষ্টি হবে তার সামান্য অংশ বাষ্প হয়ে বৃষ্টির একটা বিরতি চলে অর্থাৎ বর্ষার মধ্যে খরা। তাও প্রায় দিন পনেরো-কুড়ি। জলবায়ু বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে 'মনসুনাল ব্রেক'। আর তাই গরমও পড়ে যথেষ্ট। মনে করে দেখুন সময়টা পচা ভাদ্র। কিন্তু কী কারণে এই 'মনসুনাল ব্রেক' তা আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই। বর্ষার আরো একটা বৈশিষ্ট্য হলো, দু-তিন বছর পরপর মাঝারি মাপের বৃষ্টি এই বিরতির সময়েও হয়। ফলে নদীতে ছোট মাপের বন্যা আসে। আর ১৫-২০ বছর অন্তর ভারি বর্ষণ হয় এই 'মনসুনাল ব্রেক' এর সময়। বর্ষার ছন্দটাই এমন। আর ওই ভারি বর্ষণের বছরই বড় মাপের বন্যা আসে। শুধু ভারি বৃষ্টিই নয়, সে বৃষ্টি হতে হবে অববাহিকার সর্বত্র এবং একই সময়ে। গত বছর যেমনটা হয়েছে আর কি। গত বছর ১০ আগষ্ট থেকে ১২ আগষ্ট পর্যন্ত এই তিন দিনে রায়গঞ্জে বৃষ্টি হয়েছে মোট ৪৫৯ মিলিমিটার। আর যেহেতু মাটিসহ সমস্তকিছু অত্যন্ত ভেজা সরস ছিল, খালবিল ভরাট ছিল তাই বৃষ্টির বেশিরভাগটাই নদীতে পৌঁছেছে। নদীর ধারণক্ষমতার তুলনায় বেশি প্রবাহ তৈরি হয়েছে, ফলে এসেছে বন্যা। এই সমপরিমান বৃষ্টি যদি দু-সপ্তাহ ধরে হতো তাহলে আবার এত বড় বন্যা আসতো না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যায় মোটের ওপর প্রায় ২০ বছর ব্যবধানে এমন ঘটনা ঘটে। তবে তারপর দু-বছর এমন ঘটনা ঘটার দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন, ১৯৮৭-৮৮ সালে পরস্পর দুবছর এরকম বড় বন্যা এসেছে ওই আগষ্টের ভারি বর্ষণ থেকে। এর ২০ বছর আগে ১৯৬৮ সালেও একই ঘটনা ঘটে। সুতরাং ২০১৭'র বন্যা জলবায়ুর এবং নদী প্রবাহের দীর্ঘসময়ের যে ছন্দ তারই একট অংশ। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আগষ্টের পর সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি ঝরিয়ে বর্ষা সেবছরের মতো বিদায় নেয়।

বছরে গড় সর্বোচ্চ নদী প্রবাহ কত, নদী যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন কেমন অর্থাৎ বালি না কাদা, নাকি কাঁকড়,নাকি পাথর, ভূমির চরিত্র কেমন, পাহাড়ি নাকি সমতল এসবের ওপর নির্ভর করে। আঠালো পলিমাটি অঞ্চলে নদী খাতের গভীরতা কমে যায়, প্রস্থ বেড়ে যায়। নদীপাড়ের ঢাল কম হয়। গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীপ্রবাহ পথে বালির ভাগ বেশি। আর তাই নদী সেখানে বেশ চওড়া। কিন্তু ওই নদীই যখন তপন নালাগোলা ব্লকের সীমানায় পৌঁছয় সেখানে লাল আঠালো মাটিতে নদী সংকীর্ণ হয়েগেছে। গভীরতাও সেকারণে বেড়ে গেছে। কালিয়া গঞ্জের চওড়া চিরামতি যখন হরিরামপুর কিম্বা গাজল ব্লকে পৌঁছয় তখন সে সরু আর গভীর হয়ে ওঠে। এরকম পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যই হলো ভারসাম্য তৈরি করা।

এই ভারসাম্য কিন্তু গতিশীল। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে পাল্টায়। কয়েকবছর নদীতে বন্যা না এলে তার তলায় পলি জমে। গভীরতা কমে যায়। ধারণ ক্ষমতা কমে আসে। ফলে একটু ভারি বর্ষণ হলেই বড় বন্যা হয়। স্রোত বেড়ে যায়। নদী তলা কেটে আবার তার চলার পথকে মসৃন করে নেয়। যদি তলা কাটার মতো জলের তোর না থাকে অথবা এলাকায় বালির ভাগ একটু বেশি থাকে তাহলে পাড় ভেঙে চওড়া কর খাতের ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে নেবে। ফিরবে ভারসাম্য। নদী অববাহিকাতে গাছকাটা বা অন্য কোনও কারণে যদি মাটি আলগা হয় নদীতে পলির পরিমান বাড়ে। তখন ছোট বন্যার সময় ক্ষয়ের পরিবর্তে সঞ্চয় বেশি হয়। নদীখাত ভরাট হয়। ১৫-২০ বছর অন্তর ওই যে বড়

বন্যা যেরকম গত বছর হলো ওইরকম বড় বন্যা এলে নদী খাতে জমে থাকা পলি চেঁছে পরিস্কার হয়ে যায়। নদী আবার নাব্যতা ফিরে পায়। ফিরে পায় ভারসাম্য। শুধু তাই নয়, ওরকম বড় বন্যাকে সামাল দেওয়ার জন্য নদীর নিজস্ব কিছু ব্যবস্থাপনা থাকে। নদীপথের যে অংশে খাতের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি জলপ্রবাহ তৈরি হয় প্রায় বছরেই সেই অংশে নদী ডান বা বাম তীরে মাটির দুর্বল স্থান দেখে শাখা নদী তৈরি করে নেয়। সে শাখা নদী বাড়তি জল নিয়ে অন্য কোনও বড় নদীতে মেশে। কখনও কখনও বড় কোনও জলাশয়ে গিয়ে মেশে। রায়গঞ্জ ব্লকে যে কাঞ্চন নদীর অস্তিত্ব রয়েছে সেটা আসলে কুলিকের এমনই একটা শাখা নদী যার মাধ্যমে কুলিক বাড়তি জল নাগরের দিকে ঢেলে দেয়। নাগর অপেক্ষাকৃত বড় নদী। ওর সামর্থ্য বেশি। তাই সে কুলিকের তুলনায় খানিক নিচে অবস্থান করে অর্থাৎ কুলিকের তলদেশের উচ্চতার তুলনায় নাগরের তলেদেশের উচ্চতা খানিক কম। তাই বাড়তি জল সেদিকে গড়িয়ে যায়। উত্তর দিনাজপুরে যে গামার নদী বা কুমারি নদী দেখি ওরাও এমনই একধরণের শাখা নদী। চিরামতির শাখা নদী যা ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে চিরামতি নিজে ওদের তৈরি করেছে বড় বন্যার বাড়তি জল অন্য অপেক্ষাকৃত বড় নদীতে চালান দেবার প্রয়োজনে। সুই নদীও মহানন্দার এমনই একটি শাখা। নাগর-কুলিক বিশাহার গ্রামে মহানন্দায় গিয়ে মিশছে। ফলে হঠাৎ করে মহানন্দার জল বেড়ে যাচ্ছে। এই বাড়তি জল ধারণ করার জন্য ওই মিলন স্থল থেকে খানিক ভাটিতে খরস্রোতা গ্রামে যেখানে সুবিধে করতে পেরেছে সেখানে সুই নদীর জন্ম দিয়েছে মহানন্দা নিজে। ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে।

দুই দিনাজপুরে এরকম অসংখ্য ছোটো ছোটো অনামি নদী খাত রয়েছে যেগুলো মানুষ অনামি নালা হিসেবেই চিনেছে। এগুলো সবই বড় নদী নিজেরাই তৈরি করেছে, বড় বন্যায় ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে। ১৯৮৮ আর ২০১৭'র বন্যার মাঝে তিন দশকে ছোট বন্যাও তেমন হয় নি। ফলে মানুষের মনে ধারনা তৈরি হয়েছে, বন্যা আর হবে না। স্বাভাবিকভাবেই ছোট ছোট নালা, জলাশয় বুজিয়ে বসত তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাস্তা। ওই নালা বা জলাশয়ে আর জল ধারণ সম্ভব হলো না। আর তাই এবছরের বন্যায় জলস্তর বিগত বড় বন্যার তুলনায় খানিক বেশি হয়েছে।

শুধু তাই নয় এই সময়ে চাষাবাদ প্রযুক্তিও একেবারে পাল্টে গেছে। পরম্পরাগত জৈব চাষের পরিবর্তে এসেছে রাসায়নিক সার আর সেচ নির্ভর উচ্চ ফলনশীল বীজের চাষ। মূলত বোরো ধান আর ভূট্টাচাষ। বোরো চাষে জল লাগে ১৫০০ মিলিমিটার আর ভূট্টায় লাগে ৭০০ মিলিমিটার। সবটাই মাটির তলা থেকে টেনে তোলা হয়েছে। ভৌমজলস্তর নিচে নেমেছে। শুখা মরসুমে নদীর প্রবাহ কমেছে। মরে গেছে নদী। অথচ এই সময় চিরাচরিত রেওয়াজ অনুযায়ী ডাল চাষ হবার কথা যেখানে সেচ লাগে না বললেই চলে। কখনও কখনও একটি সেচের দরকার পড়ে বটে তবে সেটা ছিটিয়ে সেচ দেওয়া হয়। পরিমাণগত ভাবে দেখলে খুবই সামান্য। হিসেবেই আসে না। জৈবকৃষির ক্ষেত্রে জমিতে জৈবসারের প্রয়োগ ছিল। তাতে মাটিতে হিউমাস তৈরি হতো। ওই হিউমাস মাটির কনাগুলোকে আস্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। কিন্তু গত তিন দশকে এক দানা জৈব সারও জমিতে পড়ে নি। হিউমাস তৈরি হয় নি। মাটি আলগা হয়ে গেছে। ফলে বর্ষায় বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে মাটি থেকে কাদা ধুয়ে নদীতে দিয়ে মিশেছে। পড়ে থাকছে বালি। তাতে জমির উর্বরতা কমে গেছে। ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছে। মাটি আরো আলগা হয়ে গেছে। ধুয়ে গেছে আরো কাদা। অর্থাৎ কিনা একটা দুষ্টু চক্র তৈরি হয়েছে যেখান থেকে বেরোনো মুশকিল। ওই কাদার সাথে রাসায়নিক সারের অবশিষ্ট্য মিশে থাকায় নদীর জল পুষ্টিকর হয়েছে। জন্মেছে আগাছা। আগাছার শেকড় নদীর তলার মাটিকে সুরক্ষা দিয়েছে। ফলে বর্ষায় জলের স্রোত কাদাকে ধুয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। নদীখাত ভরাট হয়েছে দ্রুত। ওই আগাছাগুলোর মৃত্যুর পর সেগুলো নদীর জলেই পচেছে। তাতে নদীর জলে অক্সিজেন কমেছে। আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে নদীর মাছ। সবমিলিয়ে নদী মরেছে, ধ্বংস হয়েছে নদীর জলজ বাস্তুতন্ত্র।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, গত দেড় দশকে দক্ষিণ দিনাজপুরে বর্ষার বৃষ্টির কোনও পরিবর্তন না হলেও শুখা মরসুমের বৃষ্টি কমেছে প্রায় ২২ শতাংশ। একই সমীক্ষা বলছে, বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ কমেছে প্রায় ২৯ শতাংশ এবং শুখা মরসুমে কমেছে ৩০ শতাংশেরও বেশি। আগেই বলেছি শুখা মরসুমে মাটির তলার জল নদী দিয়ে বয়ে যায়। চাষের প্রয়োজনে অতিরিক্ত জল টেনে তোলায় ভৌমজলস্তরের সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তার প্রবাহ কমেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, শুখা মরসুমে বৃষ্টির জল কখনই নদীতে মেশে না। কেননা বাষ্প হওয়ার পর যা থাকে তা মাটি আর গাছপালাকে রিচার্জ করতেই ফুরিয়ে যায়। এবার প্রশ্ন হলো বর্ষায় বৃষ্টির তেমন কোনও পরিবর্তন নেই অথচ বর্ষায় নদীর প্রবাহ কমছে। এর কারণ কী। আসলে শুখা মরসুমে বৃষ্টি কমায় মাটিতে রসই থাকে না। ফলে টানা আট মাস পরে যখন বর্ষা আসে তখন বর্ষার জলের একটা বড় অংশ ব্যায় হয় ওই শুখা মাটিকে সরস করতে। মাটিতে জলের বাড়তি চাহিদা মেটাতে। আর তাই নদীর প্রবাহে টান পড়ে।

তাহলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াল। একদিকে নদীর প্রবাহ কমেছে এবং অন্য দিকে জমিতে জৈবসার ব্যবহার না করায় নদীতে পলির পরিমান বেড়েছে। এই দুয়ে মিলিয়ে ভরাট হয়েছে নদী খাত। আবার ছোটো নালা আর জলাশয় বুজিয়ে ফেলায় বন্যায় বাড়তি জল ধারণও সম্ভব হচ্ছে না। আর তাই আগষ্টের অতি বর্ষণে যে বড় বন্যা হয় তার বহর বেড়েছে।

এতদিন নদী বাঁচাও আন্দোলনের স্লোগান ছিল, নদীতে জল নেই ড্রেজিং বা যে কোনও উপায়ে হোক নদীর বহমানতা ফিরিয়ে আনতে

হবে। ২০১৭ বন্যা পরবর্তীতে নতুন সংযোজন, বন্যা রোধ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো এই দুটি কাজ একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব?

নিশ্চিতভাবে সম্ভব। এ লেখার অনেক ছাত্রই তার ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথমেই যেটা করা দরকার তা হলো চলতি রাসায়নিক কৃষিপ্রযুক্তি বন্ধ করে পুরনো ঐতিহ্যগত জৈবচাষ ফিরিয়ে আনাটা ভীষণ জরুরি। এতে দুটি পরিবর্তন ঘটবে। এক, জৈবসার ব্যবহারের ফলে মাটিতে হিউমাস বেড়ে যাবে। তাতে মাটির গঠন হবে সুদৃঢ়। বর্ষায় মাটি ক্ষয় কম হবে। নদীতে পলির পরিমান কমে যাবে। নদীখাতের ভারসাম্য নষ্ট হবে না। হলেও তা হবে খুব ধীর গতিতে। নদী সেটা সহজেই সামাল দিতে পারবে। দ্বিতীয়ত যেটা ঘটবে তা হলো, ফসল বিন্যাসে ভুট্টা বা বোরো ধানের পরিবর্তে ফিরবে ডাল চাষ। শুখা মরসুমে সেচের প্রয়োজন কমে যাবে। তাতে ভৌম জলের উত্তোলন কমবে। ভৌম জলস্তর আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসবে। নদীখাতের সঙ্গে পুনরায় ভৌমজলস্তরের সংযোগ স্থাপিত হবে। শুখা মরসুমে নদীপ্রবাহ আগের মতো বেড়ে যাবে। পুনরুজ্জীবিত হবে নদী। এরপর যেটা করণীয় তা হলো, পুরো অববাহিকা জুড়ে দেশজ বিভিন্ন জাতের গাছ লাগাতে হবে। গুল্ম্য, বৃক্ষ, বীরুৎ সব ধরণের গাছ। তাতে মাটির প্রবেশ্যতা বাড়বে। তাতে আরো বেশি বেশি করে বৃষ্টির জল চুইয়ে যাবে মাটির তলায়। পুষ্ট হবে ভৌম জলস্তর। তাতে শুখামরসুমে নদীর প্রবাহ যেমন বাড়বে তেমনি বর্ষায় অতিবৃষ্টির জল শুষে নেবে মাটি। বন্যার তীব্রতা কমে যাবে। বন্যার সম্ভাবনাও কমে যাবে।

গত তিন দশকে সমস্ত জলাশয়ের তলায় অতিমাত্রায় পলি জমেছে। তাতে জলাশয়ের ধারণক্ষমতা যেমন কমেছে তেমনি তলার ওই পলিস্তর আঠালো হওয়ায় সেটা ভেদকরে জলাশয়ের জল মাটির তলায় চুঁইয়ে নামতে পারে না। ভৌমজলস্তরও তাই রিচার্জ হতে পারে না। এক্ষেত্রেও বেশি মাত্রায় পলি জমার কারণ হলো কৃষিপ্রযুক্তির পরিবর্তন। প্রাকৃতিক জলাশয়ের চারপাশে অনেক দূরপর্যন্ত অঞ্চলের বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে ওই জলাশয়ে মেশে। এই অঞ্চল হলো ওই জলাশয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া। সেখানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চাষাবাদ চলছে। তাই বেশি বেশি করে মাটি ধুয়ে এসে জলাশয়ে জমছে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক জলাশয় অর্থাৎ বিল এলাকায় শুখা মরসুমে জলস্তর নেমে গেলে বকচর গজিয়ে ওঠে। বাপঠাকুরদার আমলে সেই বকচরে ছিটিয়ে বোরোধানের চাষ হতো। বর্ষা আসার আগমুহূর্তে ফসল কাটা হতো। তার পর পড়ে থাকতো নাড়া। বর্ষায় বৃষ্টির ফোঁটার আঘাত সামাল দিত ওই নাড়া। তাতে বকচরে মাটি ক্ষয় খুব কম হতো। বিলে পলিও জমতো কম। কিন্তু এখন ওই বকচরে ছিটিয়ে বোরো চাষের পরিবর্তে লাঙ্গল দিয়ে কাদাকরে রোপাগেরে চাষ শুরু হয়েছে। সাধারণত ছিটিয়ে চাষ না করে রোপা গেরে চাষ করলে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। সেই লোভে সবুজবিপ্লব প্রযুক্তি আসার পর চাষিরা সেখানে রোপাগারা শুরুকরে। তাতে মাটির গঠন যেমন ভেঙে যায়। একই সঙ্গে জমিতে জৈবসার প্রয়োগ না করে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে হিউমাস আর তৈরি হচ্ছে না। মাটিকে ক্ষয়রোধক করার মতো কেউ নেই। আর তাই বর্ষায় বেশি বেশি করে বকচরের মাটি ধুয়ে বিলের তলায় জমছে। কমে যাচ্ছে বিলের জল ধারণক্ষমতা। বর্ষায় যে অতিবিষ্টির জল ওই খাল-বিল ধারণ করে বন্যার হাত থেকে আমাদের বাঁচাতো সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং জৈবচাষ কিম্বা গাছ লাগানোর পাশাপাশি পারলে ওই খাল-বিলের সংস্কার করা দরকার। দরকার নালা বুজিয়ে যে রাস্তা তৈরি হয়েছে তাতে কালভার্ট তৈরি করে জল যাতায়াতে রাস্তা সুগম করা। তা না হলে বড় বন্যায় ক্ষতির বহর ক্রমাগত বাড়বে।

এতক্ষণ যে সমস্ত পদক্ষেপের কথা বলা হলো তার উদ্দেশ্য কিন্তু মূলত দুটিঃ এক, শুখায় নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং দুই বর্ষায় নদীর প্রবাহ কমিয়ে আনা। তত্ত্বগতভাবে সেটা সম্ভব তো বটেই, তবে বাস্তবে এর প্রয়োগ সম্ভব কিনা তার জবাব নদীবিজ্ঞান চর্চা কিম্বা অর্থনীতিতে নেই, এর জবাব আছে রাজনীতিতে।

শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব : অনুপ্রেরণায়, পথনির্দেশে আজও দীপ্যমান!

অতনু চক্রবর্তী

আজ থেকে একশ বছর আগে সেটা ছিল বিরাট এক যুগান্তরকারী ঘটনা। ওলট-পালটের অধ্যায়। গোটা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলে কয়েক শতাব্দী ব্যাপী একটি সমাজব্যবস্থাকে মাত্র 'দশ দিনের মাথায়' ভেঙ্গে গুড়িয়ে রুশ দেশে হোল নতুন এক সমাজব্যবস্থার পত্তন; যে সমাজব্যবস্থার সম্ভাব্যতার আলপনা রুশ বিপ্লবের সত্তর বছর আগে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে এঁকেছিলেন। এটা ঠিক যে, কার্ল-মার্কস-এর মহত্তম রচনা ক্যাপিটাল প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরেই প্যারী কমিউনের বীর বিপ্লবীরা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পৃথিবীর বুকে প্রথম রাষ্ট্র গঠন করেন। ১৮৭১ সালে, ২৮ শে মে,মাত্র ৭২ দিন টিকে ছিল শ্রমজীবী মানুষের প্রথম এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। তদানিন্তন ফরাসী রাষ্ট্রপতি অ্যাডলফ্ থিয়েরম্-র নেতৃত্বে নির্মম এক প্রতি বিপ্লব সংগঠিত করে শাসকশ্রেণী তাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। ৪০,০০০ বীর বিপ্লবীদের প্রকাশ্য দিবালোকে কোতল করে, প্যারিসের রাজপথকে রক্তবন্যায় ভাসিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সেদিন উন্মোচিত করল তার আসল শ্রেণীচরিত্র। লেনিন ভবিষ্যতে প্যারি কমিউনের ওই মডেলকেই গ্রহন করেন। সফল বিপ্লবের পর রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈপ্লবিক সংগঠন

হিসাবে লেনিন ''কমিউন রাষ্ট্র' কেই আঁকড়ে ধরেন—উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

■ নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র:সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার :

এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত বিপ্লব হয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখল করেছিল ধনী-অভিজাত বর্গের ছোট্ট একটা গোষ্ঠী। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী দেখল বিপরীত এক ঘটনা—শাসকবর্গের মুষ্টিমেয় এক গোষ্ঠীর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত ও খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের হাতে। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কোন ষড়যন্ত্রমূলক পথে, সামরিক ক্যু করে হয়নি। নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, অগনন শ্রমজীবী মানুষের উত্তাল গণজোয়ার জীর্ন পুরাতনকে ধুয়ে মুছে সাফ করে চির নতুনের আহ্বানে প্রতিষ্ঠিত করল নতুন এক সমাজব্যবস্থা। এমন একটি গণ ভিত্তি সম্পন্ন অভ্যুত্থান গোটা দুনিয়া দেখল যেখানে শ্রমিক-কৃষক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করল, নারী-পুরুষ দৃপ্ত পায়ে কদম মেলালো একই ছন্দে, আমজনতা ও সৈনিকেরা লড়াই করল এক সাথে, আর আবালবৃদ্ধবনিতা বিপ্লবকে পরিণত করল জনগণের উৎসবে। ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রাধান্য পেলেও, নভেম্বর বিপ্লব ছিল পৃথিবীর বুকে প্রথম এক বিপ্লব, যা তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করা গেছিল। জর্জ ল্যুকাসের ভাষায়, 'তত্ত্ব ভাষা খুঁজে পেল অনুশীলনে (Theory burst into praxis)। এই বিপ্লব শুধু দশ দিনের ঘটনা ছিল না। এর পেছনে ছিল কয়েক যুগের শ্রেণী সংগ্রাম যার ফলে কালক্রমে উদ্ভব হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অসংখ্য ধর্মঘট ও গণসংগ্রাম, ১৯০৫র ব্যর্থ অভ্যুত্থান। গভীর অধ্যায়ন-সামাজিক অনুসন্ধান-গবেষণা ও বিশ্লেষন, গোপন অবস্থার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও নেতাদের আত্মত্যাগ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও মহান রাজনৈতিক কল্পনা এবং উদ্যোগ। অসংখ্য পরাজয়। পিছু হটা, পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে ফের এগিয়ে যাওয়া। ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি বিপ্লব— আঁকাবাকা-তড়াই উৎরাই পথে অভিযাত্রার মাধ্যমে রচিত হয়েছিল মহান এই বিপ্লবী গাঁথা। নভেম্বর বিপ্লবের আগে, ১৯১৭ সালে মার্চ -এপ্রিলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিবন্ধে লেনিন 'রাষ্ট্রের অবলুপ্তি' (সৈন্য-পুলিশ এবং অমলাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের কাজকর্ম বন্টন করার কথা বলেন) ঘটিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করার কতর্ব্য হাজির করেন।

■ নভেম্বর বিপ্লব— তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য :

১৯১৭র মহান বলশেভিক বিপ্লব নিছক এক 'রুশী' পরিঘটনা ছিলনা। তার ছিল এক আন্তর্জাতিক আবেদন। প্রাসঙ্গিকতা। পরিবর্তীতে যা গোটা মানব ইতিহাসের সমস্ত ক্ষেত্রে যুগান্তকারী প্রভাব, অনুপ্রেরণা, বিকল্প পথের অন্বেষা বাড়িয়ে তোলে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ প্রভাত পট্টনায়েক সঠিকভাবেই বলেছেন যে নভেম্বর বিপ্লব 'বিপ্লবের' ধারনাকেই আমূল বদলে দিল। গোড়ার দিকে ধারনা ছিল কমিউনিস্ট বিপ্লব তখনই হওয়া সম্ভব যখন পুঁজিবাদী সমাজের অন্তবিরোধগুলো বিস্ফোরণের একটা মুহূর্তে পৌঁছে গেছে, এবং মার্কস-এঙ্গেলস ইউরোপের বুকেই সর্বপ্রথম সর্বহারা বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন। ১৮৮২ সালে কার্ল কাউটস্কিতে লেখা বিখ্যাত এক চিঠিতে এঙ্গেলস ভারত-মিশর ও আলজেরিয়ার মতো দেশগুলোতে বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে ''সেটা আমাদের (অর্থাৎ, ইউরোপে সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থে) পক্ষে নিঃসন্দেহ সবচেয়ে ভাল ব্যাপার হবে।'' কিন্তু 'প্রান্তঃসীমা বা 'পেরিফেরি'তে কিভাবে ওই বিপ্লবগুলো আত্মপ্রকাশ করবে, বিশেষভাবে, ওই সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনার সঙ্গে কিভাবেই বা তা সম্পর্কযুক্ত হবে, তা সূত্রায়িত হয় নি। তখন ইউরোপেই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল ফোকাস। কিন্তু আমরা কী দেখলাম? বিপ্লব ঘটল একটা পশ্চাদ্‌পদ পুঁজিবাদী দেশে যার ওপর চেপে বসেছে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের বোঝা। আর যার শাসনক্ষমতায় রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক জার। গোটা দুনিয়া জুড়ে না হলেও মহাদেশ জুড়ে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার যে উত্তুঙ্গ আশাবাদ ছিল, দেখা গেল নভেম্বর বিপ্লব বাস্তবায়িত হলো একটি দেশে, সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থিকে ছিঁড়ে। এই প্রথম তত্ত্বগতভাবে কৃষক জনগণের বিপ্লবী ভূমিকা এবং সর্বহারা শ্রেনীর দৃঢ় মিত্র হিসাবে তোকে সূত্রায়িত করা হোল। শুধুমাত্র শিল্পোন্নত শিল্প-সর্বহারা শ্রেণীর প্রাধান্যকারী ইউরোপ নয়, 'প্রান্তিক' দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অ্যাজেন্ডা সামনে এলো। সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র ইউরোপের ব্যাপার-স্যাপার হয়ে থাকল না। তা হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। লেনিন প্রথম দেখান যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থিটাকে যদি ছিন্ন করা যায় তবে গোটা সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলই দুর্বল হবে, যার পরিণতিতে শুধুমাত্র ইউরোপই নয়, বিশ্বজুড়েই তা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে গভীর সংকটে ফেলে দেবে।

বিশাল দেশ রাশিয়া দু-দুটো মহাদেশে বিস্তৃত ছিল। তার বিরাট-বিরাট শহর, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কেন্দ্র, বেশিরভাগ শিল্প, তার পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী—সবই ছিল পূর্ব ইউরোপের অংশ। আর তার উপনিবেশ ও কৃষকসমাজ ছিল এশিয়ার। তাই, রাশিয়ার মতো আধা-শিল্প, কৃষকভিত্তিক প্রাধান্যকারী দেশে বিপ্লবের প্রশ্নটা যখন সামনে আসে, তখনই কৃষকদের বিপ্লবী ভূমিকা ঠাঁই পেল মার্কসবাদের অধিক কাঠামোতে, আর লেনিন-ই এই সূত্রায়নে অগ্রগন্য ভূমিকা রাখেন।

■ উপনিবেশগুলোতে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব :

বিংশ শতাব্দীতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম অসীম তাৎপর্য বহন করেঃ একটি ছিল, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম। আর দ্বিতীয়টি ছিল দুনিয়াব্যাপী উপনিবেশ বিরোধী লড়াই। নতুন শতাব্দীর

ঊষাকালেই পুঁজিবাদ বিশ্বজুড়েই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল নিজের বৃদ্ধি বিকাশের স্বর্থেই। ১৯১৪ র মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তি, তাদের উপনিবেশের সংখ্যা এবং ভূতপূর্ব উপনিবেশ (আমেরিকার) পৃথিবীর মানচিত্রে প্রায় ৮৫ শতাংশ ভূখন্ড দখল করে ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের লক্ষ্যই ছিল গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান—উপনিবেশ ও পুঁজিবাদ। এই উভয় ব্যবস্থারই ধ্বংস সাধন। নিছক রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটানো নয়। তাই, বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র ব্রিটিশ বা ফ্রান্স উপনিবেশের অবসান ঘটেনি। বলশেভিক বিপ্লব অবসান ঘটালো জারের কব্জায় থাকা উপনিবেশগুলোর শাসন এবং তা রূপান্তরিত হলো স্বশাসিত আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রে। এখানেই তা থেমে থাকল না। ইতিহাসে রুশ উপনিবেশগুলো সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল থেকে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক মুক্তির পথে সামিল হয়। নভেম্বর বিপ্লবের পর শুধু নতুন রুশ দেশই জন্ম নিল না। আত্মপ্রকাশ করল ইউ. এস. এস. আর.!

■ মস্কো অভ্যুত্থান ও তারপর : ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার দুর্বিসহ পরাজয়ের পর বহুমাত্রিক সংকট মাথা চাড়া দিল যার ফলস্বরূপ জার কিছু সংস্কার মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ভূমিদাসপ্রথার অবসান। শিল্পে আধুনিকীকরণ, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে। নতুন এক পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যারা শিল্প ও ফিনান্সে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। পাশাপাশি জন্ম নেয় নতুন এক ভূস্বামী শ্রেণী, যাদের কবজায় আসে জমির ব্যক্তি-মালিকানা, আর অনেকেই আধুনিক চাষাবাদ শুরু করে। শতাব্দীর শেষ দিকে, ১৮৯৯ সালে লেনিন লেখেন বিখ্যাত বই ''রুশ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ''— যাতে তিনি দেখালেন যে পুঁজিবাদের নতুন বিকাশের ফলে অর্থনীতিতে বিরাট বদল ঘটেছে, আর কৃষক জনতার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন সর্বহারা বিপ্লবের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে, ১৯০৩ সালে জার-দ্বিতীয় নিকোলাস জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে। এই যুদ্ধে পরাজয় সমস্ত ক্ষেত্রে ডেকে আনে নজীরবিহীন সংকট। অকল্পনীয় মুদ্রাস্ফীতি, তীব্র আর্থিক সংকট, যুদ্ধে রুশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট ডেকে আনে। বলশেভিকদের বাকু কমিটির নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে শ্রমিকদের এক বিরাট সংগঠিত ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটে তৈলখনির মালিকেরা শেষ মেশ শ্রমিকদের দাবি মেনে চুক্তি করতে বাধ্য হয় —যা ছিল রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম চুক্তি! ১৯০৫ র জানুয়ারী মাস থেকে শিল্প শহরগুলোতে একের পর এক ধর্মঘট জারতন্ত্রের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। নারী শ্রমিকরাও স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে থাকে ব্যাপক সংখ্যায়। ধর্মঘটগুলো শ্রমিকদের থেকে নিম্ন মধ্যশ্রেণী, পেশাজীবী মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু কৃষকরা শহরের এই সমস্ত উথাল-পাতাল করা ঘটনা থেকে নিজেদের দূরে রাখে। যুদ্ধের নৃশংসতা ও পরাজয় সত্ত্বেও বেশিরভাগ সেনা জারের প্রতি অনুগত ছিল। বিপরীতে, শ্রমিকশ্রেণীর অভূতপূর্ব ধর্মঘট সংগ্রাম ছিল ঐতিহাসিক; ইউরোপীয় রাশিয়ার অর্দ্ধেক অংশে, যেখানে শিল্পগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল, একের পর এক ধর্মঘট শুরু হয়। ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতাও ছিল অতুলনীয়।

কিন্তু সেই সময় বলশেভিকরা সংখ্যায় ছিল খুবই অল্প। অভিজ্ঞতাও ছিল কম। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের কোন গণ কাজ ছিল না। কৃষকদের মধ্যেও তাদের যোগাযোগ ছিল ক্ষীন। বিপ্লবী পার্টি হিসাবে তা ছিল আনকোরা। লেনিন তখন একের পর এক রাজনৈতিক নিবন্ধে দেখান যে রুশ দেশে শ্রমিকশ্রেনী নির্ণায়ক এক শ্রেনি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কৃষক সমাজকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেনিকে নেতৃত্ব দিয়ে সে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তিনি এটাও বলেন যে রুশ দেশের পুঁজিপতি শ্রেনি স্বাধীনভাবে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়েছে। তাই, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশদেশে পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উদারনৈতিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় মেনশেভিক ধারনাকে খন্ডন করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিশায় শ্রমিক শ্রেণীকে এগিয়ে যেতে হবে। ১৯০৫ সালের বিপ্লব, মস্কো অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। লেনিন দেখান যে সেই সময়ে শ্রেনিশক্তির ভারসাম্য বিপ্লবের অনুকূলে ছিল না। অভাব ছিল শ্রমিক শ্রেনিকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে যোগ্যতাসম্পন্ন বিপ্লবী পার্টি ও সংগঠন। কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকরা ঐক্য স্থাপনেও ব্যর্থ হয়। তথাপি, ১৯০৫র বিপ্লব পরবর্তীততে নভেম্বর বিপ্লবের এক মহড়া ছিল। বহু শিক্ষাই লেনিন নিয়েছিলেন সেই ব্যর্থ অভ্যুত্থান থেকে।

পরবর্তী দশকগুলোতে বলশেভিকরা অনেক বেশি সংঘবদ্ধ। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তাদের সংগঠন, রাজনৈতিক প্রভাব অকল্পনীয় গতিতে ও ব্যাপকতায় বিস্তার লাভ করে। গোপন পার্টির কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী সহ অন্যান্য শ্রেণী ও সামাজিক স্তরকে সংগঠিত করার প্রশ্নে। মেনশেভিকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯১২ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বেশির ভাগ দল ও গোষ্ঠী ''পিতৃভূমি''কে রক্ষা কর'' এই শ্লোগানে গা ভাসিয়ে নিজ নিজ দেশে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোকে সমর্থন জানাতে শুরু করে। লেনিন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি বলেন, ''সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার এই যুদ্ধের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববাজার ও উপনিবেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে নতুন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়া। আর তার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। এই যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানো মারাত্মক অপরাধ।'' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার আহ্বান রেখে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বিপ্লবী কর্মকান্ডে অবিচল থাকেন। ইতিহাস প্রমাণ করল যে ওই দলগুলোর সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ না ঘটালে রুশ দেশে সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন করা যেত না।

■ **ফেব্রুয়ারী বিপ্লব :**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ ধূমায়িত হয় গোটা দেশ জুড়ে। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমজনতা। সেনা নৌসেনা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। খাদ্য-জমি-শান্তির দাবিতে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। ফেব্রয়ারি বিপ্লব শুরু করেন শ্রমজীবী মহিলারা। ১৯১৭ সালের আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে (৮মার্চ) হাজার হাজার মহিলা শ্রমিক খাদ্যের দাবিতে রাস্তায় নেমে একের পর এক কারখানায় গিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার আবেদন জানায়। আগের বছরেই ধর্মঘট শুরু হয়। এবার তা ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। নির্দ্ধারক মুহূর্ত হাজির হলো ফেব্রুয়ারী ২৫-২৭ তারিখে। সেদিন সেনাবাহিনীকে কর্ত্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে

গুলি চালাতে বলে। কিন্তু তারা পুলিশের দিকে গুলি চালিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর বেশিরভাগ শহরাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে, সেতু, অস্ত্রাগারে, রেল স্টেশন শ্রমিকদের দখলে আসে। শ্রমিকরা সোভিয়েত গঠন করে, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ শুধু অন্যান্য শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। রূপ পেতে শুরু করে শ্রমিক-সৈনিকদের ব্যাপক জোট। মার্চের মাঝামাঝি জারতন্ত্রের পতন ঘটে, অবসান হয় ৩০০ বছরের পুরাতন রোমানভ-বংশের শাসন, জন্ম নেয় সাময়িক বিপ্লবী সরকার। প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আট ঘন্টা কর্মদিবস, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়। যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলশেভিক পার্টি প্রকাশ করে এক ঘোষণাপত্র। রাশিয়ার দ্বৈত ক্ষমতার উদ্ভব ঘটে। একদিকে সাময়িক কেন্দ্রীয় সরকারে বুর্জোয়াদের আধিপত্য। আর এলাকায়, নিচুস্তরে, সর্বহারা-সৈনিক-কৃষকদের সোভিয়েত।

অক্টোবরের মধ্যে ২০ মিলিয়ন মানুষ সোভিয়েতের মাধ্যমে নিজেদের সাংগঠিত করে। তারও আগে, ১৯৭৮ র গ্রীষ্মে সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯-১০ মিলিয়ন। যুদ্ধে তিতিবিরক্ত, নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, সশস্ত্র সেনা, কৃষকদের সোভিয়েত, সামরিক ও বিপ্লবী কমিটি, ফ্যাক্টরি ও প্ল্যান্ট কমিটি, পেশাজীবীদের কমিটি ওই সমস্ত কমিটি কাঠামো মারফত বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাজারের অর্থশক্তি এবং পুঁজি সঞ্চয়ের পরিধির বাইরে জমিকে রাখতে কৃষকদের হাতে বন্টিত জমিকে প্রাথমিকভাবে জাতীয়করণ করা হয়, যাতে তা কেনা-বেচা না করা যায়।

রুশ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ বামপন্থী, এমনকি বেশিরভাগ বলশেভিকরা দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর, সমাজতন্ত্র উত্তরণের পর্বে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এক পাকাপোক্ত সংসদীয় উদারবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্য পথ অনুসরণ করতে হবে। বিপ্লবী কর্মকান্ডকে এই রূপে 'পর্যায়ক্রমে' (স্টেজ থিওরি), বিভক্ত করার বিরুদ্ধে লেনিন বারবার সরব হন। এমনকি নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত লেনিন এ প্রশ্নে নিদারুনভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন। লেনিন দৃঢ়ভাবেই মনে করতেন যে পুঁজিবাদের প্রতিটা সংকটকে বিপ্লবী সংকটে রূপান্তরিত করাটা এক বিপ্লবী পার্টির প্রাথমিক কর্তব্য। আর যে কোন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পর্বকাল শ্রমিক কৃষকের-সংগ্রামী চেতনাকে কলুষিত ও ভোঁতা করবো। লেনিনের ধারণা ছিল। পরিস্থিতি পেকে উঠলে বিপ্লবীরা রুশ দেশে ক্ষমতা দখল করতে পারবে, কিন্তু 'যুক্তিগ্রাহ্য' এক এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ তখনই রাশিয়াতে গড়ে ওঠা সম্ভব যখন প্রায় একই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে সফল বিপ্লবগুলো সংঘটিত হবে। এ প্রশ্নে মার্কসের মতো লেনিন-ও মনে করতেন যে, রুশ দেশে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ইউরোপের অগ্রসর সর্বহারা শ্রেণীর সমর্থন। লেনিন এ প্রশ্নে নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এমনই অভূতপূর্ব এক ইউরোপীয় সংকট তৈরি করল। যে তার ফলে অনেকগুলো দেশ বিশেষত জার্মানিতে সফল বিপ্লব সম্ভবপর হয়ে উঠবে। আসলে লেনিনের আশা ছিল যে, রুশ বিপ্লব ইউরোপের বড় বড় বিপ্লবের আগে এক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু সেই আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ জুড়ে বিশেষ করে জার্মানি-ইতালিতে যা মাথা চাড়া দিল, তা বিপ্লবী মার্কসবাদ নয়, বরং ফ্যাসিবাদ তার নখ-দাঁত বার করে সন্ত্রাস-যুদ্ধকেই আরও প্রসারিত করল গোটা বিশ্ব জুড়ে।

■ **নভেম্বর বিপ্লব—** নতুন সাময়িক সরকার ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু জনহিতকর পদক্ষেপ নিলেও যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষে ছিল না। লেনিন বর্জোয়াদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েত গুলোর হাতে তুলে দিতে আহ্বান রাখলেন, যার অর্থ হোল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৬ জুলাই পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় শ্রমিক-সৈনিকরা সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে রাস্তায় নামলে কেরেনস্কি সরকার নির্দয়ভাবে গুলি চালায়। হামলা নামে বলশেভিক পার্টি, শ্রমিক সংগঠনগুলোর ওপর।

অসংখ্য বলশেভিক গ্রেপ্তার করা হয়। দ্বৈত ক্ষমতার অবসান ঘটল। বুর্জোয়ারা কুক্ষিগত করল সমস্ত ক্ষমতা। লেনিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে নতুন পরিস্থিতিতে একমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। ৮ নভেম্বর ১৯১৭ সামরিক সরকারের উচ্ছেদ

ঘটিয়ে বিপ্লবী কমিটি ক্ষমতা দখল করল। সম্পন্ন হলো নভেম্বর বিপ্লব। লেনিনবাদের সৃজনী শক্তিই মার্কসবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাপী মানুষের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিন বিপ্লবে মাও সে তুঙ চিনা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যার সফল প্রয়োগ ঘটান। গোটা দুনিয়া দেখল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কিভাবে পশ্চাদপদ রাশিয়াকে পরিণত করল একটা অগ্রসর জাতিতে। সর্বক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষ সব ধরনের অধিকার ভোগ করতে লাগল যেটা আগে কোনো পুঁজিবাদী দেশে দেখা যায় নি। উদ্ভব হলো মুনাফালোভী বাজার অর্থনীতির জায়গায় পরিকল্পিত জনমুখী অর্থনীতি।

ভারতেও তার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। জাতীয় কংগ্রেসের নবীন নেতাদের অনেকেই সমাজতন্ত্রের আদর্শে প্রভাবিত হন। লেনিন ও রুশ

Liberation of Telanagana Movement by Females

বিপ্লবকে নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর-ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রবন্ধ পাওয়া যায়। নানা দেশে, ভারতেও গড়ে ওঠে কম্যুনিস্ট পার্টি, ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভগৎ সিংর মতো বিপ্লবী ফাঁসির আগে জীবনের প্রেরণা খুঁজে পান লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বইটিতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া চিঠি এরই ধারাবাহিকতায়।

ভালভাবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র গঠনের আগেই লেনিনের অসুস্থতা ও মৃত্যু; স্তালিনের দীর্ঘ ক্ষমতায় বাড়াবাড়ি, অতিকেন্দ্রিকতা, তাড়াহুড়োবাদ, পাশ্চাত্যের ধনী উন্নত দেশগুলির সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা, গণতন্ত্রকে খর্ব, পশ্চাদপর অর্থনীতির বৈশীটাই সামরিক-গোয়েন্দাগিরি-মহাকাশ গবেষণায় ব্যয় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিকৃতির জন্ম দেয়। পরবর্তিতে ক্রুশ্চেভের স্বল্প শাসনে সমাজ গণতান্ত্রিক উদারতাবাদী বিচ্যুতি এবং ব্রেজনেভের দীর্ঘ শাসনে রক্ষণশীল পশ্চাদপর স্থিতাবস্থা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ভাঙ্গনের দিকে ঠেলে দেয়। এরপর গর্বাচভ-ইয়েলৎসিন যুগলবন্দীতে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ সোভিয়েত রাশিয়ার ৭৪ বছরের সমাজতন্ত্র তার এশিয় ইউরোপীয় উপগ্রহ দেশগুলি নিয়ে অবশেষে ভেঙ্গে পড়ে।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে সমাজতন্ত্র পিছু হঠলেও বিভিন্ন দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও অব্যাহত। নয়া উদারবাদী অর্থনীতি আজ গভীর সংকটে জর্জরিত। ইউরোপের নানা দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভ্যন্তর থেকেই জন্ম নিচ্ছে নয়া ফ্যাসিবাদ-নয়া নাৎসিবাদ। এর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম আজও চলছে সমান গতিতে, বিশ্বজুড়ে। তাই, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মৃত্যু নেই। তা আজও, শপথে, রাজপথ লড়াইয়ের মাধ্যমে মূর্ত্তরূপে দীপ্যমান।

বি:দ্র: রাশিয়ায় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল। যা গ্রোগোরিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে ১৩ দিন পেছনে। যেমন, নারী শ্রমিকদের ঐতিহাসিক লড়াই শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসে। ৮ই মার্চ, গ্রোগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। কিন্তু জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তার তারিখ ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী। সেই জন্য ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, বা অক্টোবর বিপ্লব নামকরণ হয়। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডারে তা হয় মার্চ ও নভেম্বর বিপ্লব।

সাম্প্রতিক ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

নীলকণ্ঠ আচার্য

গত ৫ই মার্চ ২০১৮, অর্থাৎ ফলাফল ঘোষণার দুদিন পরেই মানিক সরকার সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন সে এই ফলাফল তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত ছিল। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং অভিজ্ঞ নেতা হিসেবে তাঁর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

যে দল এবং নেতৃত্ব দীর্ঘ দিন যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তার কাছে এতবড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনো পূর্বাভাস ধরা দেয়নি, তা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর। নিজের দল থেকে মোট ৩৪টি আসন হারানোর কোনো ইঙ্গিত তাঁরা পাননি, এটা কিভাবে সম্ভব? সুতরাং একটাই প্রশ্ন মুখ্যত কেন্দ্রীভূত এবং তা হল সি পি আই এম-র এই ধরাশয়ী অবস্থা এবং বিজেপির এই অভূতপূর্ব উত্থানের প্রধান কারণ এবং অন্যান্য কারণগুলি তবে কি কি?

প্রধান কারণ— সিপিআই এম নেতৃত্বের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতা, সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে :—

(১) বিজেপির এর ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি ও উত্থান সম্পর্কে আগাম বুঝতে না পারার এই রাজনৈতিক দুরদর্শিতার অভাব।

(২) বিজেপি-এর সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী রাজনীতিকে পাল্টা রাজনৈতিক প্রচারে মোকাবিলা করতে না পারা।

তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এই মন্তব্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(৩) নিজেদের পক্ষে থাকা প্রায় ৭% ভোটারদের (১,০১,২৫২ ভোটার) রাজনৈতিকভাবে ধরে রাখতে না পারা।

(৪) নেতৃত্বহীন কংগ্রেস দলের সঙ্গে থাকা প্রায় ৩৮.৬% ভোটারদের (৮,০৪,৪৫৭), যাঁরা বহুদিন যাবৎ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাচ্ছিলেন, তাদের অন্তত কিছু পরিমাণকেও নিজেদের পক্ষে আনায় কোনো কার্যকরি রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে না পারা।

(৫) নতুন প্রজন্মকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে না পারা এবং ফলস্বরূপ নবীন রাজনৈতিক শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হওয়া।

(৬) বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা যেটা প্রধানত নেতাদের দম্ভ, অহংকার ও তজ্জনিত বিরূপ ব্যবহার।

(৭) সিপিআইএম নেতৃত্বের মধ্যে রাজনৈতিক দোদুল্যমান্যতা (প্রকাশ কারাট বনাম সীতারাম ইয়েচুরী) ইত্যাদি কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব।

(৮) উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাবকে বৃদ্ধি করতে না পারা এবং ফলস্বরূপ গত ২০১৩ সালের নির্বাচনে আই.এন.পি.টি. (ইনডিজেনাস ন্যাশনাল পার্টি অফ ত্রিপুরা) নামক উপজাতি দলের পক্ষে থাকা ৭.৬% মানুষদের (১,৫৭,০৭৮ ভোটার) যারা এতদিন নেতৃত্বহীন ছিলেন, তাদের কাউকেই নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে না পারা। যারফলে এই সমস্ত অংশটাই আই.পি.এফ.টি. নামক দলের মাধ্যমে বিজেপির জোট সঙ্গীতে পরিণত হওয়া।

উক্ত রাজনৈতিক ব্যর্থ্যতার পাশাপাশি নিম্নলিখিত প্রশাসনিক ব্যর্থতাগুলিও অন্যতম কারণ—

(১) চাকরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বজন-পোষনের অভিযোগ।

(২) নয় হাজার শিক্ষক নিযুক্তিতে বে-নিয়ম এবং আদালতের রায়ে এই শিক্ষকদের নিয়োগ বাতিলের কারণে জনমনে হতাশা।

(৩) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি না হওয়া এবং চতুর্থ পে-কমিশনেই আটকে থাকা।

(৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুলতা বা গুণমানের অভাব।

(৫) উপজাতি অঞ্চলে উন্নয়নের অভাব।

(৬) শহরাঞ্চলে রাস্তাঘাটের সহ পরিকাঠামোর বেহাল অবস্থা ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় জনমানসে একটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সেই সুযোগে আর.এস.এস. ও বি.জে.পি. নেতৃত্ব সুপরিকল্পিতভাবে নিম্নলিখিত মুখ্য পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে—

(১) কংগ্রেস ও উপজাতি ভোটব্যাংক-কে (যা যথাক্রমে প্রায় ৩৫.৬% অর্থাৎ প্রায় ৮,০৪,৪৫৭ ভোটার এবং ৭.৬% অর্থাৎ (প্রায় ১,৬৭,০৭৮ ভোটার) নিজেদের পক্ষে টেনে আনার জন্য নানারকম বোঝাপড়ায় নেমে পড়ে গেরুয়া নেতৃত্ব। এরজন্য যথাসম্ভব অর্থবল এবং অঘোষিত ও ঘোষিত প্রতিশ্রুতির কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

ফলস্বরূপ গত বিধানসভার বিরোধী অংশকে (কংগ্রেস বিধায়কদের) সম্পূর্ণভাবে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সফল হয়। বর্তমানের ৩৫ জন বিধায়কের মধ্যে প্রায় ২০-২২ জন বিধায়ক কংগ্রেস দল থেকে চলে আসা।

একইভাবে, উপজাতি-শক্তিগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আসন রক্ষা হয় যার ফলে ২০টি উপজাতি সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রের মধ্যে ১৯টি তেই সিপিআইএমের পরাজয় ঘটে। এর মধ্যে ১১টিতে বিজেপি এবং ৮টিতে আই.পি.এফ.টি প্রার্থীরা জয়লাভ করে।

(২) প্রচার মাধ্যমের সংগঠিত ব্যবহার, নির্বাচনী প্রচারে শীর্ষনেতৃত্বের চমকপ্রদ অংশগ্রহণ ও অর্থবলের যথেচ্ছ প্রয়োগ।

(৩) তরুণ প্রজন্মের একাংশকে বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে (স্মার্টফোন প্রদান, ক্লাবে-ক্লাবে অর্থ প্রদান ইত্যাদি) এবং উগ্র দেশপ্রেম সহ ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টির মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা।

(৪) গত বিধান সভার নির্দলীয় প্রার্থী ও ভোট ব্যাংক-কে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আনাতে সফল হওয়া।

(৫) আরেকটি বিশেষ কারণ এখানে কাজ করে থাকতে পারে এবং সেটি হল, প্রায় ৯০ হাজারের মত ভোটার নতুনভাবে সংগৃহীত হয়েছে যাদের উৎপত্তি খুবই সাম্প্রতিক। এই সংখ্যাটি মোট প্রদত্ত ভোটের প্রায় চার শতাংশ।

■ সাময়িক উপসংহার :—

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গেরুয়া নেতৃত্বের (বিজেপি-আর এস এস) পক্ষ থেকে আগামী ২০১৯ এর পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি কি কি হতে পারে তার একটা প্রতিচ্ছবি গঠনের চেষ্টা করা যাক।

প্রথমে দেখা যাক যে বিজেপি - আরএস এস নেতৃত্বের কাছে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দুটি কি কি ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাদৃশ্যগুলি হাজির করেছে এবং করছে। এই সাদৃশ্যগুলি হল—

(১) দুটি ক্ষেত্রেই বিজেপি - আর এস এস এর রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি প্রাথমিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং আছে। যদিও দুটি ক্ষেত্রেই আর এস এস-এর কাজ বহুদিন থেকেই প্রথিত কিন্তু এই সাংগঠনিক কাজের দীর্ঘসূত্রীতার বিচারে রাজনৈতিক ফসল উৎপাদন আদৌ সন্তোষজনক ছিল না ও নেই।

(২) দুটি ক্ষেত্রেই বাম রাজনীতির— দীর্ঘসূত্রীতা থেকেছে এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে বিপুল সংখ্যক আসন দখলে থেকেছে ও আছে।

(৩) দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির (সিপিআই এম, টি এম সি) সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক মান রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে যে দুর্ভেদ্য ছিল ও আছে, বলা যায়নি বা যাচ্ছে না। কারণ, ত্রিপুরাতে সি পি আই এম-এর মধ্যে বাম রাজনীতির গুণমানের চরম অবনমন ঘটে চলেছিল এবং বর্তমান পশ্চিবঙ্গের টি এম সি-র মধ্যে তো সেরকম কোনো রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্বই নেই। একমাত্র ''মা-মাটি-মানুষ'' আর ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা''-র মত অন্তঃসারশূন্য — শব্দবন্ধ ছাড়া! অর্থাৎ, দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলকে বাহ্যিকভাবে বিপুল সংগরিষ্ট দেখালেও, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরা দুর্বল থেকেছে ও থাকছে।

(৪) উভয় ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-বাঙালী জনমানস বিরাজমান এবং তার মধ্যে আবার মধ্যবিত্ত সুলভ ধর্মীয় আবেগে তাড়িত হওয়ায় মত সহজাত মননবোধও বিরাজমান যে মননবোধ নির্বোধের মত নাটকীয়, আবেগপ্রবণ ধর্মীয় প্রচারে সহজেই আপ্লুত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বহন করে।

(৫) উভয় ক্ষেত্রেই বিধায়করা ক্রয় বিক্রয় যোগ্য। কংগ্রেসী বিধায়েকরা ও ভোটব্যাংক বিদ্যমান। কংগ্রেসী, অর্থাৎ টি এম সি-এর আদি কংগ্রেসী ব্যক্তিবর্গ এবং টি এম সি-এর বাইরে জাতীয় কংগ্রেস নামক কংগ্রেসী ব্যক্তিবর্গ দল বদলের ক্ষেত্রে খুবই উঁচুমানের সওদাগীরিতে পটু। এদের কোনো জড়তা থাকার কথা নয়।

সুতরাং এই সকল সাদৃশ্যের কারণে যে সকল কৌশলগত পদক্ষেপ গেরুয়া নেতৃত্ব নিতে পারে সেগুলি হল—

(ক) বিপুল মাত্রায় অর্থবলের প্রয়োগ। এরজন্য মুকুল রায় জাতীয় প্রাক্তনীদের মাধ্যমে অন্যান্য টি এম সি-সংগঠক, নেতা, ক্লাব ইত্যাদির সঙ্গে চরম সেতুবন্ধন গড়ে তোলা। এসব ক্ষেত্রগুলিতে সফলতা আসা সম্ভব।

(খ) যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজে বর্তমানে সেই অর্থে এমন কোনো সাবলীল রাজনৈতিক মতাদর্শগত পরিবেশ নেই, তাই গেরুয়া নেতৃত্বের দ্বারা যথাসাধ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মতাদর্শ, উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র দেশপ্রেম, অর্থাৎ এককথায় আর. এস. এস-এর মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে।

(গ) রাজনৈতিক প্রচারের কিছু চমকপ্রদ পদক্ষেপ বা চমক সৃষ্টি বা কোনো ঘটনার সৃষ্টি যার থেকে রাজনৈতিক লাভ সংগ্রহ করা যায়।

কিন্তু অপরদিকে তাকালে এও দেখা যায় যে এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। সেগুলি হল নিম্নরূপ এবং সেগুলির ভিত্তিতে হয়তো এই গেরুয়া নেতৃত্বকে ত্রিপুরা রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা ভিন্ন অবস্থানও গ্রহণ করতে হতে পারে—

(১) বিধানসভা নির্বাচনের পরিবর্তে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি লোকসভা নির্বাচন। ফলস্বরূপ, এক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিকের বদলে কেন্দ্রভিত্তিক রাজনৈতিক ইস্যুগুলি প্রাধান্য পাবে।

(২) লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রগুলি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের তুলনায় আকারে অনেক বড়।

(৩) এই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতি সরাসরি বিধানসভা দখলের রাজনীতির সাথে এই মুহূর্তে জড়িত নয়।

ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনী প্রেক্ষাপটে, উক্ত বৈশাদৃশ্যগুলির ভিত্তিতে গেরুয়া নেতৃত্বের অতিরিক্ত ভিন্নতা বিশিষ্ট সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি হল—

(ক) এই লোকসভা নির্বাচনে অধিক আসনের দখল করার পরিকল্পনার বদলে কেবলমাত্র আরো কয়েকটি আসন দখলের লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের শক্তিকে সর্বত্র নিয়োজিত না করে সম্ভাব্য জয়ের কেন্দ্রগুলিতে নিয়োজিত করে আসন দখলের সম্ভাবনাকে যথাসাধ্য সুনিশ্চিত করা এবং এই সুফলকে পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে (২০২১) কাজে লাগানো।

ত্রিপুরা : এক চমকের অভ্যন্তরে

রতন দাস

■ **এক নজরে ত্রিপুরা :** ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তের দক্ষিণ-পশ্চিম তম চারদিক ঘেরা ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রায় তিনদিক বাংলাদেশ ঘেরা। পূর্বদিকে মিজোরাম। তারপরই মায়নমার সীমানা। পূর্ব দিকের একফালি জমি ভারত ও অসমের কাছাড়ের সাথে জুড়ে রেখেছে। এই সেদিন পর্য্যন্ত রেল যোগাযোগ ছিল না। কোন বড় শিল্প, খনিজ নেই, নেই কোন বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ। দুর্গম, প্রত্যন্ত। রয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ, যদিও তার সেরকম বাজারজাতকরণের সুযোগ নেই। তাই বর্ষা নির্ভর এক বা দু ফসলী চাষ কিংবা বাঁশ, আনারস,

কাঁঠাল, রবার, চা, আদা, ধান, আনাজের এবং হস্তশিল্পের কিছু ব্যবসা ও কৃষির সাথে ছোট ব্যবসায়ীই এখানকার ক্ষুদ্র অর্থনীতি। উপজাতি প্রধান এই রাজ্য (রাজতন্ত্র থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য) জনবিরল থাকলেও দাঙ্গা, দেশভাগের ফলে '১৯৪৬-'৪৭ থেকে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙালী উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। ফলে লোকসংখ্যা বাড়ে। বাড়ে বাঙালীদের ক্রমবর্দ্ধমান জমি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল এবং উপজাতিদের সাথে সঙ্ঘর্ষ। বর্তমানে জনসংখ্যা ৩৭ লক্ষের মধ্যে ১৭% উপজাতি, বাকিটাই বাঙালী। উপজাতিদের মধ্যেও অনেক ভাগ। ককবরক ভাষী ত্রিপুরিরা প্রধান (উপজাতিদের ৫৫%, মোট জনসংখ্যার ১৩%) এছাড়াও রয়েছে রিয়াং (উপজাতিদের ১৭%), জামাতিয়া (৭.৫%), চাকমা (৬.৫%), হারাম (৪.৮%), মগ, মুন্ডা, কুকি, গারো প্রভৃতি। উপজাতিরা মূলত বড়মূড়া, আথারামূড়া, লংতরাই, শাখান আর জাম্মই— পাঁচটি পার্ব্বত্য ও জঙ্গল প্রধান অঞ্চলে থাকেন। আয়তন ১০,৪৯১ বর্গ কি.মি. (২৩.৮৪° নর্থ ও ৯১.২৮° ইস্ট) এবং লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৩৫০ জন/ বর্গ কি.মি.। শিক্ষার হারে ভারতের মধ্যে অগ্রনী (৯৫%)। সীমিত সরকারি চাকরি, পরিষেবাই কর্মসংস্থানের উৎস। বেকারত্ব প্রবল। বিধানসভা আসন ৬০টি। লোকসভা দুটি ও রাজ্যসভা একটি। আগরতলা রাজধানী ও বিমানবন্দর। আটটি জেলা (ধলাই, কৈলাশহর, উদয়পুর, আগরতলা, খোয়াই, উনকোটি, সিপাহিজলা ও গোমতি), ২৩ টি মহকুমা এবং ৫৮ টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক। ১৯৪৯ তে ত্রিপুরার মহারাজের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ত্রিপুরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ১৯৭২ এ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়।

■ **২০১৮-র বিধানসভা আসনের ফলাফল :** ৬০টি আসনের মধ্যে ৩১ টি আসন পেলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া যাবে। বিজেপি, যারা ১৯১৩ বিধানসভায় কোন আসন পায়নি ও ১.৫৪% ভোট পেয়েছিল, তারা পেল ৩৫টি আসন (৪৪% ভোট), তার জোটসাথী আই.পি.এফ.টি পেল ৯টি আসন (৮%) ভোট। দুইয়ের জোট পেল ৪৪ টি আসন (৫২%) ভোট। কংগ্রেসের ভোট কমে গেল প্রায় এক শতাংশে, তৃণমূল কংগ্রেসের আরও কম। ক্ষমতাসীন সিপিআইএমের ভোট ৭%-র মত কমে দাঁড়াল ৪২% এবং আসন অনেক কমে দাঁড়াল ১৬। অন্যান্য ৫% ও নোটা ১% ভোট। সিপিআইএম প্রার্থী খগেন্দ্র জামাতিয়ার মৃত্যুতে একটি আসনে পরে নির্বাচন হয়। সেখানে সিপিআইএম সন্ত্রাসের অভিযোগে প্রার্থী সরিয়ে নেয় এবং বিজেপি প্রার্থী রাজপরিবারের সদস্য জিষ্ণু দেববর্মা যেতেন ও উপমুখ্যমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রী হন সঙ্ঘ প্রচারক বিপ্লব দেব।

■ **আগে কি ছিল?** ১৯৭২ থেকে বিগত ৫০ বছরের ত্রিপুরায় প্রথম দশ বছর ছিল দুবার ক্ষণস্থায়ী কংগ্রেস ও দুবার গণতান্ত্রিক কংগ্রেস ও জনতাপার্টির ক্ষণস্থায়ী সরকার এবং দুদবার রাষ্ট্রপতির শাসন। ১৯৭৩ এ জরুরি অবস্থা অবসান ও ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের পর ১৯৭৮ এ ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জয়ী হয়। সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য নৃপেন চক্রবর্তীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে দশ বছরের দুদুটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশ বামফ্রন্ট সরকার। তারপর বিজয় রাংখেলের

নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর উপজাতি উগ্রপন্থা এবং কংগ্রেসের দাপুটে নেতা সন্তোষ মোহন দেবের নেতৃত্বে নানারকম ষড়যন্ত্র আক্রমণের সামনে বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে কংগ্রেস সরকার আসে। সুধীর মজুমদার ও সমীর বর্মনের মুখ্যমন্ত্রীতে নানা অশান্তিতে কংগ্রেস চারবছরও চালাতে পারেনা। তারপর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি। তারপর নির্বাচনে সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দশরথ দেবের মুখ্যমন্ত্রীতে বামফ্রন্ট সরকার। দশরথ দেবের মৃত্যুর পর টানা প্রায় ২০ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্ব মানিক সরকারের। চারটি বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ও টানা জয়। রাজ্যে শান্তির বাতাবরন, উগ্রপন্থা নিয়ন্ত্রণ। উপজাতিদের মূল স্রোতে আনা। আফসপা তুলে নেওয়া। উপজাতি, গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের জমির পাট্টা দান। গড় আয় বৃদ্ধি। শিক্ষার হারে দেশের প্রথম। মানিক বাবুর স্বচ্ছ ও জনপ্রিয় ভাবমূর্তি। নির্বাচনে জেতার পরও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব প্রকাশ্য মঞ্চে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। তাহলে এরকম হল কেন? এবার তার অনুসন্ধানে আমরা যাত্রা শুরু করি।

■ **বিজেপির চমকপ্রদ উত্থানের নেপথ্যে :**

(এক) বিগত পাঁচদশক ধরে 'রাষ্টীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর.এস.এস.)' এবং তার 'বনবাসী কল্যান সমিতি' প্রমুখ শাখা সংগঠনের ত্রিপুরায় বাঙালী উদ্বাস্ত ও উপজাতিদের মধ্যে ধারাবাহিক কাজ। প্রথমে স্কুল তৈরী করে, খাদ্য সরবরাহ, ত্রান বিলি, সামাজিক সহায়তা দিয়ে গণভিত্তি অর্জন। তারপর হিন্দুত্ববাদ প্রচার, প্রসার ও সশস্ত্র শাখাগুলি গঠন। গত তিনবছরে কেন্দ্রে মোদি সরকার আসার পর এর গতি বৃদ্ধি। অতীতে উপজাতি উগ্রপন্থী ও সিপিআইএম ক্যাডারদের হাতে মার খেয়ে ও খুন হয়েও আর.এস.এস প্রচারকরা ত্রিপুরার পাহাড় ও উপত্যকায় দাঁত

কামড়ে পড়ে থাকেন। এবার দক্ষ সরসঙ্ঘচালক সুনীল দেওধরকে আর.এস.এস-বিজেপি সুসমন্বয়, বিজেপি সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবকে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধিতে এবং তথাগত রায়কে রাজ্যপাল হিসাবে প্রশাসনে চাপ রাখতে ও প্রশাসনকে সিপিআইএমের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতে পাঠানো হয়। নাগপুর থেকে পাঠানো হয় ঘরের ছেলে তরুন প্রচারক বিপ্লব দেবকে। এদের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে বামফ্রন্ট বিরোধী প্রচার জোরালো করা হয়। প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া শুরু হয়। সিপিআইএমের শক্তিশালী সংগঠন ও মেসিনারির সাথে সমানে সমানে পাঙ্গা কষা হয়। ১৫ ডিসেম্বর' ১৭ মোহন ভাগবতের জনসভায় বিরাট জমায়েত করা হয়। গত তিন বছরে আর.এস.এসের শাখা বেড়ে হয়েছে ২৭২ টি।

(দুই) এ যাবৎ কাল সিপিআই এম জিতলেও কংগ্রেস প্রায় ৪১% ভোট পেয়ে যেত। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এতবড় ভোট ব্যাঙ্ক সত্ত্বেও কোনদিন ক্ষমতা দখলের জন্য সেভাবে ঝাঁপাতেন না। কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন পাঁচ বারের বিধায়ক ছিলেন। কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের হতাশা কাটিয়ে ত্রিপুরায় দলকে শক্তিশালী করতে তৃণমুল নেত্রী কয়েক বছর আগে উদ্যোগ নেন। তার নির্দ্দেশে দক্ষ ম্যানেজার মুকুল রায় সমগ্র কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীদের কয়েক বছর আগে তৃমমূলে নিয়ে আসেন। আবার সম্প্রতি মুকুল রায় বিজেপিতে গিয়ে এই শক্তিটিকে বিজেপিতে নিয়ে আসেন। এই ভোটে উদ্দীপিত বিজেপি ঝাঁপিয়ে পড়ে সমগ্র বাম বিরোধী ভোট অর্থাৎ সমস্ত কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস ভোট এবং নিজেদের ভোট নিজেদের পক্ষে টেনে আনেন। এবার বিজেপির ৩৬ জন জয়ী বিধায়কের মধ্যে ২৫ জনই পুরনো কংগ্রেসী।

(তিন) উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে ক্ষোভ ও বাঙালি বিদ্বেষ বাড়ছিল। সঙ্ঘ পরিবার উপজাতি অঞ্চলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া বাঙালী ও বাঙালী পার্টি সিপিআইএমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে কাজে লাগায়। অন্যদিকে প্রাক্তন উপজাতি জঙ্গী সংগঠন এন.এল.এফ.টি থেকে উত্তরীত রাজনৈতিক দল খগেন দেব বর্মার নেতৃত্বাধীন আই. পি.এফ.টির অনেকদিনের পরিকল্পনা ছিল ক্ষমতায় আসা। তাদের পৃথক তিপারাল্যান্ড রাজ্যের দাবী বামফ্রন্ট নস্যাৎ করে। সঙ্ঘ পরিবার ভেতর থেকে উৎসাহ দেয়। ফলে তিপারাল্যান্ডের আবেগজনিত উপজাতি ভোট বিজেপির পক্ষে ও সিপিআইএমের বিপক্ষে এক কাট্টা হয়ে যায়। এর পর বিজেপি-আইপিএফটি জোট ছিল সঙ্ঘ পরিবারের মাষ্টার স্ট্রোক। সিপিআইএম তার এতদিনকার ভিত্তি উপজাতি অঞ্চল থেকে ধুয়ে মুছে যায়।

(চার) বারবার জিতে সিপিআইএমের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও নিস্ক্রিয়তা। একদিকে সিপিআইএম এবার হারার আগেই হেরে বসেছিল। তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচারকে ঠিকমত মোকাবিলা করেনি। অন্যদিকে নাক উঁচু মানিক সরকার— বিজন ধররা বিজেপির এই আগ্রাসনকে আমলই দেননি। সরকার পরিচালনাতেও এক গয়ংগঞ্জভাব চলে এসেছিল। দলবাজি, পক্ষপাত, সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল। তার সাথে যুক্ত হল 'রোজভ্যালি', 'শিক্ষকনিয়োগ' নিয়ে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, আমলাতন্ত্র। নেতারা উদ্ধত, গণ-বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছিলেন। প্রশাসন, গতানুগতিক, ঢিলে ও নিস্ক্রিয়। রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো করুণ হলেও তেমন উদ্যোগ ছিল না। আইন শৃঙ্খলারও অবনতি হচ্ছিল।

(পাঁচ) ব্যাপক বেকারত্ব। বামফ্রন্ট শাসন এটিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। চারিদিকে শিক্ষিত বেকারদের হাহাকার। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং প্রতি ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মন জয় করলেন।

(ছয়) প্রচারের জৌলুষ ও অভিনবত্ব। বিজেপি প্রচুর খরচ করে। তরুণদের স্মার্ট ফোন ইত্যাদি দেয়। প্রচুর তরুণ, মহিলা ও উপজাতি কর্মীকে সামিল করে। মোদি, অমিত শাহ্‌দের প্রচারে নিয়ে আসে। বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তর ও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগায়। চকচকে আগরতলা-ব্যাঙ্গালুরু 'হামসফর' এক্সপ্রেস চালু করে। গুয়াহাটি রাজধানী এক্সপ্রেসকে আগরতলা অবধি নিয়ে যায়। প্রভাবশালী সরকারি কর্মচারীদের পঞ্চম পে কমিশনের আশ্বাস দেয়। সঙ্ঘ পরিবার সিপিআইএমের অপশাসনে নিয়ে লেখা দীনেশ কাঞ্জির 'মানিক রাজার দেশে' আর সুশীল শর্মনের ফিল্ম 'লাল সরকার' ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয় ও পাড়ায় পাড়ায় দেখাতে থাকে। এভাবেই ব্যাপক সংখ্যক ভোটারদের 'চলো পাল্টাই' শ্লোগানে আন্দোলিত করে।

(সাত) বাঙালী ও উপজাতিদের মধ্যেও ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরনের রাজনীতি চালিয়ে যায় বিজেপি-সঙ্ঘ পরিবার। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের মধ্যে আবার নাথ সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (২২%)। তাদের ভোট সংগঠিত করতে যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে আসা হয়। এভাবে বিজেপি ২০১৪ লোকসভায় ৫.৭% ভোট পেয়ে এবং ২০১৫-র আঞ্চলিক বডি নিবার্চ্চনে ১৪.৭% ভোট পেয়ে নিজেদের বাড়িয়ে চলে।

(আট) কেকের উপর ক্রিমের আস্তরন লাগান পূর্বতন কংগ্রেসী মন্ত্রী এখন উত্তর-পূর্বে বিজেপির সব চাইতে দাপুটে ম্যানেজার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সমস্ত বিরোধিদের একজোট করে । প্রচারের তুঙ্গে সরাসরি মানিক সরকারকে আক্রমণ করে। নির্বাচনের আগের ক মাস শোনা যায় তার টাকা ভর্তি বিশেষ প্লেন গুয়াহাটি ও আগরতলার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করত।

(নয়) বিএসএফ, কেন্দ্র বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের সহায়তা নিয়ে, ইভিএম ও ভিভি প্যাডের কারচুপির অভিযোগ নিয়ে নির্বাচনের দিনে পোলিং করানো হয়। সিপিআইএমের ঢঙে অনেক কেন্দ্রেই বিরোধী ভোটারদের ঘেষতে দেওয়া হয় না। চলে ছাপ্পা ভোট।

■ **নির্বাচন ও তারপর :** নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার এসেছে। তারা উন্নয়নের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, গতিশীল প্রশাসন চাইছেন এবং পৃথক তিপারাল্যান্ড নস্যাৎ করেছেন। সিপিআইএমের

তথাকথিত দুর্গে সিপিআইএম কে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করাটা বিজেপির কাছে গর্বের ও শ্লাঘার। তাই মতাদর্শগত ও প্রতীকীভাবে আক্রমণ আরও তারা বাড়াবে। বিলোনিয়ায় লেনিন মূর্তি ভাঙ্গা তার সুপরিকল্পিত অঙ্গ। বৃহৎ পুঁজি তার নতুন অনুঢ়া প্রাকৃতিক উৎস ভান্ডার ও বাজারের খোঁজে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এবং তাদের ছাড়িয়ে মায়ানমার, তাইল্যান্ড, কম্পোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়ার দ্বারপ্রান্তে যেতে চাইছে। তাই তাদের মুখে 'লুক ইস্ট' ও 'বিমসটেকে'-র জয়গান। বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে চীনের সীমান্তের কাছাকাছি ত্রিপুরা রনকৌশলগত কারণেও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল-ভারত রণজোটের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নি:সন্দেহে এটি বিজেপির বিরাট জয়, তার চাইতেও বামফ্রন্টের ও সিপিআইএমের বড় পরাজয় ও দেউলিয়াপনা। কিন্তু ত্রিপুরাই শেষ কথা নয় বা ত্রিপুরাই ভারত নয়। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের লাল মিছিল এবং উত্তরপ্রদেশে বুয়া-বাবুয়া জোটের জয় তারই প্রমাণ।

মাথাভাঙ্গা ও চূর্নি নদী বাঁচাও আন্দোলন

স্বপন কুমার ভৌমিক

■ জেলার জলাভূমিতে মৎসজীবীরা অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার :

'মৎস্য ধরিব খাইব সুখে' বাঙালীর প্রবাদবাক্য নদীয়া জেলায় অসংখ্য খাল বিল নদী বর্তমান। গঙ্গা বা ভাগিরথী, জলঙ্গী, মাথাভাঙা, চূর্ণী, ইছামতী, পলদা, ভৈরব সহ নানা ছোট নদী সহ অসংখ্য খাল বিল, ডোবা, পুকুর, জলাশয় বর্তমান। নদী বিধৌত নদীয়ায় পর্যাপ্ত মাছ চাষের

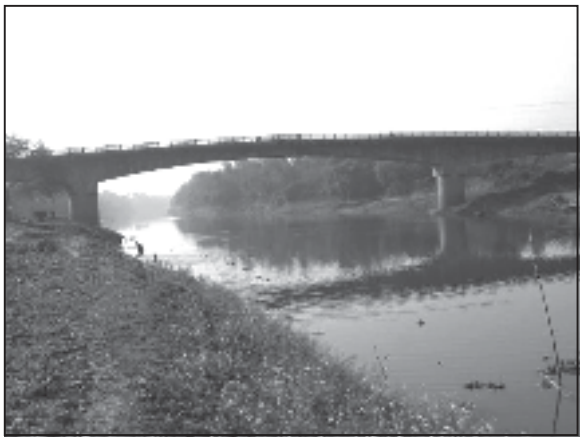

অনুকূল পরিবেশ। পলদা ফিসারীজ এক সময়ে তিনবার সারা ভারতের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। সেই পলদা ঘিরে এখন অজস্র মাছের ভেড়ী হয়েছে। ভাগভাগ করে কিছু মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করে সোসাইটি লাভের অঙ্ক ঘরে তোলে। নিজেরা মাছ ছাড়ে না। টেণ্ডার হয় সরকারীভাবে। এবারও আবার পূর্বের টাকা জমা না দিয়েও পেতে চলেছে। বাম আমলে পলদার জলাধার খনন করে কোটি কোটি টাকা অর্থ লুঠের সংবাদও আমরা করেছি। মৎস্যজীবী সমবায়গুলিকে অর্থ লুঠের আখড়া না বানিয়ে মৎস্য উৎপাদনে আরও সক্রিয় করতে পারলে এ রাজ্যকে অন্ধ্রপ্রদেশের মাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। এ সব কথা কেউ শুনবেন না। যেমন ৬০ বছর ধরে মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদীকে মাছশূন্য করে রেখেছে বাংলাদেশের কেরু এণ্ড কোম্পানী। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সবই জানেন। তবু তারা চুপচাপ কেন? আসলে এই দুই নদী তীরের ১২০ টা গ্রামে ত্রিশ হাজার মৎস্যজীবী পরিবারের বসবাস। তারাও এতদিন চুপ ছিলেন। এবারে মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটি ও দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সহ বিভিন্ন সংগঠন স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা সহ হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী দুই নদীকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে। কেরু কোম্পানীর দূষিত জলে নদীতীরের মৎসজীবীদের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হচ্ছে। এজন্য তাঁরা মাসে পরিবার পিছু ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এজন্য চিঠি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয়ও নেওয়া হবে। নদীর বাধাল দেওয়া নিয়েও গরীব মৎস্যজীবী পরিবারদের ক্ষোভ রয়েছে। সরকারী অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার মৎস্যজীবীরা। জীবন বিপন্ন, জীবিকা খুঁজতে হয়রান। অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় অবসানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধু চমক দিলে হবে না মানুষের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে হবে। বিপন্ন নদ-নদী জলাশয়গুলিকে বাঁচাতে হবে। পরিবেশ বাঁচবে, নদীও বাঁচবে।

■ মাথাভাঙা-চূর্ণী নদীর মাটি চুরির কাজে ইঁটভাটাগুলি সক্রিয় :

প্রতিদিন শয়ে শয়ে ট্রাক্টরে ট্রাক্টরে মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী থেকে মাটি কেটে ইঁটভাটার জন্য মাটি নিয়ে পাহাড় তৈরী করা হচ্ছে। যেভাবে গর্ত কেটে নদীর পাশে গভীর পুকুর করা হচ্ছে নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দারা উদ্বেগে আছেন এইসব গর্তে তলিয়ে যাবে না তো ছোট ছোট শিশুরা? তেঘড়ী গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন। তারা প্রতিবাদ পত্র জমা দিয়েছেন বি.এল.এল.আর.ও অফিসে। মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক স্বপন কুমার

ভৌমিক এ বিষয়ে বি.এল, এল.আর.ও কে ঘটনার কথা জানিয়েছেন গত ২৮ শে ডিসেম্বর। তেঘড়ী গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছে।

মালিঘাটা, তালদহ, বানপুর গ্রামবাসীরাও স্থানীয় ইঁটভাটার মাটি কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার।

■ বি.ডি.ও. সমীপে মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটির ডাকে বিভিন্ন দাবীতে স্মারকলিপি প্রেরক :

মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহায়তায় প্রায় পাঁচ শতাধিক নদীতীরের মৎস্যজীবী পরিবারের পুরুষ মহিলারা দলে দলে সমবেত হয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রায় ২৫টি গ্রাম থেকে গত ৮ফেব্রুয়ারী দুপুর বারোটা থেকে বি.ডি.ও. অফিসের মাঠে সকলেই জমায়েত হন। কমিটির পক্ষ থেকে

স্বপন কুমার ভৌমিক, বিবর্তন ভট্টাচার্য, সুফল হালদার, লক্ষণ হালদার, সখারাম হালদার, অসিত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বি.ডি.ও. সহ মৎস্য আধিকারিক সহ সভাপতি কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত ও সমিতি সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষগণও উপস্থিত থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ও সকলেই মৎস্যজীবীদের দাবীগুলির সাথে সহমত।

■ স্মারক লিপির বক্তব্য হল :

আপনি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম নদীয়া জেলা শাখা সহ রাজ্যের বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনগুলোর যৌথ কমিটির সহায়তায় নদী, খাল, বিল জলাশয়ের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য স্মারক লিপি প্রদান।

(১) বাংলাদেশের দর্শনার কেরু কোম্পানীর যাবতীয় দূষিত বর্জ্য পদার্থ মেশানো ক্ষতিকর জল মাথাভাঙা নদীতে ফেলা বন্ধ করতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। মাথাভাঙা নদীতে দূষিত জল ফেলা বন্ধ না করলে তিস্তা চুক্তি নিয়ে সরকার ধীরে অগ্রসর হোন।

(২) নদীতীরের মাথাভাঙা ও চূর্ণী জল দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী পরিবারকে মাসে ৩০০০/-টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে সরকারীভাবে আর্থিক সাহায্য করতে হবে। বাংলাদেশের দর্শনার কেরু কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী পরিবারগুলিকে বীমার সুবিধা দিতে হবে।

(৩) মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদীতে যে সব বাধাল দেওয়া হয়েছে নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসকারী ও ছোট ছোট মৎস্যজীবীদের অন্ন ধ্বংসকারী ক্ষতিকর বাধাগুলিকে অবিলম্বে ২৪ ঘন্টার নোটিশে প্রশাসনকে মুক্ত করতে হবে। বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, জেলা শাসক সহ ব্লক প্রশাসনকে ইতিপূর্বেই লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

(৪) ব্লকের মৎসজীবী সকলকে সরকারী পরিচিতি পত্র দিতে হবে। বিশেষতঃ সীমান্তে বি.এস.এফের বাধায় রাতে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পারেন না।

(৫) নদী, খাল, বিলগুলিকে মৎস্য চাষের উপযোগী করার জন্য মৎস্য দপ্তরকে আরও সক্রিয় হতে হবে। নদী সহ খাল, বিলে মাছের চারা পোনা নিয়মিত সরকারী ব্যয়ে ছাড়তে হবে।

(৬) মৎস্যজীবীদের জন্য কিষান ক্রেডিটকার্ড চালুকরা সহ মৎস্যজীবী সমবায়গুলিকে সরকারী অনুপ্রেরণায় আরও সক্রিয় করা প্রয়োজন।

(৭) অসমর্থ ও ৬০ ঊর্দ্ধ সমস্ত মৎসজীবীকে পেনশন প্রকল্পে এককালীন ১০০০/-টাকা ভাতা দিতে হবে।

(৮) মৎস্যজীবী পরিবারের ছেলে মেয়েদের জন্য পড়াশোনার জন্য আর্থিক ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৯) দরিদ্র বি.পি.এল. ভুক্ত মৎস্যজীবী পরিবারগুলিকে সরকারী গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ সাহায্য করতে হবে।

(১০) মৎস্যজীবীদের নৌকা মেরামতের জন্য, জাল সূতার জন্য আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

(১১) সরকারীভাবে মাছ বিক্রয়ের ব্যবস্থায় মৎসজীবী স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সমবায়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

[সৌজন্য : 'কৃষি সাহিত্য']

বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী (প্রস্তাবিত)

[২০১৬ ও'১৭ তে মোহনপুর ও চাকদায় বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীদের কনভেনশনে এবং মধ্যবর্তী ও পরবর্তিতে প্রস্তাবিত লক্ষ্য ও কর্মসূচী ও পরিবেশিত চারটি দলিলের সারসংকলন। আগামী জলপাইগুড়ি সন্মেলনে স্থির করতে হবে। ২১.০১'১৮ বহরমপুরে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠন গুলির যৌথ কমিটির সভায় পরিবেশিত]

■ লক্ষ্য : সমস্ত ধরনের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মান্ধতাবিহীন, বিজ্ঞানসম্মত, উৎপাদনশীল, শিক্ষিত, সুস্থ, মুক্ত ও উন্নত সমাজ এবং দূষণহীন প্রকৃতি ও মানববান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা।

■ উদ্দেশ্য :

১) জনসমাজকে শিক্ষিত, সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।

২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিগুলি গ্রহণযোগ্যভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।

৩) শোষণ, বৈষম্য ও সঙ্ঘর্ষমুক্ত, উৎপাদনশীল ও উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা রাখা।

৪) সুস্থ জীবনের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

■ **দিশা :**

১) বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সুস্থ চেতনা, প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান, প্রগতিশীল মানসিকতাকে ধারাবাহিক গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

২) দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, গবেষণা, শিক্ষা ও মূল্যায়ণ এবং অনুশীলন ও আচরণের ক্ষেত্রে দৃঢ় অথচ বিনম্র; ধৈর্য্যশীল, সংযমী ও নিয়ন্ত্রিত, আন্তরিক, উদ্যমী, পরিশ্রমী এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।

৩) প্রতিটি ব্যাক্তি ও ঘটনা থেকে শেখা এবং অধ্যায়ন, যথাযথ অনুশীলন ও আত্মসমালোচনার মানসিকতা অর্জন করা।

৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলি সুলভে সাধারণের মধ্য নিয়ে যাওয়া।

৫) সাহস ও বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতার সাথে ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, পুনরুত্থানবাদ ও উগ্রজাতীয়তা; বর্ণ, জাতি, জাত ও লিঙ্গ বৈষম্য; বিভেদ ও হানাহানি; কুসংস্কার, কুআচার, কুপ্রথা, বুজরুকি, ডাইনিবিদ্যা, কালোম্যাজিক , অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও অন্ধবিশ্বাস; অবিচার, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, প্রতারনা ও আত্মসাৎকে মোকাবিলা করা এবং হার না মানা মনোভাব নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করা।

৬) নিজ, নিজগৃহ ও পরিবার, কর্মক্ষেত্র-সর্বত্র উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক, ও বৌদ্ধিক অনুশীলন চলানো।

৭) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জনসাধারণের সাথে একাত্ম থাকা।

৮) গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত উদ্যোগ ও আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী, বিস্তৃত ও সংহত করা এবং গণবিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনগুলিকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করা।

■ **কর্মসূচী :** [পরিস্থিতি, পরিবেশ, গুরুত্ব, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও বিষয়ীগত অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত ও পরিবর্তিত]

■ **সাধারণ কর্মসুচী ও দাবী :**

১) ধর্মান্ধ, জাতিবিদ্বেষমূলক ও স্বৈরাচারী প্রচার, ষড়যন্ত্র ও আক্রমনগুলির জোরালো গণপ্রতিরোধ।

২) আগ্রাসী বৃহৎ, বহুজাতিক, লগ্নী, পরিবারতান্ত্রিক ও লুম্পেন পুঁজি কর্তৃক সবকিছু গ্রাসের বিরুদ্ধে জোরালো ও গণপ্রতিরোধ।

৩) সারা বছর ধরে বিজ্ঞান ও পরিবেশ চেতনা ও মনস্কতার প্রচার। বিশেষত ছাত্র, ছাত্রী, যুবক-যুবতী ও সাধারণের মধ্য।

৪) যথার্থ দাবীযুক্ত নাগরিক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, শ্রমজীবী আন্দোলনগুলির পাশে থাকা।

■ **প্রকৃতি ও পরিবেশ সংক্রান্ত দাবী ও কর্মসূচী :**

১) বন্যা, ধ্বস প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার এবং জেলা ও ব্লক প্রশাসন কর্তৃক সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও সময়মত কর্মোদ্যোগের দাবিতে আন্দোলন।

(ক) পশ্চিমবঙ্গের সিসমিক, ভূতাত্বিক ও জলবায়ু (ঋতুভিত্তিক) ম্যাপ প্রকাশ করে ভূকম্পন, ধ্বস, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রবণ এলাকার চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা।

(খ) দার্জিলিঙ পাহাড় ও ডুয়ার্স সহ উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সিঙ্গালিলা, নেওড়া, মহানন্দা, গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা প্রভৃতি অরণ্যগুলির এবং পাহাড়ি নদীগুলির যথার্থ সংরক্ষণ; বেআইনি খনন, কাঠকাটা, পশুশিকার প্রভৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ করা। নিয়ম মেনে প্রতিটি নির্মাণ ও দূষণরোধ। উপকূলের ক্ষেত্রে সুন্দরবন সংরক্ষণ এবং সুন্দরবন সংলগ্ন ও সমদ্রতট অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিস্তার। কলকাতা সহ সমতলের সর্বত্র পাহাড়, নদী, জঙ্গল, জলাভূমির সংরক্ষণ। কঠোর নিয়ম মেনে যে কোন নির্মাণ এবং দূষণ রোধ। মালদা ও মুর্শিদাবাদের ভাঙ্গন রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন।

(গ) ফারাক্কা, তিস্তা, দামোদর, ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পগুলির পুনর্মূল্যায়ন ও ত্রুটি সংস্কার; প্রকৃতি ও পরিবেশবিরোধী ও ক্ষতিকারক -বাঁধ, নির্মাণ, কৃত্রিম ক্যানেল, নদীসংযোগ প্রভৃতি বন্ধ করা; উপগ্রহ ও জিপিএস চিত্র দেখে নদীখাতগুলি ড্রেজিং করে সারা বছর জলসঞ্চারের ব্যবস্থা এবং এর সাথে একশ দিনের কাজকে যুক্ত করা। মাথাভাঙ্গা ও আত্রেয়ীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, তোর্যার ক্ষেত্রে ভূটান, তিস্তার ক্ষেত্রে সিকিম,মহানন্দার ও ফুলহারেরক্ষেত্রে বিহার, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও সুবর্ণরেখার ক্ষেত্রে ঝাড়খন্ডের সাথে যৌথ আলোচনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি সঠিকভাবে সংস্কার ও সংরক্ষণ, এর সাথে একশ দিনের কাজকে যুক্ত করা, বৃষ্টির মিঠে জল পুরোটা ধরে রাখা এবং সেই জল দিয়ে পানীয় জল, ঘর-গৃহস্থালীর জল, কৃষিকাজের জলসেচের চাহিদা মেটানো। বিন্দু সেচের মত জলসাশ্রয়ী সেচ অবলম্বন করা এবং সাবমার্সিবেল পাম্প দিয়ে ভূতলের অমূল্য জলস্তরকে যথেচ্ছভাবে তুলে চাষ ও অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ করা। বৃষ্টির জল ধরে রেখে ভূতলের ও নদীখাতের জলস্তরকে চার্জিং করা।

৩) রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের নামে জলাশয় ভরাট ও গাছ কাটা বন্ধ করা। জলাশয় বজায় রেখে তার পাশ দিয়ে বা টি পিলার করে অথবা অন্যভাবে রেলপথ, সড়কপথ ও গৃহ নির্মাণ। উন্নয়নের জন্য কোন গাছ সরাতে হলে বনদপ্তর ও সবুজ আদালতের অনুমতি নিয়ে কাটা নয় গাছগুলিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা এবং তাদের যত্ন নেওয়া। বৃক্ষরোপন কর্মসূচিকে একশ দিনের কাজের সাথে যুদ্ধ করা। দেশজ উপযোগী গাছ লাগানো।

৪) শহরের আয়তন অনুযায়ী সবুজ অঞ্চল, পার্ক, মাঠ, জলাশয়, সাইকেল লেন, রাস্তা, ফুটপাথের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ইলেকট্রিক ও ব্যাটারিচালিত গণপরিবহন ব্যবস্থার উপর জোর, ডিজেল ও ১০ বছরের বেশী পুরানো গাড়ি বন্ধ, শহরের আয়তন ও রাস্তার পরিমাপ অনুযায়ী কেবলমাত্র ভারত স্টেজ ৪ পেট্রল গাড়ির সংখ্যা

নিয়ন্ত্রণ, রেজিস্ট্রেশন এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভারী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জলপথে ও গ্রামাঞ্চলে কাটাতেল চালিত অটো, বোট এবং ভ্যানে। গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জলপথে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাটারিচালিত বোট এবং ওই-রিক্সার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) পারমাণবিক ও ফসিল ফুয়েল পোড়ানো তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা এবং সৌর ও অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তির উৎসের উপর জোর দিতে হবে। ফসল তোলার পর গাছের গোড়া পোড়ানো, ময়লা পোড়ানো, প্রকাশ্যে পিচ পোড়ানো প্রভৃতি দূষণকরা ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

৬) প্রতিটি পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের প্রতিটি গৃহ থেকে প্রতিদিন বর্জ্য সংগ্রহ, সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে পৃথকীকরণ; বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ থেকে সার তৈরী, নন-বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থর একাংশ রিসাইকেল করে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরী ও বাকি ক্ষতিকর অংশ সঠিক ট্রিটমেন্ট করে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ও স্থানে সংরক্ষণ বা নিক্ষেপ করা। গঙ্গা এবং অন্যান্য জলাশয় বা খোলামাঠে বর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শিল্প ও কারখানার বর্জ্য সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা। কেবলমাত্র গালভরা প্রচার নয় 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান,' 'নমামি গঙ্গে' প্রভৃতি প্রকল্পকে কার্যকরী করে তুলতে হবে।

৭) বিপজ্জনক খোলামুখ খনি, অবৈধ পাথর, কয়লা ও বালি খাদান; ক্ষতিকারক স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা বন্ধ করতে হবে। ইটাভাটা, মেছোভেড়ি, চালকল, রিসর্ট নিমার্ণের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। আসানসোল, বীরভূম, পুরুলিয়ার খনি অঞ্চলে ধ্বস, দূষণ ও আগুনলাগা প্রতিরোধ এবং খনিপাথর শিল্পে নিরাপত্তা ও দূষণ প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) ক্ষতিকর প্ল্যাস্টিক, পলিথিন, থার্মোকল, অ্যাসবেসটস, মারকারি প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

৯) ক্ষতিকর রাসায়নিক সার, বিদেশী বীজ, কীটনাশক, অধিক জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নিয়ে ব্যয়বহুল, ক্ষতিকারক, পরিবেশ ধ্বংসকারী কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন করে পরম্পরাগত, পরীক্ষিত, সুলভ, সহজসাধ্য, পরিবেশ ও মানব বান্ধব, ঋতু ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময়, মিশ্র শস্যের জৈব চাষ করতে হবে।

■ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত :

১) ডিজে সাউন্ড, নির্দ্ধারিত মাত্রার বেশী শব্দে মাইক ও শব্দবাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

২) যত্রতত্র ক্ষতিকর মোবাইল টাওয়ার বসানো চলবে না।

৩) সকলের জন্য পাইপলাইনের জলের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড কবলিত এলাকায় এবং বিপিএল, আদিবাসী, বস্তী, ঝুপড়ি এলাকায় প্রাধান্য দিতে হবে। ট্রেন স্টেশন, বাস স্টপ, ফেরি ঘাট, বাজার, স্কুল, অফিস, জনসমাগমের প্রতিটি এলাকায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য (প্রতিবন্ধিদের বিশেষ ব্যবস্থা সহ) সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা নিয়মিত পরিস্কার ও ব্যবহারযোগ্য রাখতে হবে।

৪) মহিলাদের বিশেষত ছাত্রী, শ্রমজীবী ও গরীব মহিলাদের জন্য সুলভ স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) আর্সেনিকোসিস, ফ্লুরোসিস আক্রান্ত কৃষক ও জনসাধারণের এবং সিলিকোসিস, নিওমোকোনিওসিস আক্রান্ত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) যত্রতত্র বাজার, খাবার ও অন্যান্য দোকান, মেরামতির দোকান ও গ্যারেজ, কারখানা ও গোডাউন, কারপার্ক প্রভৃতি বসানো বা তৈরী; যত্রতত্র ময়লা, বর্জ্য, কফ-থুথু-পানের ও পানমশলা, খৈনি প্রভৃতির পিক ফেলা, মলমূত্রত্যাগ এবং পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়াল পোষা এবং তজ্জনিত দূষণ ও রোগ।

৭) মশা, মাছি, আরশোলা, ইদুর প্রভৃতি ক্ষতিকারক প্রাণীর জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নির্মূল করে হেমারেজিক জ্বর, ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক, হেপাটাইটিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, প্লেগ, টিক টাইফাস প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ করতে হবে।

৮) ক্ষতিকর জিনরূপান্তরিত শস্যচাষ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, রঙ ও সংরক্ষক, রাসায়নিক বা হরমোন প্রয়োগ করে ফল-সব্জী বড় করা ও পাকানো প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। জৈব বীজ চাষ; গৃহসংলগ্ন জমি, ছাদ ও ফাঁকা জায়গায় জৈব চাষ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাকিইয়ার্ড পোলট্রি ও ডেয়ারিতে উৎসাহ দিতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে জলাশয়গুলিতে মৎস্যচাষে।

৯) খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করতে হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট আইন, দপ্তরের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও ল্যাবেরটরি ব্যাকআপ এবং নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অপরাধীদের কঠোর সাজা দিতে হবে।

১০) উপযুক্ত পরিকাঠামো ও লোকবল সহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীভর্তি; প্রসব; সাপ ও কুকুর কামড়ানোর; আন্ত্রিক ও বিষ খাওয়ার চিকিৎসা সহ সমস্ত জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে।

১১) রেল ও সড়কপথে লেভেল ক্রশিং, সিগনালিং, ডিভাইডার, স্পীড ব্রেকার, আন্ডারপাস ও ওভারব্রীজ সহ রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা, ফুটপাথ, সাইকেল লেনের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে পশুচলাচলের জন্য রেল ও সড়কপথে আন্ডারপাস করিডোর তৈরী করতে হবে।

১২) ধূমপান, মদ্যপান, পানমশালা প্রভৃতি ব্যবহার , ড্রাগস্ সহ সমস্ত নেশার বিরুদ্ধে প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

■ আশু কর্মসূচী ও দাবী :

১) ধর্মীয় পুণরুত্থানবাদ, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে গণজাগরণ।

২) মহিলাদের উপর আক্রমণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ।

৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রতিবছর বর্ষার পর থেকে কাজ শুরু এবং নদী অববাহিকাগুলি ড্রেজিং, বাঁধ-ব্যারেজ-জলাধারগুলির সংস্কারের জন্য প্রশাসনকে চাপসৃষ্টি।

৪) বন্যা প্রতিরোধে পরম্পরাগত পরীক্ষিত জৈব চাষকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা।

৫) পূর্ব কলকাতা, ভাবদিঘী, কুলিয়া-মথুরা বিল, চাকদার জলাশয় সহ জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য গণ-আন্দোলন ও আইনি ব্যবস্থা।

৬) জঙ্গলসাফ ও গাছ কাটা আটকাতে এবং বৃক্ষরোপন ও অরণ্যসংরক্ষণের জন্য ব্যপক প্রচার আন্দোলন ও আইনি ব্যবস্থা।

৭) ডিজেসাউন্ড, শব্দবাজি ও উচ্চস্বরে মাইক বাজানো নিষিদ্ধকরণকে সুনিশ্চিত করা।

৮) লোকালয়, স্কুল ও হাসপাতালের কাছে ক্ষতিকারক মোবাইল টাওয়ার ও সংশ্লিষ্ট জেনারেটর বসানোর বিরোধিতা।

৯) ডেঙ্গু, জাপানী এনকেফেলাইটিস, ম্যালেরিয়া, আর্সেনিকোসিস, সিলিকোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসার উপযুক্ত সরকারি ব্যবস্থা এবং সাপ ও কুকুর কামড়ের সময়মত সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে মৃত্যুকে রোধ করার জন্য উপযুক্ত সরকারি ব্যবস্থার দাবীতে গণআন্দোলন।

১০) তিস্তার জল ছাড়া নিয়ে সিকিম, আত্রেয়ীর জলছাড়া নিয়ে বাংলাদেশ, দামোদরে জল ছাড়া নিয়ে ডিভিসি এবং মাথাভাঙ্গায় বর্জ্য ফেলা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে অবিলম্বে আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের দাবীতে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ।

১১) পাওয়ার গ্রিড নিয়ে সঠিক বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা চালিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্যোগ। ভাঙ্গরের আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার ব্যবস্থা করা।

১২) পরিবেশের সার্বিক ক্ষতিকর, কৃত্রিম 'সবুজ বিপ্লবে'র কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন এনে পরম্পরাগত বৈজ্ঞানিক জৈব কৃষিতে ফেরার জন্য জনমত গঠন।

■ সাংগঠনিক কাঠামো :

১) প্রতিটি সংগঠন স্বাধীনভাবে কাজ করবে, সাধারণ ইস্যুগুলি নিয়ে যৌথভাবে কাজ করবে।

২) কাজের ক্ষেত্রে একমাত্র মানদন্ড: জনবিরোধী কোন কাজ করা যাবে না।

৩) প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর একটি সম্মেলন হবে।

৪) দুটি সম্মেলনের মধ্যে সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'যৌথ কমিটি' তৈরী হবে। 'যৌথ কমিটি' যৌথ কাজ ও আন্দোলন পরিচালনা করবে। বছরে অন্তত দুবার বসবে।

৫) যৌথ কমিটির কয়েকজন আহবায়ক ও মুখপাত্র, একজন কোষাধক্ষ, একজন হিসাবরক্ষক, একজন অফিস সেক্রেটারি থাকবেন। যৌথ কমিটির অন্তর্গত কয়েকটি বিভাগ থাকবে। উদা : লিগাল, আই.টি., প্রচার ইত্যাদি।

৬) প্রতিদিনকার কাজ চালানোর জন্য যৌথ কমিটির অধীনে একটি 'কার্যকরী' কমিটি থাকবে। তারা অন্তত মাসে একবার করে বসবে।

৭) প্রতিটি সহযোগী সংস্থা ও ব্যক্তির বার্ষিক/মাসিক অনুদানে সাংগঠনিক কাজ চলবে।

৮) কোন শুভানুধ্যায়ীর অনুদান নেওয়া যাবে, কিন্তু কোন জনবিরোধী কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে অনুদান নেওয়া যাবে না।

৯) সরকার, এন জি ও, লাভজনক ও বিদেশী সংস্থার থেকে অনুদান নেওয়া যাবে না।

Small farmers go big with organic farming

Nearly 83% of Indian land and livestock holdings are classified as marginal, making them an overwhelming majority, according to the 70th-round survey (2013) of the National Sample Survey Organisation

Small and marginal farmers, who can't afford costly agricultural inputs, are turning a new leaf by going organic because of lower costs and higher margins, data from the first impact study of the Modi government's Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) shows.

Among key findings, the study shows the programme launched in 2015 has seen 6,2 11 organic clusters come up in 25 states, comprising 2.25 lakh farmers. About 52.3% of them are small. The main motivating factor was lower costs. The south zone had highest share of small farmers at 89.1%. In all zones except central, small farmers accounted for more than half the registered members. The study analysed 690 clusters in 25 states.

Under the PKVY, farmers need to pool in their patches of land to enable economies of scale, a key constraint of Indian farmers.

The average cluster size was 69 acres and the average number of farmers in each was 54.6, which meant small farmers managed to achieve operational scales.

Small farmers cultivate lands of between one and two hectares. Marginal farmers cultivate up to just one hectare (2.5 acres).

They mostly consume what they grow and have little investment in equipment, fertilisers and pesticides. Nearly 83% of Indian land and livestock holdings are classified as marginal, making them an overwhelming majority, according to the 70th-round survey (2013) of the National Sample Survey Organisation. "Small farmers have more family labour because of larger household size and mostly inhabit rain-fed areas (lands without irrigation). So they

do better in organic farming, despite lower yields," said A Amarender Reddy, director of the state-run National Institute of Agricultural Extension Management, which carried out the study.

Reddy said the study showed organic farming was best recommended for remote, less-developed and poorer regions. Under the PKVY, organic producers mostly catered to the domestic market and self-certify their produce as '"organic".

Although many definitions abound, organic produce is deemed as being free from synthetic chemicals.

The report said organic yields were lower than in conventional farms, but net returns were higher. In organic wheat, paddy and soyabean — the three crops studied — gross returns as well as yields were lower. But when the reduced cost of production was factored in, the net returns per hectare were higher by 15.8%, 36.7% and 50% respectively.

"A majority of farmers surveyed (85%) demanded that the government should supply organic inputs at subsidised rates. They also sought help in market linkages," Reddy said.

India's domestic organic food market is forecast to register a CAGR of over 25% during 2015-20, according to the report 'India Organic Food Market Forecast and Opportunities, 2020' published by TechSci Research.

The study cited irregular funding as a major constraint. In 2016-17, Rs.238.23 crore was allocated. "In some states, in the 1st year, there was a release of funds, but in the second year, there was no release, but again in third year, there was a release of funds. This created some sort of uncertainty among farmers..." the report said. Under PKVY, for every hectare, Rs. 50,000 is given as aid to each hectare in the cluster.

Although Sikkim is India's first fully organic state, Maharashtra led in the number of clusters at 1,043, while MP, with 992 clusters, had the highest area under organic cultivation.

Impact study of 6,211 organic farm clusters
Small farmers find a niche

Zone	% of small	average c	average no. of farmers
Central	28.7	67.3	57.5
East	52.1	78.3	53.7
North	49.4	75:	57.1
South	89.1	51	55.5
West	53.6	63	51
All	52.3	69.1	54.6

Lower costs & yeilds, but higher returns

Wheat	cost of cul.	grossretu.	yeild	net return
Conventic	48202	61200	36	12998
Organic	42752	57800	34	15048
Change	minus 11	minus 5.6	minus 5.6	15.8

In Rs/per ha

Paddy	cost of cul.	gross retu	yeild	net return
Conventic	60742	71408	41	10665
Organic	51598	66183	38	14584
Change	minus 15	minus 7.3	minus 7.3	36.7

In Rs/per ha

Source : National Institute of Agricultural Extension Management [Courtesy : 'Hindustan Times']

This simple technology has transformed Gujarat farmlands into an oasis

Kavita Kanan Chandra

As I cross the bridge over the Narmada canal, the landscape begins to morph from fields to fallow land with just an odd smattering of vegetation. By the time I enter Sami taluka in North Gujarat's Patan district, the land appears distinctly denuded and encrusted with salt.A simple technology has transformed the denuded farmlands of a north Gujarat district into an oasis

This district receives no more than 650 mm of annual rainfall, compressed into a few days. And when it does rain, the farmland gets inundated with water as the impermeable layer of saline soil prevents water from percolating. For the rest of the year, marginal and small farmers face a drought-like situation: bore wells, ponds, check dams and canals prove inadequate sources of irrigation.

In the midst of this dreary landscape is Mubarakpura village, a veritable oasis with a blanket of green from wheat, cumin and dill fields. It is hard to believe that just 12 years ago, the farmland here was a barren stretch during winter and waterlogged in monsoon.

With me is Biplab Ketan Paul, an Ahmedabad-based innovator whose irrigation system, bhungroo ('straw' or 'hollow pipe' in Gujarati), based on rainwater harvesting, has revolutionised the lives of farmers here.

A pit and a pipe :

The system simply and expertly captures standing

water during rains, thus freeing arable land from waterlogging while recharging groundwater to use for irrigation during the lean season.

We enquire about Sankhuben, who was part of the first group of five women to own and manage bhungroo in Mubarakpura village in 2006. We are told that all five women have hired a car to visit Ahmedabad on the eve of Uttarayan, a kite festival. Bhungroo has brought more than economic prosperity to these women — it has empowered them.

"My family could only grow bajri and jowar during monsoon and we earned Rs. 20,000 to Rs. 25,000 every year. I had two children to feed and educate, my husband migrated for daily wage work and I had loans to pay," says Sankhuben when I talk to her over the phone. But after bhungroo was installed in the village, she has been able to grow crops over two seasons.

"I planted kharif crops that did not get destroyed by waterlogging and I was able to grow jeera (cumin) and gehun (wheat) during winter." Cumin is a profitable herb. "I repaid my debts, freed my land, my husband returned to fanning and today I earn over ₹ 1.5 lakh a year," says Sankhuben.

The bhungroo looks remarkably simple: a square 4'X4' cement-lined pit, eight feet deep, from which a pipe extends 80 feet into the ground. Water collected in this filtration chamber passes through the pipe into the aquifers. The bhungroo here channels 40 lakh litres of water, enough to irrigate four hectares of land for seven months. Today, 50 bhungroo units have been established in and around Sami and Harij taluka.

"Bhungroo is community-based and women-centric," says Paul. "We charge big farmers but do not take any money from the poor farmers for technology and installation. But they have to provide land, labour and raw materials."

Growing up in West Bengal's Hooghly district, Paul had seen both flood and drought. After obtaining degrees in economics and environmental education, his work took him to Gujarat. "There was acute water scarcity and groundwater depletion. The small farmers were the biggest sufferers."

Five States :

But promoting his innovation was no easy task. While the men he spoke to were not instantly convinced by a person from Bengal working in Gujarat's rural heartland, he found the self-help groups (SHGs) of rural women more forthcoming. With his savings, help from SHGs, and land, labour and raw materials from village residents, the first bhungroo was born.

Paul and his wife Trupti Jain, whose development work spans several countries in South East Asia and Africa, have now been approached by five States to develop the bhungroo model under the National Rural Livelihood Mission programme.

The duo has installed over 3,000 units in the country and around the world at an initial installation cost varying between ₹8 lakh and ₹32 lakh (depending on the design). Once installed, bhungroo can harvest rainwater for up to 25 years.

Lilaben, one of the five in Sankhuben's group, says that she couldn't afford a borewell to irrigate her crops. Bhungroo changed everything. "I could hardly grow any crop in my two-hectare plot. But today I own a tractor."

[Courtesy : The Hindu]

Retired teacher seeds organic farming In Odisha

A retired school teacher in Odisha has turned an icon for millions of farmers in the country and abroad for his passion to collect native variety of paddy seeds and encouraging peasant communities to undertake organic farming, not only to save huge money spent on buying high-cost chemical fertilisers and pesticides but for keeping good health. The 85-year-old teacher, Natabar Sarangi, so far collected over 647 varieties of paddy seeds from states like Odisha, West Bengal and Chhattisgarh.

Mr Sarangi's tryst with native seeds collection began after his retirement in 1992 when he felt that the new agriculture practices followed since 1960s had dire effects on small farmers and the biodiversity of crops. "In 1960s, increase in crop yields was much-needed in India as the country always battled famine. However, the new agriculture practices had dire effects on small farmers and the biodiversity of crops. The high yields were the result of monocultures — planting just one cash crop each year and using irrigation techniques to grow crops even in the dry season using huge volumes of chemical fertiliser and chemical pesticides.

Later, genetically-modified crops were introduced, endangering the already dwindling number of native plant species. Such a lack of biodiversity also made Indian farmers more susceptible to the effects of changing weather patterns," says the teacher. Mr Sarangi adds that it's not so important how many varieties of paddy seeds one has conserved, but seeds need to be conserved through regular agricultural practices for maintaining our rich biodiversity.

"All these native varieties have got their own adaptability potentials. They can withstand different climatic conditions in the country. Farmers in India need to be taught how to use these seeds to guard themselves against famine, flood and other calamities, besides reaping rich harvests," says the teacher.

Mr Sarangi has built a training centre Rajendra Desi Chasa Gabesana Kendra (Rajendra Native Farm Research Centre) where farmers are given training on use of native seeds and organic manure and pesticides. Around 100 farmers come each- year from local districts to get their seeds from Mr Sarangi. [Courtesy : 'Asian Age']

জৈব চাষে তাক লাগিয়ে, কৃষি-রত্ন গ্রাম্যবধূ কিরিন

রাসায়নিক সারের বিষ-বর্জিত সব্জি পাওয়ার জন্য হা-পিত্যেশের অন্ত নেই শহুরে জনতার। এরকম একটা সময় যেন মুশকিল আসানের মুখ হয়ে সামনে এলেন কিরিন হাঁসদা। রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের সিজা গ্রামের অশিক্ষিত এই গৃহবধূ জৈব প্রযুক্তির ফসল উৎপাদনে সাফল্যের জন্য এ বার কৃষিরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। কোনও রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই গ্রামের ৪০ জন মহিলাকে নিয়ে তিনি নানা ধরনের সব্জি চাষ করেছেন। প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে কৃষি দপ্তর।

রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের কৃষি আধিকারিক কৃষ্ণেন্দু হাইত বলেন, 'কৃষি দপ্তরের আত্মা প্রকল্পে প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি গ্রামকে জৈব প্রযুক্তির চাষের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল দুবছর আগে। সেই লক্ষ্যে আমরা যখন সিজা গ্রামে আসি, তখন দেখতে পাই, গ্রামের একটুকরো জমিতে খুব ভালো হলুদ চাষ করেছেন কেউ। খোঁজ নিতে কিরিনের কথা জানতে পারি। বাড়ির জৈব সার দিয়ে হলুদ লাগিয়েছিলেন কিরিন। বুঝতে পারি জৈব প্রযুক্তির শিক্ষা থাকলে মহিলা আরও বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারবেন। এর পরই কিরিনের নেতৃত্বে ৪০ জন মহিলাকে নিয়ে শুরু হয় আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে জৈব প্রযুক্তিতে চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়। এখানে কৃষিই মানুষের অন্যতম জীবিকায় পরিণত হয়। কিরিনের নেতৃত্বে সিজা গ্রামে হয়েছে উচ্চ ফলনশীল পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, মাশরুম। এখন গোটা গ্রাম জুড়ে চলছে গ্রীষ্মকালীন আনাজ চাষ। কিরিন বলেন, 'বাবুদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, ওঁদের কথা শুনলে লাভ হবে। তাই প্রথমে গ্রামের ২০ জন মহিলা মিলে গড়ে তুলি মাদার টেরিজা স্বনির্ভর কৃষক দল। পরে জয় ভারত নামে আরও একটি দল গড়া হয়।'

প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি না পেরেনো কিরিনের ঘরে রয়েছে তাঁর দুই স্কুলপড়ুয়া মেয়ে ও স্বামী হরিপদ হাঁসদা। হরিপদ বলেন, 'স্ত্রীর আগ্রহ দেখে আমি আর বাধা দিইনি। বাঁকুড়ার ছাতনায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে ওঁরা। গোটা গ্রাম ওঁর থেকে শিখছে।'

মালতী সোরেন, পানমণি সোরেনরা বলেন, 'আমাদের গ্রামে আগে কোনও ফসলই রাসায়নিক সার ছাড়া চাষ হত না। মানুষের ধারণা ছিল, সার ও কীটনাশক না দিলে ফসল হয় না। এখন জৈব সার ও ভেষজ ওষুধ দিয়ে আগের চেয়ে বেশি ফসল পাচ্ছি। কিরিনের নেতৃত্বেই এই সাফল্য।'

কিরিন বলেন, 'যে কেউ আমাদের চাষের কাজ দেখতে পারেন। পরামর্শ নিতে পারেন। রাসায়নিকের ফসল নয়, 'জৈব প্রযুক্তির ফসলে বাজার ছেয়ে যাক, এটাই চাই।

সংকলন : বিকাশ দত্ত

ত্রিপুরাই ভারত নয়

- সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্বের হৃদয়ভূমি এবং বিজেপির সম্প্রতি ঝটিকা দখলিত উত্তরপ্রদেশের লোকসভা উপনির্বাচনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কেন্দ্র গোরক্ষপুরে সমাজবাদী পার্টি ২১,৯৬১ ভোটে এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী কেশব মৌর্যের ফুলপুর আসনে সমাজবাদী পার্টি ৫৯,৪৬০ ভোটে বিজেপি প্রার্থীদের হারাল। এক্ষেত্রে একদা প্রতিদ্বন্দ্বী বহুজন নেত্রী মায়াবতী ও মুলায়ম তনয় অখিলেশের সমাজবাদী দলের 'বুয়া-বাবুয়া' জোট কার্যকরী হল। কিন্তু ধৃত বিধানসভা সদস্যদের ভোট দিতে না দেওয়ায় তাদের প্রার্থী ভীমরাও আম্বেদকর রাজ্যসভার নির্বাচনে হেরে গেলেন
- জেলে অন্তরীণ লালুপ্রসাদ তার যাদব-মুসলমান-পশ্চাদপদ ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন রেখে আরারিয়া লোকসভা আসনে আর.জে.ডি.কে বিজেপিকে হারিয়ে জেতালেন ৬১,৭৮৮ ভোটে এবং জেহানাবাদ বিধান সভা আসনে বিজেপি সঙ্গী জেডিইউকে হারালেন ৩৫,০৩৫ ভোটে। ভাভুয়া আসনে বিজেপি কংগ্রেসকে হারাল ১৪,৮৫৫ আসনে
- বিজেপির কেন্দ্রের সরকারে থাকা এন.ডি.এ. জোটের পুরনো সঙ্গী টিডিপির মন্ত্রীরা আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন প্রতিশ্রুত অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদা ও আর্থিক সহায়তা না পাওয়ার জন্য। এবার চন্দ্রবাবুরা জোট থেকেই বেরিয়ে গেলেন। আরেক পুরনো জোট সঙ্গী শিবসেনা বিজেপির বিরোধিতা করছে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে

ভ্রমণ

পেডং থেকে

পার্থময় চট্টোপাধ্যায়

হঠাৎ করে ঘুরে এলোম পেডং পাহাড়। কালিম্পঙ জেলার অন্তর্গত এই ছোট পাহাড়ি শহরের বর্ণনা নিয়ে আমার এই ছোট্ট লেখা।

আমি সাধারণত পাহাড় ভালোবাসি, তবে ভিড় এড়িয়ে থাকাটাই আমার বেশি ভালো লাগে। পাহাড়ের এমন এমন জায়গা আছে যেখানে আজও টিকে আছে সরল হৃদয়, নিষ্পাপ ভালোবাসা, আর হারিয়ে যাওয়া আপনজন। যদি বিশ্বাস না হয় তবে চলে আসুন পেডং পাহাড়ে। চারি দিকে শুধু পরিচিত মুখ, কত সরল কত নিষ্পাপ, কত চাহিদাহীন। কালিম্পঙ থেকে ৩২ কি মি দূরে এই পেডং শহর। শহর বললে ভুল হবে। কারণ এখানে এখনও রাত ৮টা তে মানুষ শুতে যায় আবার ভোর ৪টায় দিন শুরু হয়।

আমরা যেখানে ছিলাম সেই জায়গাটার নাম ধোবি ধারা। একটা সুন্দর সাজানো গ্রাম। প্রায় তিন একর জমি নিয়ে পাহাড়ের মাথায় ফুলে ফলে ভরা এই হোমস্টে, নাম 'সাই লক্ষ্মী হোমস্টে'। মালিক হচ্ছে এক তরুন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার শ্রী রবি সাই। বয়স ৩০ হবে, অসম্ভব সুন্দর মন। সুন্দর সাজানো গুছানো বাংলো, ভাড়া ১০০০ টাকা থাকা খাওয়া প্রতিদিন প্রতিজন। প্রতিটা রুম সংলগ্ন বাথ, ওয়েস্টার্ন সিস্টেম। ঘরে টিভি গিজার। প্রতি ঘরে দুটো ডাবল বেড মানে চারজন থাকা যায়। বেড টি, ব্রেক ফাস্ট, লাঞ্চ বিকেলের স্নাক্স ও ডিনার দেয়।

পেডং, এন.জে.পি. থেকে প্রায় ৯০ কি মি। সময় নেয় প্রায় ৩ ঘন্টা। কালিম্পঙ থেকে ৩২ কি মি। ভাড়া এন.জে.পি. থেকে ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা।

পেডং এর পূর্ব দিগন্তে জুড়ে আছে জুলুক, নাথাং ভ্যালি। মানে চীনা তিব্বত সংলগ্ন সিল্ক রুট। সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকলে থামবি পয়েন্ট এর দেখা পাওয়া যায়। জিগ জাগ রোডটাও দেখা যায়। সাথে বরফ ঢাকা নাথান ভ্যালি। গাড়িতে তিন ঘন্টা লাগে। দক্ষিণ প্রান্তে লাভা, লোলেগাঁও ও রিশপ অবস্থান করছে। রাতে রিশপের হোটেলের আলো স্পষ্ট চোখে পরে। পেডংয়ের উচ্চতা ৫০০০ ফুট। কিন্তু ঠান্ডা বেশ ভালোই পরে।

পেডং থেকে সেলারি গাঁও ১১ কি মি, লাভা ২২ কি মি, লোলেগাঁও ৩৮ কি মি, রিশপ ৩২ কি মি, ইচ্ছে গাঁও ৪২ কি মি, ডেলো ৩৫ কি মি। এছাড়া কোলাথাম, ঝান্ডি, ফাফারখেতি, দলগাঁও, ডামডিম, চাইল খোলা, রকি আইল্যান্ড, গরুবাথান, ডুয়ার্স ও কুমাই একদম কাছাকাছি। নাওরা ভ্যালি এর গা ঘেষে গেছে।

পেডং কে আমি দেখেছি কুয়াশার চাদরে মোরা এক মিষ্টি সকালে, যখন ফুলেরা পাপড়ির আবডালে ঢেকে ছিল নিজেদের। আমি দেখছি পেডং কে পূর্ণিমার ছটা গায়ে জড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায়ে। বৃষ্টিতে ভিজে থাকা রূপসী পেডং কে দেখেছি আমি। এই সাই লক্ষ্মী হোমস্টের বারান্দাটা ভীষণ ভাবে টানে আমায়।

চেয়ার পেতে এখানে বসে থাকলে সময় কে ধরতে পারবেন না. বা পাশে সাদা বরফে মোরা পাহাড় আর সোজাসুজি সবুজে ঢেকে থাকা রিশপ, লাভা প্রভৃতি পাহাড়ি শহর। ভোলা যায়না এই পেডংয়ের রূপ ও এখানকার মানুষের আন্তরিকতা।

ভোলা যায় না পেডং এর রবি ভাই কে। ভুলবোনা পরিচারিকা রেবেকাকে। মধ্যবয়সী তিন সন্তানের মা, কুড়ে স্বামীকে নিয়ে তিন সন্তান কে মানুষ করার লড়াই। বড় মেয়ে নাম সেবিকা। ক্লাস নাইনে পড়ছে। মেয়েটা লেখাপড়ায় খুব ভালো। এই কিশোরী স্বপ্ন দেখে একদিন আর্মিতে চাকরি পাবে। আর ভুলবোনা দুঃখে ভরা আর আনন্দেতে গড়া সেই মেয়েটা যার নাম এঞ্জেল। অল্পবয়সেই জীবনটাকে বড্ডো বেশি চিনেছে, জেনেছে। যার কেউ নেই, একদম একা, সারাদিন গান গেয়ে নেচে হেসে এই হোমস্টেতে কাজ করে। ওর থকে বেঁচে থাকার রসদ পাওয়া যায়। যার মধ্যে এতো দুঃখ থেকেও মুখে আনন্দের ধারা। পেডং এর কাছে আবার আসবো। শুধু আসবো সেবিকা নামের ছোট্ট মেয়েটাকে আর্মি পোশাকে দেখার ইচ্ছা নিয়ে। ওকে একটা স্যালুট দিতে অবশ্যই আসবো।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

মাথাভাঙা, চূর্নী, ইছামতী বাঁচান

অনুপ হালদার

মাথাভাঙা, চুর্ণি নদী কে বাঁচানোর জন্য সুদীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন নদীয়ার মাঝদিয়ার 'মাথাভাঙা, চূর্ণি বাঁচাও কমিটি'।

এই নদী দুটির মূল সমস্যা হল পদ্মা নদী থেকে মাথাভাঙার উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশ এর সীমা ছাড়িয়ে গেদে বর্ডার অতিক্রম করে ভারত ভূখন্ডে প্রবেশ করেছে। মাত্র ১৯ কিমি ভারতে প্রবাহিত। এখানেই বাংলাদেশের কেরু এন্ড কোম্পানি কারখানার দূষিত জল পরিশোধন না করে সরাসরি ফেলছে এই মাথাভাঙা নদী তে। ভারত ঢোকার পরই আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে নদীয়ার মাঝদিয়ার কাছে।

একটি শাখা ইছামতি নামে ডানদিকে ও বাঁ দিকে চূর্ণি নামে প্রবাহিত হয়েছে। তবে স্বাধীনতার পূর্বে ইচ্ছামতির উৎস মুখে রেলব্রীজ তৈরি করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে চুন, সুড়কি, বোল্ডার, মাটি প্রভৃতি ফেলে ইচ্ছামতি কে মাথাভাঙা থাকে প্রায় ২০/৩০ ফুট উঁচু কোরে নেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই সেই দিন থেকেই ইচ্ছামতি তার উৎস মুখের থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করল। ফলে কেরু কোম্পানির দূষিত জল ইচ্ছামতীতে প্রবেশ করতে না পারলেও তা পুরোপুরি চূর্ণির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দিনের পর দিন গঙ্গায় মিশছে। এবং এই দূষণের মাত্রা এতটাই প্রবল যে মাথাভাঙা, চূর্ণির তীরে বসবাসকারী কয়েক হাজার মানুষ তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, প্রায় লক্ষাধিক মৎস্যজীবী বাধ্য হয়েছেন তাদের পেশা পরিবর্তন করতে। নদীর তীরে অবস্থিত চাষের জমিতে ওই জল দেওয়ার ফলে চাষের জমি কার্যত মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। নদীর বাস্তুতন্ত্র বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মহামান্য আদালত নদী দুটির সংরক্ষণ ও সংস্কার এর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। এবং বাংলাদেশ সরকার বাধ্য

হয়ে কেরু কোম্পানির জল পরিশোধন এর জন্য treatment plant বসাবেন এবং চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন যে আগামী ১৫ বছর তারা মাথাভাঙা তে আর দূষিত জল ফেলবেন না। যাক দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সরকারের এই চিন্তাকে আমারা সাধুবাদ জানাই। আমাদের দাবী ১৫ বছর নয় বরাবরের জন্যই এই ভাবনা কে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গত ৭ই অক্টোবর মাথাভাঙা চূর্ণি বাঁচাও কমিটির ডাকে সাড়া দিয়ে মাঝদিয়ায় একটি নাগরিক কনভেনশন, পরে রানাঘাটে, আরেকটি মাঝদিয়া বাজারে মৎস্যজীবীদের সমাবেশ হয়। নদীকে বাঁচান নিজের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। নদী ই সভ্যতার রূপকার। মৎস্যজীবীরা চূর্নীনদী সংস্কারে হাত লাগিয়েছেন। পাশাপাশি ইচ্ছামতী, যমুনা, আত্রেয়ী প্রভৃতি নদীকে বাঁচাতেও আন্দোলন হচ্ছে।

বক্সা জঙ্গলে নানা প্রজাতির আরও কিছু বন্যপ্রাণীর হদিস

জয়া চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার **বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে** সমৃদ্ধ জীব বৈচিত্র্যের আরও কিছু প্রমাণ মিলল। জঙ্গলের ভিতর রাখা ক্যামেরায় এমন কিছুর প্রাণীর দেখা মিলেছে, যাদের কারও অস্তিত্ব জানা থাকলেও প্রমাণ ছিল না। আবার কোনও কোনও প্রাণীর এই প্রথম দর্শন মিলল আলিপুরদুয়ারের কাছে এই বনাঞ্চলে। যেমন, **এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার**। পাহাড়ি এলাকার গভীর জঙ্গলে এদের বিচরণ। শিকারের কারণে সারা বিশ্বে এরা বিপন্ন হচ্ছে। কালো রংয়ের এই ভালুকটি বক্সা বনে আছে বলে বন দপ্তর এতদিন দাবি করত বটে। কিন্তু বনকর্মী বা অন্য কারও নজরে

কখনও পড়েনি। বিপন্ন না হলেও **ইয়েলো থ্রোটেড মারটিন** যে এই জঙ্গলে আছে, তা জানাই ছিল না বন দপ্তরের। একই ভাবে ক্যামেরার ছবি দেখে জানা গেল ডুয়ার্সের এই বনে **লার্জ ইন্ডিয়ান সিভেটের বিচরণও** আছে।

এই সংরক্ষিত জঙ্গলে নতুন করে ভিন রাজ্য থেকে বাঘ নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর বেশ কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব জানা যাওয়ায় উৎসাহিত বনকর্তারা। বাঘের আবাসের প্রয়োজনীয় জৈব বৈচিত্র্য এতে সুরক্ষিত হবে বলে তাঁরা মনে করছেন। তাঁদের অনুমান, আরও নানা অজানা বন্যপ্রাণী থাকতে পারে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনে। সেজন্য খুব শিগগির ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার এই বনাঞ্চল আরও ৫০০ টি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, এ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণী শাখা) রবিকান্ত সিনহা। বক্সা প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা এন এস মুরলি বলেন, 'এতে আবার প্রমাণ হল যে এই জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ।' ক্ষেত্র অধিকর্তার বক্তব্য, 'ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি সবুজ সঙ্কেত দেওয়ায় এখানে নতুন করে বাঘ নিয়ে আসার প্রক্রিয়া এখন জোর কদমে চলছে। তার মধ্যে বেশ কিছু এমন প্রাণীর হদিস মেলাটা অত্যন্ত সদর্থক বার্তা দিচ্ছে। এখন আর কোনও ঝুঁকি না- নিয়ে ওই বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।' বক্সা জঙ্গলে বাঘের সন্ধান পাওয়ার জন্য ৫০ টি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। তাতে বাঘের ছবি ধরা না-পড়লেও এই প্রাণীগুলির অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার, ইয়েলো থ্রোটেড মারটিন, লার্জ ইন্ডিয়ান সিভেট ছাড়াও ক্যামেরায় ধরা পড়া প্রাণীগুলির নাম **মারবেল ক্যাট, লেপার্ড ক্যাট, ক্লাউডেড লেপার্ড, সেরো** ইত্যাদি। এদের বেশির ভাগ প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় থাকে, যেখানে মানুষের আনাগোনা প্রায় নেই।

বন দপ্তর মনে করছে, বক্সা বনে যে প্রাণীদের সন্ধান এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি, ৫০০ ক্যামেরা বসালে তাদের হদিস করা যাবে। একসময় এই জঙ্গলে এক শৃঙ্গি গন্ডার ও বুনো মোষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আশির দশকে চোরাশিকারিদের দাপটে ওই দুটি প্রাণী হারিয়ে গিয়েছিল। বনদপ্তর চেষ্টা করেও তাদের আর এই জঙ্গলে ফেরাতে পারেনি। নতুন যে প্রাণীগুলির খোঁজ মিলল, তাদের যাতে একই পরিণতি না-হয়, সেজন্য তাই বন দপ্তর প্রথম থেকেই সতর্ক।

[সৌজন্য 'এই সময়']

নদীয়া জেলায় শান্তিপুর, চাকদা সমেত বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশ ধ্বংসের কাজ চলছে

গৌতম পাল

■ বাগান, জলাশয় ধ্বংসের পর এবার প্রমোটারদের গ্রাসে মাঠ, প্রতিবাদে এলাকাবাসী হাইকোর্টে :

শান্তিপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত একটি খেলার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, কল্লাপাড়ার মাঠ নামে সমধিক পরিচিত ঐ মাঠে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় শিশু ও বালকেরা খেলাধূলা করে। আর ও আর রেকর্ডে (রেকর্ড অব রাইটস) ঐ মাঠটি বাগান রূপে চিহ্নিত। মাঠটি প্রয়াত জনৈকা গিরিবালা দাসীর নামে নথিভূক্ত করা আছে এবং ৭০-৮০ বছর পূর্বে ঐ স্থনে তিনি বসবাস করতেন এবং তাঁর কোন জ্ঞাত উত্তরাধিকার না থাকায় স্থানীয় মানুষ মাঠটিকে খেলার মাঠরূপেই ব্যবহার করে আসছেন। সেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানান পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, শান্তিপুরের জনৈক প্রমোটার ত্রিদিব ঘোষ

মাঠটিকে বেআইনিভাবে দখলের উদ্দেশ্যে কলকাতার কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সাহায্যে কলকাতায় এক দলিল তৈরি করে স্থানীয় ভূমি সংস্কার অফিসে নিজেদের নাম মিউটেশন করে রাণাঘাটে মহকুমা আদালতে স্থানীয় দুজন ব্যক্তির নামে ১৪৪ ধারায় মামলা করে একতরফা আদেশ বার করেন; যদিও ওই আদেশে মাঠটিকে ঘেরার জন্য পাঁচিল নির্মাণে সাহায্য করার এমন কোন নির্দেশ পুলিশের ওপর ছিল না। কিন্তু স্থানীয় মানুষ অভিযোগ জানিয়েছেন যে, শান্তিপুর থানার জনৈক পুলিশ আধিকারিক কল্লাপাড়ার নিরীহ ব্যক্তিদের এমনকি শিশু ও গৃহবধূদের পর্যন্ত থানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রেখে ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে মাঠে পাঁচিল তুলতে প্রমোটারদের সাহায্য করেন। ত্রিদিব ঘোষের খরিদা দলিলে মাঠটিকে জনৈক কার্ত্তিক চন্দ্র দাসের উইলকৃত সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওই উইলে প্রবেটের কোন উল্লেখ নেই। দলিলে উল্লেখিত 'দেবোত্তর' সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জেলা জজ আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনা প্রবেটে, জেলা জজ আদালতের বিনা অনুমতিতে ত্রিদিব ঘোষ, স্থানীয় জনৈক রাজু দাস ও প্রশাসনের কিছু অসৎ কর্মচারীর সহায়তায় ও অসৎ রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য স্থানীয় মানুষদের ফুসফুস হিসাবে পরিচিত একমাত্র মাঠটি বেদখল হতে চলেছে। জমি রাক্ষসদের কবলে শান্তিপুরের অসংখ্য পুকুর ভরাট হয়েছে, অসংখ্য বাগান ধ্বংস হয়েছে, এবার খেলার মাঠগুলিও একে একে ধ্বংস হওয়ায় পরিবেশ কর্মীরা অত্যন্ত চিন্তিত। এমতাবস্থায় মাঠটি রক্ষার জন্য ও উক্ত পুলিশ আধিকারিকের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দরবার সর্বোপরি মহামান্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে চলেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ।

■ নদীয়া জেলার শান্তিপুর, চাকদহ সহ সর্বত্র পরিবেশ ধ্বংসকারীদের রমরমা :

অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে শান্তিপুর, চাকদহ সহ নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে পুকুরভরাট, বাগান কাটার মতো পরিবেশ ধ্বংসকারী ঘটনা রমরমিয়ে চলছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে এইভাবে পুকুর ভরাট, বাগান তথা সবুজ ধ্বংস চললেও প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। চাকদহ পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে মাছবাজারের পার্শ্ববর্তী একটি পুকুর ভরাট করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। স্থানীয় চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এই বেআইনিভাবে পুকুরটির ভরাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাকদহ থানাকে লিখিতভাবে জানালেও চাকদহ থানা রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন আইনী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে চাকদহ এলাকায় পরিবেশ কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পাশাপাশি শান্তিপুরে কিছুদিন পূর্বে ৬ নং ওয়ার্ডে একটি বাগানের ৮টি বিশাল আমগাছ বেআইনিভাবে ধ্বংস করে ফেলা হলো। আবার অতি সম্প্রতি শান্তিপুর পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডে একটি বাগান কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেটে ফেলা হলো। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বাগানটি বেআইনিভাবে কাটার সাথে ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের ঘনিষ্ট ব্যক্তিরা যুক্ত। বাগান কাটার সময় ঘটনাটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে জানাবার জন্য মোবাইল ফোনে বারংবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও ওসির সাথে ফোনে যোগাযোগ করা যায় নি। বিষয়টি জেলা বন দফতরকে জানানো হয়েছে। ২নং ওয়ার্ডেও একটি বাগান বেআইনিভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, বন দফতরের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একটি অংশের সাথে পরিবেশ ধ্বংসকারীদের ঘনিষ্ঠ আঁতাতের ফলে আগামীদিনে যে ব্যাপকভাবে সবুজ ধ্বংস, জলাশয় ভরাটের মতো বেআইনি ও পরিবেশ বিরোধী কার্যকলাপ রমরমিয়ে চলবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশের তোয়াক্কা করে না এরা। মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ, জলাশয় রক্ষার আবেদন এদের কাছে মূল্যহীন। তাই একমাত্র ব্যাপক গণআন্দোলনই এই পরিবেশ ধ্বংসরোধের একমাত্র পথ। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, শান্তিপুরের পৌরপ্রধানের কি শান্তিপুরের সবুজ ধ্বংস রোধ করার ব্যাপারে কিছুই করার নেই যেখানে চাকদহের পৌরপ্রধান নিজে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন? সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী চাকদহের পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নদীয়ার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন।

■ পুরকর্তাদের প্রচ্ছন্ন মদতে একের পর এক জলাশয় ভরাট চলছে শান্তিপুরজুড়ে :

শান্তিপুর পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নতুন হাট ফাঁড়ির ঠিক পিছনে শান্তিপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঃ অপাঃ সোসাইটি লিমিটেড এর জলাশয়টি ধীরে ধীরে মাটি ও জঞ্জাল ফেলে ভরাট করা চলছে। অভিযোগে প্রকাশ, শান্তিপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের কর্মকর্তাদের অন্যতম জনৈক ব্যক্তি শান্তিপুরের প্রমোটিং কাজকর্মে যুক্ত। তারই প্ররোচনায় এবং শাসক দলের একটি গোষ্ঠীর মদতে জলাশয়টিতে মাটি ও জঞ্জাল ফেলে ভরাট প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে চালানো হচ্ছে। জঞ্জালগুলি জলাশয়ের ধারে এনে প্রথমে জমা করা হচ্ছে এবং তারপর সময় বুঝে বুলডোজার এনে জঞ্জালগুলি জলাশয়ে ঠেলে ফেলা হচ্ছে। পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলার থেকে পৌরপ্রধান সব জেনেও নিশ্চুপ। এদিকে পুরসভার প্রচার চলছে, শান্তিপুরকে নাকি গ্রীণ সিটি বানানা হচ্ছে তিনশ কোটি টাকায়। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে জানা গেল, জলাশয়টি 'আলি ডোবা' নামে অধিক পরিচিত। পুরসভার লোকজনকে দিয়ে মাটি ফেলানো হচ্ছে যাতে জলাশয়টি ভরাট করে ওখানে ভবিষ্যতে হাট বা বাজার বানানো যায়। জলা ভরাটের এই কান্ডে পুরসভার নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় স্থানীয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাদের প্রশ্ন, এলাকায় আগুন লাগলে দমকল কোথা থেকে জল সংগ্রহ করে

আগুন নেভাবে যদি এইভাবে জলাগুলি বুজিয়ে ফেলা হয়? পুরসভা বা কাউন্সিলার কি এসব নিয়ে কিছুই ভাববে না? সর্বত্র শুধু টাকা কামানোর ধান্ধা আর প্রচারের ধাপ্পাবাজি! বিষয়টি নিয়ে শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি পুরসভা সহ জেলাপ্রশাসনের সর্বত্র জানিয়েছে যাতে অবিলম্বে এই বেআইনি ভরাট বন্ধ হয়। নচেৎ পুরসভার বিরুদ্ধে অদালতের শরণাপন্ন হবে জানিয়েছে শান্তিপুর বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতি।

■ ১১ নং ওয়ার্ডে ব্রজপুকুর ভরাট বন্ধ করলো স্থানীয় মানুষ, পুরসভা-প্রশাসন নিষ্ক্রিয় :

শান্তিপুর পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ব্রজপুকুরটি (বর্তমানে ব্রজ ডোবা নামে পরিচিত) ভরাট করছে ঐ জমির মালিক, এই মর্মে অভিযোগ স্থানীয় দাদ্দে ছুতোর পাড়ার বাসিন্দাদের। গত ৬ই ডিসে: স্থানীয় মানুষ গণস্বাক্ষর সম্বলিত এক পত্রে শান্তিপুর পুরসভার পৌরপ্রধানকে জানিয়েছেন যে, ঐ জমির মালিক ব্রজ পুকুরটিকে এমনভাবে ঘিরে ফেলছে কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে যাতে ঐ ডোবায় বর্ষার জল না পৌঁছাতে পারে। উল্লেখ্য বৃষ্টি হলে ঐ ডোবাটিতে স্থানীয় এলাকার সমস্ত জল এসে জমে। ফলে নীচু এলাকা হলেও স্থানীয় সাধারণ মানুষের ঘরে জল জমতে পারে না। তাই এলাক ার মানুষের সুবিধার্থে ঐ ডোবাটি যাতে প্রাচীর দিয়ে না ঘেরা হয় তার জন্য পৌরপ্রধানের হস্তক্ষেপ তারা দাবী করেছেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ইতিমধ্যে ডোবাটি অনেকাংশই মাটি, জঞ্জাল ফেলে ভরাট করা হয়েছে। উল্লেখ্য সরকারী রেকর্ডে ৩৮ শতকের এই বিশাল জমিটি ইতিমধ্যে প্রসূতি পুকুর নামেই চিহ্নিত। স্থানীয় মানুষই নিজ উদ্যোগে পুকুরটি ভরাট বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। আবার প্রাচীর দিয়ে পুকুরটি ঘিরতে গেলে স্থানীয় মানুষই বাধা দিয়েছেন। পুরসভার কাছে তারা সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করে গণ দরখাস্ত জমা দিলেও পুরসভা এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগে প্রকাশ। শান্তিপুর থানা বা ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিককে স্থানীয় মানুষ জানিয়ে কোন ইতিবাচক ফল পাননি বলেই জানা গেছে। বরং থানার ভূমিকা নেতিবাচক বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ, পুরসভায় ঐ পুকুরটির বর্তমান মালিক বসতি নির্মাণের প্ল্যান মঞ্জুর করানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষের সক্রিয় ভূমিকায় বসতি নির্মাণের সেই চক্রান্ত ভেস্তে যায়। বিষয়টি স্থানীয় মানুষ স্বামীজী নেতাজী আইডিয়াল ইয়ুথ সোসাইটিকে জানানোর পর সংগঠনের পক্ষ থেকে পৌরপ্রধান থেকে রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে পুকুরটি ভরাট বন্ধ শুধু নয়, পূর্বের অবস্থায় পুকুরটিকে ফিরিয়ে আনার দাবী জানানো হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে রাজ্য সরকার এক বিশেষ নির্দেশিকা প্রকাশ করে পৌর এলাকায় পুকুর ভরাট বন্ধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পুরপতি বা কমিশনারের উপর ক্ষমতা অর্পন করেছে। তাই পুরপতি এ ব্যাপারে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা না দিলে আদালতের শরণাপন্ন হবেন বলে এলাকার মানুষ জানিয়েছেন।

[সৌজন্যে : নতুনের সন্ধান]

পথের অধিকার, বন্যপ্রাণ ও প্রগতি

রামজীবন ভৌমিক

''হাতিকে স্যালুট করতে গিয়ে সিদ্দিকুলা রহমানের মৃত্যু''- দৈনিক সংবাদ পত্রে এই সংবাদ (২৪/১১/২০১৭)। অন্তর্জালে তার টাটকা দৃশ্য। পড়ে দেখে মন বিষণ্ণ হয়ে এল। হাতি তার পূর্বপুরুষের চলাচলের পথ ফিরে পেতে মাঝে মাঝে অবরোধ, ধর্না দিয়ে বসে বিভিন্ন জাতীয় সড়কে, রেল লাইনে অথবা ফসলের ক্ষেতে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান ফুঁড়ে বইয়ে দেওয়া ৩১ নং জাতীয় সড়কে মহাকাল ধামের কাছে এক বৃহৎ দাঁতাল। বৃহস্পতিবার (২৩/১১/২০১৭) বিকেল তিনটে থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দুপাশে ট্রাফিকের সারিসারি অবস্থান। এমনই এক সমাপতনে সিদ্দিকুলা রহমানের মৃত্যু।

সন্ধ্যা বা তার পর হাতির ভয়ে অতি দ্রুত জঙ্গলের জাতীয় সড়কে পার করতে গিয়ে মাঝে মাঝে যান দুর্ঘটনায় পরে। মানুষের মৃত্যুর ঘটনা এই জাতীয় সড়তে লেগেই আছে। স্থানীয় বনবাসী মানুষ হাতিকে মহাকাল বাবা সম্বোধনে স্মরণ করে। হ্যাঁ প্রতি সম্বোধনে ডানহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সহ। প্রকৃতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা শহরবাসীর কাছে হাতি এত শ্রদ্ধা বা ভয় কোনওটাই দাবী করতে পারে না। হাতি আমাদের কাছে মজা, এন্টারটেইনার মাত্র। হাতি প্রায় প্রতিদিন আত্মসম্মান সহ নিজের বাসস্থান নিজের মত করে ফিরে পেতে কোনও না কোনও বিক্ষোভ প্রতিবাদ করে। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের চালের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া, মুদি দোকান গুঁড়িয়ে আটা বা ডাল নষ্ট করা প্রভৃতি। বনবাসি মানুষের ঘরদোর তছনছ করে বেঘর করে দেওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সারা ভারতবর্ষের তুলনায় উত্তরবঙ্গে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। সম্প্রতি হাতির এরকম মেজাজ মর্জির কারণ খুঁজতে গিয়ে ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' (Wild Life Trust of India),' 'প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট এবং ইংল্যান্ডের এনজিও 'এলিফ্যান্ট ফ্যামিলি' 'রাইট ওফ প্যাসেজ' নামক একটি ৮০০ পৃষ্ঠায় গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছে। তাদের গবেষণায় হাতি চলাচলের পথ কেমন ছিল, এখন কেমন হয়েছে, তার বিবরণ আছে।

গবেষণা থেকে হাতি মানুষ দ্বন্দ্ব কেন এমন রূপ পেল তার একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। হাতির দলগুলি সংসার পাতা, খাওয়া-দাওয়ায় সামগ্রি যোগাড় করা, রাতে ঘুমানো, খেলতে যাওয়া বা চড়ে বেড়ানোর জন্য সারা বছর ৩০০ বর্গকিলোমিটার থেকে ৫০০ বর্গকিলোমিটার অরণ্য জুড়ে ঘরবাড়ি, উঠোন বা বাসস্থান অনুভব করে। শত শত বর্গকিলোমিটার বনানী ব্যাপ্ত উঠোনের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি পথ দিয়েই হাতির দল এঘর ওঘর চলাচল করে। এই নির্দ্দিষ্ট গুটিকয়েক পথকেই বলে, 'এলিফ্যান্ট করিডোর', বা হাতির চলাচলের পথ। করিডোর বা হাতির চলাচলের পথগুলি বৃহৎ আয়তনের অরণ্যের সাপেক্ষে প্রশস্তে এক কিলোমিটারের কম বা সর্ব্বোচ্চ তিন-চার কিলোমিটার হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম হাতি তার করিডোরগুলি জন্মগত অধিকারে এবং স্বভাবদলিলিকৃত মালিকানায় ব্যবহার করে বেঁচে বর্তে ছিল।

মানুষ পৃথিবীর স্বঘোষিত মহান জীব এসে ঘোষণা করলো ও সব ওমুক (কেন্দ্রীয়) সরকারের বা তমুক (রাজ্য) সরকারের। গাছের বাড়ি, হাতির বাসস্থানের মালিক রাজা বাদশা থেকে আজ কেন্দ্রীয় বনদপ্তর, রাজ্য বনদপ্তর বা রাজস্ব দপ্তর বলে ফরমান বেরোলো। একবার যা মানুষের তাতে আর কারো পাশাপাশি থাকার কোনও অধিকার নেই। ক্রমোচ্চবিন্যাস বা হায়ারার্কির ধারণায় বন্য জীব হয়ে গেল পশু অর্থাৎ নিকৃষ্ট। না আছে তার বেঁচে থাকার সভ্য অধিকার না থাকে তার ঘর দোর উঠোন নিয়ে সংসার পাতার পরিসরের ভাবনা। আগে মানুষ, পিছে মানুষ, মাঝে মানব- পদপৃষ্ট সব প্রাকৃতিক জীবকূল। এক রকমের প্রাকৃতিক জীব হিসেবে অপরাপর জীবকুলের সাথে পাশাপাশি থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে — এটাই উন্নয়ন হওয়া কাম্য ছিল। কিন্তু এই বাস্তব ধারনা থেকে দূরে সরে শুধু জীবকূল ও তার ধারক প্রকৃতির ধ্বংসের নেশাই উন্নয়ন বলে মানুষ সদর্পে ঘোষনা করছে। ভারতবর্ষ জুড়ে হাতিকে মানুষ কিভাবে উন্নয়নের পায়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে তার অনেক পরিসংখ্যান, গদ্য ছড়িয়ে আছে ''রাইট অফ প্যাসেজ' বা ''একফালি পথের অধিকার' গবেষণাপত্রে। গবেষকরা জানাচ্ছেন ভারতবর্ষে ২০০৫ সালেই হাতির চলাচলের পথসংখ্যা ছিল ৮৮ টি। কিন্তু ২০১৭ সালে ১৩ টি বেড়ে হয়েছে ১০১টি। হস্তিযুথ তার একটি চলাচলের পথের জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আয়তনের অরণ্য ব্যবহার করে। যেমন দক্ষিণ ভারতে ১৪১০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপূর্ব ভারতে ১৫৬৫ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর, মধ্য ভারতে ৮৪০ বর্গকিমি প্রতি একটি করিডোর, উত্তরপশ্চিম ভারতে ৫০০ বর্গকিলোমিটার প্রতি একটি করিডোর। উত্তরবঙ্গে কত? গবেষক গোষ্ঠীর মতে ভারতবর্ষে মোট ১০১ টি করিডোরের মধ্যে ২৮ টি দক্ষিণ ভারতে, ২৩ টি উত্তরপূর্ব ভারতে, ২৫টি মধ্য ভারতে এবং উত্তরপশ্চিম ভারতে ১১টি করিডোর আছে। উত্তরবঙ্গে আছে হাতির চলাচলের নির্দ্দিষ্ট পথ। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে হাতির চলাফেরা করে সুস্থ জীবন যাপন করার জন্যে প্রতিদিন ৭০% করিডোর ব্যবহার করার প্রয়োজন পরে। ২৫% পথ মাঝে মাঝে দরকার, ৫% হঠাৎ হঠাৎ।

■ করিডোরের বিবর্তন :

আমাদের দেশে হস্তিগোষ্ঠির বাসস্থানের উঠোন চিরে উন্নয়নের বিজয়পথ চলছে। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, রেলপথ, চা বাগান, কৃষি জমি তৈরী, করাতকল, ঘরবাড়ি, খনি, কারখানা তৈরী- এক কথায় যে যা চায়, তাই নির্বিঘ্নে ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এভাবে গড় হিসাবে দেশের প্রতি তিনটি করিডোরের মধ্যে দুটিতেই মানুষ চাষ আবাদ শুরু করেছে। শতাংশের হিসেবে গড়ে ৬৯% করিডোর আটকে কৃষি উৎপাদন চলছে। মধ্য ভারতে ৯৬% করিডোর চাষের কবলে। রাজ্য বা জাতীয় সড়ক তৈরী করার সময় সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনটি এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে দুটি করিডোর নষ্ট করেই সড়ক তৈরী করেছে। পাহাড়ি পথে রেল লাইন, ক্যানাল তৈরীতে ১১ শতাংশ করিডোর নষ্ট হয়েছে। খনিজ সম্পদ আহরন, পাহাড়ের বোল্ডার উত্তোলনের জন্য ১২ শতাংশ করিডোর ধ্বংস করা হয়েছে। আমরা গত এক দশকে প্রাকৃতিক বনজঙ্গলের ধরন ধারন দ্রুত বদলে দিচ্ছি। ফলে হাতির চলার পথে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে হাতিকে একরকম চোখ রাঙ্গিয়ে বাধ্য করছে তাদের চলাচলের চিরাচরিত পথ ছেড়ে দিয়ে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে। গবেষকদের মতে হাতিরা অত্যাচারিত হয়ে তাদের বহুল ব্যবহৃত সাতটি পথে যাওয়া আসা একেবারেই স্থগিত রেখেছে। বদলে ২০টি নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। চারপাশ দিয়ে উন্নয়ন ধেয়ে এসে এলিফ্যান্ট করিডোর-গুলির মুখ বোতলের ছিপির মতো বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৫ সালে ১ কিলোমিটার বা তার কম পরিসরের জন্য এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল ৪৫.৫ শতাংশ যেটা ২০১৭ তে বেড়ে হয়েছে ৭৪ শতাংশ। ১ কিমি থেকে ৩ কিমি দৈর্ঘ্যের চলাচলের পথ গত এক দশকে ১৯ শতাংশ কমে গিয়েছে। ২০০৫ সালে শুধুই বনানী আশ্রিত এলিফ্যান্ট করিডোর ছিল চব্বিশ শতাংশ, এবছর মাত্র ১২.৯০ শতাংশ। গত ত্রিশ বছরে দ্রুত গতির রেলগাড়ি হাতি করিডোর জবরদখল করে হাতি যুথের দেহের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালিয়ে ২৬৬টি হাতিকে পিশে মেরেছে।

উত্তরবঙ্গে হাতি ঘেটো :

ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরবঙ্গে হাতি-মানুষ সন্মুখ সমর অবস্থা খুবই উদ্‌বেগজনক। উত্তরবঙ্গে তিনটি জেলা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে নয়টি ফরেস্ট ডিভিশনের মোট অরণ্য এলাকা ৩০৫১ বর্গকিলোমিটার। তার মধ্যে ২২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ৩০০টি হাতি বাসস্থান গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের মোট হাতির এক শতাংশ আছে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে। মেচি নদী থেকে ভূটান আসাম সীমান্তে সঙ্কোস নদী অবধি বিস্তৃত অরণ্যে হাতি

করিডোরের সংখ্যা ১৪টি। উত্তরপূর্ব ভারতের তুলনায় ভাবলে উত্তরবঙ্গে হাতি করিডোর থাকা উচিৎ মাত্র ২টি। উত্তরবঙ্গের এত অপরিসর অরণ্য প্রতি ১৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের অরণ্য পিছু একটি করে এলফ্যান্ট করিডোর। এই ১৪টি এলিফ্যান্টকরিডরের মধ্যে ৮৬ শতাংশ করিডোর হস্তি যূথ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে। উত্তরবঙ্গের ৩৫.৭০ শতাংশ এলিফ্যান্ট করিডোর নষ্ট করে রেলগাড়ি যাতায়াত করছে। ১০০ শতাংশ করিডোরের মুখ আগলে কোন না কোন চাষ আবাদের কাজ চলছে (সর্বভারতীয় গড় ৭০%)। চা-বাগান, মানুষের বসতি, রেল লাইন, জাতীয় সড়ক প্রভৃতি এলিফ্যান্ট করিডোরের উপর অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে হাতিদের স্বাভাবিক বাসস্থান-অরণ্য আজ বৃহৎ মাপের জেলখানা বা প্রাকৃতিক কুঠুরিতে পরিণত হয়েছে। হাতি গোষ্ঠীকে তরাই-ডুয়ার্স জঙ্গলে ঘেটোতে (ghetto) বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। দিন যাচ্ছে ঘেটোবন্দী জীবন হাতি মেনে নিচ্ছে না। মানুষ ও মানুষের প্রগতির সাথে হাতির সংঘর্ষে সারা ভারতবর্ষে প্রতি বছর ১০০ টি হাতি শহীদ হচ্ছে। প্রায় ৪৫০ জন সাধারন মানুষের জীবন আকস্মিক যবনিকা নেমে আসছে। সারা দেশের তুলনায় উত্তরবঙ্গে সাধারন মানুষের বাৎসরিক মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশী। প্রতি বছর প্রায় ৫০ জন মানুষ হাতির শুঁড়ের আছাড়ে বা পদপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করছে।

■ **হাতির করিডোর রক্ষায় পদক্ষেপ সমূহ :**

ওয়াইল্ড লাইফ কনসারভেসন সোসাইটি ওফ ইন্ডিয়ার (WCS) পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বিদ্যা আত্রেয় হাতির করিডোর রক্ষার জন্য সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। কয়েক মাস আগে সুপ্রীম কোর্ট নয়টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যকে অতি জরুরি ভিত্তিতে ২৭টি এলিফ্যান্ট কডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে পূনর্বাসনের নির্দেশ দিয়েছে। হাতির করিডোর পূনর্বাসনের জন্য ২০০৩ সালে 'ইন্টারন্যাশানাল ফান্ড ফর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার' এবং 'ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া' যৌথ ভাবে ২৫.৫ একর জমি অধিগ্রহন করে ২০০৭ সালে কর্ণাটক সরকারের হাতে তুলে দেন। রাজ্য বনদপ্তর, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, (MOEFCC), ওয়াইল্ড লাইফ অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংরক্ষণ সংস্থার চেষ্টায় মাত্র আটটি (৮টি) এলিফ্যান্ট করিডোরের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গিয়েছে। সুরক্ষিত পথ গুলি হাতিদের চলাচলের জন্য দ্রুত যোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ''রাইট অফ প্যাসেজ'' গবেষক গোষ্ঠীর মতে ১২টি হাতি অধ্যুষিত রাজ্যের অরণ্য বাসীদের প্রমাণ সাইজের হাতির পুতুল তৈরী করে ''গজ-যাত্রা'' নামক সচেতনতা মূলক পরিক্রমা বের করে মানুষ-হাতি সংঘর্ষের কারণ গুলি প্রচার করা দরকার।

■ **বনবাসী উচ্ছেদ ও হাতি :**

হাতিদের চলাচলের পথগুলি সংরক্ষণ খুব জরুরি। কিন্তু বনবাসী উচ্ছেদ করে সেই কাজে সফলতা লাভ আদৌ কি সম্ভব? বনবাসিরা অরণ্যের স্বাভাবিক সন্তান এবং অভিভাবকও বটে। যারা বনের বৃক্ষরাজি, পশুপাখির সাথে পাশাপাশি বেঁচে থেকে এসেছে আবহমান কাল থেকে। স্বাভাবিকভাবে বনকে রক্ষা করে নিজেরা বেঁচে আছে। সরকারী নির্দেশে এবং প্রগতি মরিচিকার চাপে পথ ভ্রষ্ট হয়ে তারা আজ বনের স্বতস্ফুর্ত রক্ষাকারী থাকতে পারছে না। সরকার এই ধরনের প্রাকৃতিক প্রহরীকে সরিয়ে যথেষ্ট বনরক্ষী নিয়োগ করতেও পারছে না। সরকার, বনরক্ষাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ও সচেতন সাধারন নাগরিকের উচিৎ বনবাসীদের স্বাভাবিক বন রক্ষার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার কোনও সমাধান খুঁজে বের করা। প্রচলিত প্রগতির ধারাকে লাগাম পরিয়ে কোনও বিকল্প ভাবনায় আমরা যৌথ ভাবে পৌঁছাতে না পারলে এলিফ্যান্ট করিডোর রক্ষার আর কোনও আশা নেই।

আমাদের এখনই উচিৎ হাতি গোষ্ঠীদের চলাচলের পথগুলি ফিরিয়ে দেওয়া। নইলে যে অরণ্য বৃক্ষরাজির মাথায় কিরণ ছড়িয়ে সূর্য উদিত হয় সেখানে মরুভূমির উষ্ণ বালির চিক্ চিক্ প্রতিফলনে সেই সূর্য অস্তমিত হবে।

■ **বাঘের আত্মপ্রকাশ :** ভূটান-সিকিম সংলগ্ন কালিমপঙ জেলার বৈচিত্র্যময় নিবিড় নেওড়ার জঙ্গলে গত একবছরে তিন বার রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলল। পর্যটকদের সামনে এবার শীতের মরশুমে সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত বাঘেরা যেভাবে জঙ্গল-নদী প্রান্তে এসে দেখা দিল তাও নজিরবিহীন। আর পশ্চিম মেদিনীপুর- বাঁকুড়ার জঙ্গলে শার্দুল রাজের আগমনও একটি নতুন ঘটনা।

■ **প্রতিবাদের শাস্তি :**

ফেসবুকে পালানিস্বামী সরকারের জনসমস্যা নিয়ে নির্লিপ্তির কার্টুন আঁকার জন্য জেলে যেতে হল তামিল কার্টুনিস্ট জি.বালাকে। অন্যদিকে মমতা সরকারের ডেঙ্গু প্রতিরোধে চূড়ান্ত ব্যর্থতার ও অব্যবস্থার জ্বলজ্যান্ত ছবি তুলে ধরার জন্য সাসপেন্ড হতে হল বারাসত হাসপাতালের প্রবীন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অরুনাচল দত্ত চৌধুরীকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

রসায়নপ্রিয় লেখক ও তাঁর দুঃসহ অতীত

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসের ১১ তারিখ, শনিবার। এই সময়টা ইউরোপে গ্রীষ্মকাল। ইটালির উত্তরভাগের বন্দর-শহর ট্যুরিন ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ঘড়ির কাঁটা তখন সবে সকাল দশটা পেরিয়েছি। শহরের Corso Re Umberto 75, এই ঠিকানায় ঊনবিংশ শতাব্দীর তৈরী একটি বিল্ডিংয়ের চার তলায় অ্যাপার্টমেন্টে প্রহরী কলিং বেল বাজালেন। আর পাঁচটি স্বাভাবিক দিনের মতোই দরজা খুলে বের হলেন প্রাইমো লেভি। তার পরনে ছোটো হাতা জামা। হাসিমুখে প্রহরীর হাত থেকে চিঠি সংগ্রহ করে তাকে ধন্যবাদ জানালেন ও দরজা বন্ধ করলেন। দরজার বাইরে প্রশস্থ ঘোরানো সিঁড়ি ও মাঝে লিফট্। তখনো সেই প্রহরী নিচতলায় তার বসার ঘরে এসে ঢোকেন নি। যেন বিকট শব্দে কিছু একটা মেঝেতে আছড়ে পড়লো। শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে তিনি দেখলেন সিঁড়ির তলায় লিফটের কাছে লেভির দেহ পড়ে আছে। ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল ১০:২০। একই বিল্ডিংয়ে থাকা এক দাঁতের ডাক্তার তক্ষুণি পরীক্ষা করে জানালেন প্রাইমো লেভি আর বেঁচে নেই। ময়নাতদন্তে জানা যায় পড়ে গিয়ে মাথার খুলি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। এ ছাড়া আর কোনো অস্বাভাবিকতা লেভির দেহে ধরা পড়ে নি। মৃত্যুর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর যখন রেডিও রোম দুপুর ১২টার খবরে এই সংবাদ জানাচ্ছে ততক্ষণে সাধারণ কিছু পুলিসি তদন্তে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিকটাত্মীয় এবং বন্ধুরা তখন লেভির এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ। ইটালি ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন তাঁর অগনিত অনুরাগী। প্রাইমো লেভি আত্মহত্যা করবেন, এ যেন অবিশ্বাস্য! লেভি একজন রসায়ন গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। ঠিক ৬৭ বছর আগে এই অ্যাপার্টমেন্টেই তিনি জন্মেছিলেন।

ইটালিয়ান রাসায়নবিদ, বিজ্ঞানী ও লেখক লেভির পুরো নাম প্রাইমো মাইকেল লেভি। তবে তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় তিনি একজন হলোকস্ট সারভাইভার। ১৯১৯ সালে ট্যুরিন শহরের এক উদার ইহুদি পরিবারে লেভির জন্ম। বাবা সিজার হাঙ্গেরীতে গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানায় কাজ করতেন। প্রচুর বই পড়ার অভ্যাসের দ্বারা তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে স্বশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। আর মা রীনা-ও ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী। Instituto Maria Letizia-তে পড়াশুনা করা রীনা খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেন ও অনর্গল ফরাসী বলতে পারতেন। তবে ছাত্রাবস্থাতেই লেভি ফ্যাসীবাদ বিরোধী কয়েকজনকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইটালির নাম করা মানুষ হয়েছিলেন। এমনকি শ্রদ্ধেয় দার্শনিক নবার্তো ববিও এবং সাহিত্যিক সিজার পেভেস-ও স্কুলে লেভির শিক্ষক ছিলেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়াম ব্র্যাগস্-এর লেখা "Concerning the Nature of Things" এই বইটি সদ্য স্কুলের গন্ডি পেরোনো লেভিকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে তিনি একরকম ঠিকই করে ফেলেন ভবিষ্যতে তিনি একজন রসায়নবিদ হবেন। ইউনিভার্সিটি অফ ট্যুরিন-এ রসায়ন নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন লেভি। সমগ্র ইউরোপে তখন চরম রাজনৈতিক সঙ্কটাবস্থা। ১৯২৯-এ মুসোলিনি ক্যাথলিক চার্চের সাথে Lateran Treaty স্বাক্ষর করলেন। ফলে ক্যাথলিজমকে রাস্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে মেনে নেওয়া হলো এবং শুরু হলো ইটালিয়ান ইহুদিদের সাথে রাস্ট্রের সম্পর্কের অবনতি। ১৯৩৮-এ কিছু ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী প্রকাশ করলেন Manifesto of Race। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা জাতীয়তাবাদ, মতাদর্শগত, ভাষাগত বিভিন্নতা প্রভৃতির মিশ্রনে গড়ে ওঠা এই তত্ত্ব রাস্ট্রীয় কাঠামোতে লাগু হওয়ার পর থেকেই দেশে ইহুদিরা তাদের সাধারন নাগরিক অধিকারগুলো হারাতে শুরু করলো। সরকারি অফিসে চাকরি থেকে শুরু করে ইহুদি লেখকদের বই প্রকাশ এমনকি কোনো ম্যাগাজিন লেখার অধিকার অবধি রইল না। মেধাবি লেভিও ইহুদি হওয়ার অপরাধে গ্র্যাজুয়েশন থিসিসের জন্য কোনো গাইড পাচ্ছিলেন না। অনেক কষ্টে ডঃ ডেলাপোর্টা নামে এক অধ্যাপককে রাজী করিয়ে তিনি থিসিস জমা করেন। তবে ডিগ্রীর সার্টিফিকেটে লেভি দেখলেন সেখানে "of Jewish race" কথাটি লিখে দেওয়া হয়েছে।

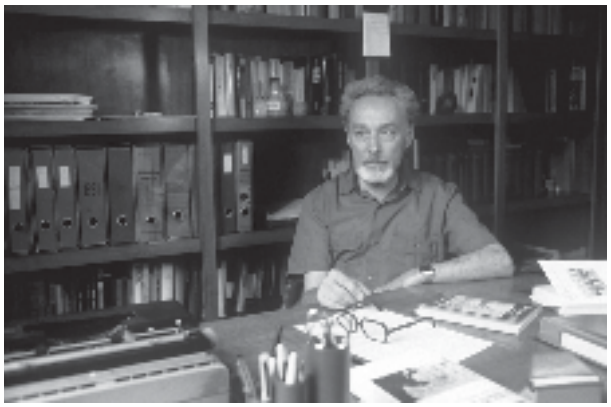

অবশেষে ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে তিনি এক অ্যাস্‌বেসটস্ খনিতে রসায়নবিদের চাকরি পান। কিন্তু ইহুদি হওয়ায় লেভি ছদ্মনামে এই চাকরি করতে বাধ্য হন। ততদিনে হিটলারের নাৎসী বাহিনী ইউরোপে তাদের দাঁত-নখ বের করতে শুরু করেছে। জার্মান অধিকৃত ইটালির বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে নাৎসী-প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন লেভি। এক বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সদস্য হিসাবে ঘুরে বেড়ালেন আল্পসের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়। এই সময়েই ১৯৪৩ এর ১৩ ই ডিসেম্বর ফ্যাসিস্ট মিলিটারী বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হলেন লেভি

ও তার সঙ্গীরা। তারপর যখন জানতে পারলেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে তাদের গুলি করে মারা হবে লেভি স্বীকার করলেন তিনি আসলে ইহুদি। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ফোসিলির এক ক্যাম্পে। জার্মান আধিপত্য কম থাকায় প্রায় দেড় মাস এই ক্যাম্পে খুব বেশী সঙ্কটে পড়তে হয়নি লেভিকে। জার্মানরা ফোসিলি দখল করলে ১৯৪৪ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারী অন্য বন্দীদের সাথে লেভিকে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। অবর্ণনীয় এই যাত্রায় ৬৫০ জন ইহুদিকে ১২টি মালবাহী ওয়াগানে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাত্রা শেষে কেবলমাত্র সুস্থ ৯৬ জন পুরুষ ও ২৯ জন মহিলাকে ক্যাম্পে ঢুকতে দেওয়া হয়। বেঁচে থাকা অসুস্থ ও মৃতপ্রায় অন্যান্যদের নিয়ে যাওয়া হয় গ্যাস চেম্বারে। এই ১২৫ জন ইটালিয়ান ইহুদির মধ্যে কেবল মাত্র তিনজন বেঁচে ফিরেছিলেন। তাদেরই একজন প্রাইমো লেভি। লেভির ঠাঁই হয় মনোউইৎস কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের তিনটি ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি ক্যাম্পের ১৭৪৫১৭ নম্বর বন্দী হিসাবে। লেভি এই নরকে প্রায় এগারো মাস কাটিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় থিসিস লেখার প্রয়োজনে জার্মান ভাষায় লেখা কিছু গবেষণা-প্রবন্ধ লেভিকে পড়তে হয়েছিলো। সেই সুবাদে কাজ চালানোর মতো জার্মান তিনি জানতেন। তাছাড়া রসায়নের প্রয়োগ দক্ষতাও লেভিকে ক্যাম্পের দিনগুলিতে অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে কারা-রক্ষীদের কাছে বাড়তি সুবিধা পেতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য বেঁচে থাকতে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার সহায়তাও তিনি পেয়েছিলেন। একবার তার পরিচিতি সঙ্গীদের যখন অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন সংক্রামক স্কারলেট জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। লেভি পরে জেনেছিলেন সেই সঙ্গীদের কেউই আর বেঁচে ফেরেন নি। ১৯৪৫ এর ২৭শে জানুয়ারী সোভিয়েত লাল ফৌজ এই ক্যাম্পকে মুক্ত করলে লেভিকে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ার এক ক্যাম্পে। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটানোর পর রাশিয়াতে যুদ্ধবন্দী ইটালিয়ান সৈন্যদের সাথে দেশে ফেরার সুযোগ হয় তাঁর। রাশিয়া থেকে নিজের শহর ইটালির ট্যুরিন ফেরার এই দীর্ঘ রেলযাত্রায় লেভি আজকের পোল্যান্ড, বেলারুশ, ইউক্রেন, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি অতিক্রম করেন। এই রেলযাত্রাকালে পথে-ঘাটে ট্রেনে বিচ্ছিন্নভাবে লেভি দেখেছেন সর্বস্ব খোয়ানো অবসাদগ্রস্থ মানুষদের। লক্ষ্য করেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবন যাপন। যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউরোপের মানুষদের সামনে তখন মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এ যেন এক নতুন সঙ্কট।

কন্সেন্ট্রেসন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার পর চূড়ান্ত মানসিক-ও শারীরিক অবসাদগ্রস্থ লেভিকে তাঁর নিজের শহর ট্যুরিনে ফিরে আসতে লেগেছিল প্রায় নয় মাস। ১৯৪৫ এর ১৯ শে অক্টোবর তিনি যখন ট্যুরিনে আসেন তখন তাঁর পরনে সোভিয়েত লাল ফৌজের একটি পুড়ানো ইউনিফর্ম, সর্বাঙ্গে চূড়ান্ত অপুষ্টির চিহ্ন। বেঁচে থাকা পরিচিত মানুষদের সহায়তায় কিছুটা স্বাস্থ্য উদ্ধারের পর প্রয়োজন হলো স্থায়ী উপার্জনের। ১৯৪৬ এর জানুয়ারিতে লেভি যোগ দিলেন 'ডু পন্ট কোম্পানি' নামে এক রঙের কারখানায়। পুরো সপ্তাহ কারখানার ডর্মিটরিতে কাটানোর সুবাদে তখন নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকতো তাঁর হাতে। কবিতা লেখা ছাড়াও পুড়ানো কাগজ, ট্রেনের টিকিট, খবরের কাগজের মার্জিনের ফাঁকা অংশে এই সময়েই তিনি লিখতে শুরু করলেন ক্যাম্পের ফেলে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতা। পরবর্তীকালে ইংরাজী অনুবাদে যা If This is a Man নামে ইউরোপ ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সারা ফেলে দিয়েছিলো। এই অভিজ্ঞতার পরবর্তী অংশ The Truce বইটি প্রকাশের দু'বছরের মাথায় ইটালিতে প্রিমিও ক্যাম্পিয়েলো লিটেরারি পুরস্কার পান। লেভি তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। একের পর এক প্রকাশিত হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন নিয়ে গল্পের বই ও কবিতার সংগ্রহ। ১৯৭৫ এ লিখলেন The periodic Table যা ২০০৬ সালে লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনের ভোটাভুটিতে সর্বকালের সেরা বিজ্ঞান বই হিসাবে আরো কয়েকটি বইয়ের সাথে শর্টলিস্টেট হয়েছিল। ১৯৭৯ এ ৫৮ বছর বয়সে SIVA পেইন্ট ফ্যাক্টরি থেকে অবসর গ্রহণের পর লেভি আরো বেশী করে লেখালেখি শুরু করেন। গল্প ও কবিতার পাশাপাশি এই সময় তিনি If Not Now, When? নামে একটি উপন্যাসও লেখেন

তবে লেখক জীবনের এতো সাফল্য সত্বেও লেভি কিন্তু কোনোদিন মানসিক শান্তি পান নি। সারা জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে কন্সেনন্ট্রেশন ক্যাম্পের ১৭৪৫১৭ নম্বর বন্দী হিসাবে হাতে লিখে দেওয়া স্থায়ী চিহ্ন। এই নম্বর যাতে দেখা যায় তাই সবসময় ছোটো হাতা সার্ট পড়তেন লেভি। প্রতিনিয়ত যেন তাকে তাড়া করে বেড়াতো কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দুঃস্বপ্ন। চোখের সামনে দেখেছেন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফেরা মানুষগুলোর মানসিক বিকার। পারলেই ছুটে যেতেন তাদের কাছে। সাহায্য করতে গিয়ে নিজেও মাঝে মাঝেই বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়তেন। চাইতেন জীবন থেকে ছুটি। হয়তো এইরকমই কোনো এক মানসিক অবস্থায় নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সুলেখক ও পোল্যান্ডের কুখ্যাত আউসউইৎস কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফেরা গুটিকয় ইহুদির অন্যতম মুখ প্রাইমো লেভি।

■ বিশ্ব বিদ্যালয় ছাত্র সাংসদ এ.বি.ভি.পি-র পরাজয় :

হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও মোদি সরকার, বিজেপি দল ও সঙ্ঘ পরিবারের এখনবধি দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ দখল করা হল না। ছাত্রছাত্রীরা বামপন্থী এ.আই.এস.এ. ও এস.এফ.আই. জোটের উপর ভরসা রেখেছে। এরপর এ.বি.ভি.পি.-র ঘাঁটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ.বি.ভি.পি. ছাত্র পরিষদের কাছে পরাজিত হল। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রোহিত ভেমুলার সমর্থক দলিত, নির্দল, গণতান্ত্রিক ও বাম ছাত্র জোট জয় ছিনিয়ে নিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবাদী দলের ছাত্র সংগঠন হারিয়ে দিল এবিভিপিকে। আমেদাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্বাচনেও নির্দল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট জয়লাভ করল। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে 'অল অসম স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (আসু)'-র নেতৃত্বে এ.বি.ভি.পি. বিরোধীরা জয়লাভ করে।

অর্থনীতির হালহকিকৎ

■ অর্থনীতি বেহাল, কিন্তু ধনীরা আরও ধনী :

- ৮০-র দশকে জাতীয় আয়ের ২২% নিয়ন্ত্রণ করত দেশের জনসংখ্যার ৬% ধনকুবের, আর এখন জাতীয় আয়ের ২২% নিয়ন্ত্রণ করে ১% অতি ধনী
- এই ১% অতিধনীর হাতে ৫৮.৪% জাতীয় সম্পাত্তি। আর ১০% ভারতীয় ধনীদের হাতে ৮১% জাতীয় সম্পত্তি
- বিশ্বের ১% কোটি কোটিপতির মধ্যে ভারতের ২,৪৮,০০০ জন
- বিশ্বের অতিধনীর মধ্যে ভারতীয় ১০১ জন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার পরেই।

■ বেহাল অর্থনীতি নিয়ে সঙ্ঘ পরিবারে ক্ষোভ :

আর.এস.এসের সরশঙ্ঘ চালক **মোহন ভাগবত** আর্থিক প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদী সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন গণসংগঠন যেমন **'স্বদেশী জাগরন মঞ্চ'**, শ্রমিক সাংগঠন **'ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ** (বি.এম.এস.), **'লঘু উদ্যোগ ভারতী'** প্রমুখ প্রকাশ্যে মোদি বিরোধী ও কেন্দ্র সরকারের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রী ও প্রবীণ সাংবাদিক **অরুণ শৌরি** নোট বাতিলকে 'বোকামি' ও জি.এস.টি-কে 'সরকারি ব্যর্থতা' বলেছেন। তার মতে নোট বাতিল প্রকল্পে যার কাছে যত কালো টাকা ছিল, তার সবটাই তারা ব্যাঙ্কে গিয়ে সাদা করে ফেলেছে। তাই নোট বাতিল 'বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারী'। তিনি আরও বলেছেন যে জি এস টি যে ঠিকমত রূপায়ন হচ্ছে না তার প্রমাণ হল তিন মাসের মধ্যে সাতবার নিয়ম বদল। আর সব চাইতে খারাপ হল, ঘটা করে একটা কর সংস্কারকে প্রায় দেশের স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়া ....। আর্থিক মন্দা ও গ্রোথ রেট ৫.৭% ১০১৭-র প্রথম তিন মাসে নেমে যাওয়ায় বিজেপি সাংসদ **সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিপদবার্তা পাঠিয়েছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী **যশবন্ত সিন্‌হা** বলেছেন যে একের পর এক অর্থনীতিক ক্ষেত্র খুবই বাজে অবস্থায় পৌঁছেছে। একে বিমুদ্রাকরণের বিপর্যয়, তার উপর অপরিকল্পিত ও তাড়াহুড়ো করে চালু করা জি এস টি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা হারিয়েছেন। মানুষ দরিদ্র হয়ে গেছে। ২০১৫ সালেই সরকার জিডিপি হিসাব করার পদ্ধতি পাল্টিয়ে ফেলে যাতে জিডিপি বেশী দেখানো যায়। এখন যে কম জিডিপি ৫.৭ দেখানো হচ্ছে, তা আসলে আরও কম ৩.৭। অর্থদপ্তরকে হাল্কাভাবে নেওয়া হয়েছে। একসময় আমরা বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে রেইড রাজের বিরোধিতা করেছি। এখন সেটাই হচ্ছে এবং চারিপাশে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে। ভারতের অর্থনীতি যে পথে চলছে তাতে পরের লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল। মিথ্যাচার ও বাকপটুতা দিয়ে বাস্তবকে ঢাকা যাবে না। প্রাক্তন চিত্রতারকা ও সাংসদ **শত্রুঘ্ন সিন্‌হা** বলেছেন যে কোনও অভিযোগে দলের বড় পদে থাকা কারও নাম জড়ালে তার তদন্ত হওয়া উচিত। বিভিন্ন মঞ্চে সাংসদ **শ্যামাচরন গুপ্ত, ওম প্রকাশ ধ্রুবে, নানা পাটোলেরা** বিমুদ্রাকরণ ও জি এস টি র বিরুদ্ধে সরব, **গুজরাট ভোটের আগে, কেন্দ্র ১৭৭ টি পন্যে জি এস টি কমাতে বাধ্য হল**। মোদির কৃষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে পথে নেমেছেন বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার কৃষি প্রতিমন্ত্রী **সোমপাল শাস্ত্রী**।

■ তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে সংকট :

তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে উল্লেখযোগ্য লগ্নী না হওয়ায়, বিদেশের বাজার ও উপভোক্তা হারানো, মৌলিক প্রযুক্তি না থাকা অথবা এর জন্য বহুজাতিক সংস্থা গুলির উপর নির্ভরতা, ছোট ছোট সংস্থা ও উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাব, ভারতের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি প্রভৃতি কারণে ভারতীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সঙ্কটে, প্রচুর কর্মী কাজ হারিয়েছেন ও হারাচ্ছেন, শ্রম কমিশনে দুই হাজারের বেশী কর্মী অভিযোগ জানিয়েছেন।

■ জয় শাহকে নিয়ে তরজা :

একটি ওয়েবসাইটে জানাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহ্ বিজেপি সভাপতি হওয়ার পরেই অমিতের ছেলে জয় শাহের ব্যবসা প্রায় ১৬ হাজার গুন ফুলে ফেঁপে ওঠে। প্যারাডাইস কেলেঙ্কারীতে বিজেপি মন্ত্রী, সাংসদের নাম জড়ানোয় এবং বেআইনী অর্থলগ্নীর ক্ষেত্রে গুজরাটের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় জয়শাহ থেকে জয়ন্ত সিন্‌হা থেকে নীতিন রূপানী সবার ক্ষেত্রে তদন্তের দাবী উঠে এসেছে।

■ খালি পেটের যন্ত্রণা :

'ইন্টার-ন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'র 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স বা জি.এইচ.আই' ফল প্রকাশে দেখা যাচ্ছে ভারতের পরিস্থিতি সাঙ্ঘাতিক ও ক্রমনিম্নমান। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রতি পাঁচজনের একজনের ওজন উচ্চতা সাপেক্ষে অত্যন্ত কম, প্রতি তিনজনের একজন বয়স অনুপাতে খর্বকায়। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত ২০১৪ এ ৭৬ টি দেশের মধ্যে ৫৫, ২০১৬ তে ১১৮ টি দেশের মধ্যে ৯৭ এবং ২০১৭ এ ১১৯ টি দেশের মধ্যে ১০০। ব্রিকস্‌ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান একদম নীচে এবং ভারতের জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থান হয়েছে নীচের সারণীতে।

■ টেলি বাজার এখন :

এয়ারটেল (২৮.১২%), ভোডাফোন (২১.০৫%), আইডিয়া (১৯.৩৯%), রিলায়েন্স-জিও (১২.৮৫%), বি.এস.এন.এল. (১০.৪৫%), এয়ারসেল (৮.৯৯%), রিলায়েন্স কমিউনিকেশন আর.কম(৮.১২%), টেলিনর (৪.৭০%), টাটা টেলি (৪.২০%)। সিস্টেমা (০.৩৯%), এম.টি.এন.এল (০.৩৫%)।

সরকারি মদতে জিওর আগ্রাসী অনুপ্রবেশ ও তীব্র মাশুলের লড়াইয়ের কারণে টেলিপরিষেবার বৃদ্ধি হলেও মান কমেছে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে টেলিনর ও সিস্টেমা বন্ধ হতে চলেছে। মিশতে চলেছে ভোডাফোন ও আইডিয়া, এয়ারটেলের সাথে মিশে যাচ্ছে টাটা টেলি এবং টেলিনর। ১২০ কোটি টাকায় রফা করে টাটা টেলি ডোকোমোর থেকে বেরিয়ে এল। রিলায়েন্স কমিউনিকেশন কিনে নিল এম টি এস-কে। অবশেষে মুকেশ আম্বানির জিও ২৫ হাজার কোটি টাকায় কিনে নিল অনিল আব্দানীর রিলায়েন্স কমিউনিকেশনকে।

■ সম্পত্তি বৃদ্ধিতে তৃণমূল এগিয়ে, মোট সম্পত্তিতে বিজেপি :
গত এক দশকে দেশের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধিতে সবচাইতে এগিয়ে বাংলাকেন্দ্রিক দল তৃণমূল কংগ্রেস। আয়কর দফতর, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি দপ্তরে দাখিল করা হিসাবের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এডি আর)' এবং 'ইলেকশন ওয়াচ' দুটি সংস্থা। ২০০৪-'০৫ থেকে ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে বিজেপির ঘোষিত সম্পত্তি বেড়েছে ৬১৭.১৫%, সিপিএমের ৩৮৩.৪৩% একং তৃণমূলের ১৭, ৮৯৬% । ২০১৫-'১৬, সালে বিজেপির ঘোষিত সম্পত্তি ৮৯৩.৮৮ কোটি টাকা, কংগ্রেসে ৭৫৮.৭৯ কোটি টাকা, সিপিএমের ৪৩৭.৭৮ কোটি টাকা এবং তৃণমূলের ৪৪.৯৯ কোটি টাকা।

■ কৃষিতে বৃদ্ধি :
২০১৬-'১৭ তেও ছিল ৪%, ২০১৭-'১৮তে পৌঁছল ২.১%এ।

■ ভারত মালা ও অন্যান্য সড়ক প্রকল্প :
পাঁচ বছরে ৮৩,৬৭৭ কি.মি. সড়ক নিমার্ণের পরিকল্পনা। সম্ভাব্য ব্যয় ৫.৯২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ভারতমালা প্রকল্পে ৩৪,৮০০ কি মি জাতীয় সড়ক। সম্ভাব্য ব্যয় ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঋণ ২.০৯ ও বেসরকারি লগ্নি ১.০৫ লক্ষ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত ভারতমালায় থাকছে ৯,০০০ কি.মি. অর্থনৈতিক করিডর; ৬০০০ কিমি আন্তঃ করিডর ও ফিডারপথ; তৈরী সড়কের যানজট কাটাতে প্রশস্ত করা, বাইপাস নির্মাণ ইত্যাদি; ২০০০ কি.মি. সীমান্ত সড়ক; ৮০০ কিমি এক্সপ্রেসওয়ে প্রভৃতি।

■ নোট বাতিলের বর্ষপূর্তি :
৯৮.৯৫% নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘরে ফিরে এসেছে, গোনা এখনও চলছে। অর্থাৎ সমস্ত কালো টাকাই মোদীর বিমুদ্রাকরণ কর্মসূচীতে সাদা হয়ে গেল। কিন্তু ঘোষণা ছিল সব কালো টাকা ধরা পড়বে। পড়েছে বাতিল নোটের ১ শতাংশের কম। নতুন ২০০০ টাকা বেরোনোর দুমাসের মধ্যে পাকিস্তানে ছাপা ভারতের জাল নোট বাংলাদেশের নবাব-চাপাইগঞ্জ থেকে মালদার বৈষ্ণবনগরে ঢুকে পড়ে। সেখানে ১৭টি সিকিউরিটি ফিচারের ১১টিই হুবহু নকল করা ছিল। এই একবছরে আরও তিনটি সিকিউরিটি ফিচার জাল হয়ে গেছে। নোট বাতিলের আগের বছরের তুলনায় কাশ্মীরে সন্ত্রাস বেড়েছে ৩৮%, আম জনতার মৃত্যু বেড়েছে ২৫ গুন ও সেনাজওয়ানদের মৃত্যু বেড়েছে ২%। আর মাওবাদী এলাকায় জওয়ানের মৃত্যু বেড়েছে ৮০%।

■ মুকুল উবাচ :
'বিশ্ব বাংলা', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি ব্রান্ডিং এজেন্সি, যারা অনুর্ধ ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল সংগঠিত করেছিল। এর মালিক মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দোপাধ্যায় এবং এর মাধ্যমেই তৃণমূল দলের যাবতীয় বিজ্ঞাপন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। তৃণমূল মুখপত্র 'জাগো বাংলা'-রও মালিক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। কালিমপঙের ডেলো বাংলোয় বৈঠকের পর সারদা চিটফান্ড কর্ণধার সুদীপ্ত সেন বিভিন্ন প্রকল্পে ৮৪০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। সেগুলো আত্মসাৎ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার পুজোতে সাতটি চিটফান্ড সংস্থাকে কর্পোরেট পার্টনার দেখিয়ে অর্থ নেওয়া হয়েছে। 'মা-মাটি-মানুষের' ট্রেডমার্কও অভিষেকের নামে নথিভুক্ত। অভিষেক আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছেন এসবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি নিয়ে হয়েছে। কয়লা পাচার, অবৈধ বালি ও পাথর খাদান আর গরু পাচারে প্রচুর টাকা লেনদেন হচ্ছে। বিরোধীদের ফোনে আঁড়িপাতা হচ্ছে। 'বিশ্ববাংলা' নিয়ে প:বঙ্গ সরকার এক সময় অভিযোগ দায়ের করে। আবার অভিষেক আদালতে জানান এসব কিছুই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতিতে।

■ কালো টাকাই কি ভারতে লগ্নী হয়ে ফিরে আসছে?
বিমুদ্রাকরণের ফলে কালো টাকা সাদা হয়েছে। আবার ফরফাঁকির স্বর্গরাজ্যগুলির মাধ্যমে ঐ কালো টাকাই ভারতে লগ্নী হিসাবে আসছে। ২০১৫'-১৭ আর্থিক বর্ষে মরিশাস ও সিঙ্গাপুর থেকে যথাক্রমে ১.০৫ কোটি ও ৫৮ হাজার কোটি টাকা লগ্নী হয়েছে। এই বিষয়ে কালো টাকার অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ অরুণ কুমারের বক্তব্য যদি কালো টাকাকে এই সব কর ফাঁকির স্বর্গরাজ্য ঘুরে দেশে আসতে দেওয়া হয়, তার অর্থ হল আরও কালো টাকা তৈরীতে সাহায্য করা। হাওয়ালা বা আমদানি খরচের বিল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখিয়ে বিদেশে কালো টাকা পাচার হচ্ছে। সেই অর্থ ফিরে আসার রাস্তা সহজ করে দিলে আরও কালো টাকা তৈরী হবে। এটা সৎ করদাতাদের প্রতি অবিচার।

■ সিমেন্সে শ্রমিক অসন্তোষ :
জার্মান বহু-জাতিক সংস্থা সিমেন্স পুনর্গঠনের কারণে বহু কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে বিশ্ব জুড়ে কাজ হারালেন সাত হাজার শ্রমিক। তারই প্রতিবাদে পথে নামলেন শ্রমিকেরা।

■ মুডিজের মুড বদল :
চারিদিকে নেতিবাচক সমালোচনার মাঝে, মার্কিন অর্থনৈতিক মুডিজ রেটিং বাড়ানোয় মোদি সরকার পুনরায় কৃতিত্ব দাবী করছিল। কিন্তু অপর আন্তর্জাতিক মূল্যায়ণ সংস্থা 'এস.অ্যান্ড পি.' ভারতীয় অর্থনীতি ও তার রেটিং নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীই বজায় রাখল। এমনকি বৃদ্ধির চাকায় গতি কমার জন্য কার্যত আঙুল তুলল নোটবন্দি ও তড়িঘড়ি জি.এস.টি.চালুর দিকে।

■ মাহীন্দ্রার রিভার্স সুইপ :
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট এক সময় গাড়ি শিল্পের রাজধানী হিসাবে পরিচিত ছিল। হেনরি ফোর্ড এখানে গাড়ি শিল্পের প্রথম 'অ্যাসেম্বলি

লাইন' পাতেন। ফোর্ডের পর ১৯০৮ এ এখানে প্রতিষ্ঠিত 'জেনারেল মোটরস্ (জিএস)' পরবর্তী তিন দশক ছিল বিশ্বের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা। ১৯২৫ এ এখানে শুরু হল 'ক্রাইস্টলার'-গাড়ির উৎপাদন। এই ডেট্রয়ট-মিশিগানে কাজের খোঁজে আসতেন হাজার হাজার মানুষ। এখানকার কারখানাগুলিতে তৈরী বিমান-ট্যাঙ্ক-গোলা-অস্ত্র নিয়ে আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লড়েছিল। পরবর্তীকালে বিশেষত' ৮০-র দশক থেকে বিশেষত জাপানে তৈরী সস্তা ছোটগাড়ির প্রতিযোগিতায় ডেট্রয়েট তার জৌলুস হারায়। তারপর ২০০৮-র ভয়াল মন্দা তাকে পথে বসিয়ে দেয়। সেই ডেট্রয়েটে গত ২৫ বছরের মধ্যে প্রথম গাড়ির নতুন কারখানা খুলতে চলেছে ভারতের মাহীন্দ্রা অ্যান্ড মাহীন্দ্রা গোষ্ঠী। অল মিশন এস ইউ ভি। বিনিয়োগ ২৩ কোটি ডলার। প্রাথমিক কর্মসংস্থান ২৫০ জন। এর আগে ভারতের টাটা মোটরস্ পিউমা ও জাওয়ার ব্র্যান্ড অধিগ্রহণ করে।

■ ভারতীয় অর্থনীতির স্তম্ভগুলি এই সময়ে :

	অর্থনীতির পরিমাপ (ডলার)	প্রদেয় জিডিপি (%)	বার্ষিক কর্মসংস্থান কোটি
● পরিকাঠামো নির্মাণ	—	২৪%	৩.৬০
● কৃষি	৩৫,৬৯৩ কোটি	১৮%	১০.৪০
● ম্যানুফ্যাকটারিং	৩১,১৫৫ কোটি	১৭%	৩.০০
● ইমারত নির্মাণ	> ১০,৫০০ কোটি	৯%	০.১৫
● খুচরো বিক্রি	৬০,০০০ কোটি	১০%	৪.০০
● তথ্য প্রযুক্তি	১৫,৪০০ কোটি	০৭.৭%	০.৩৭
● ব্যাঙ্কিং	৯৮,০০,০০০ কোটি মোট জমা টাকা	০৭.৭%	০.১৫

■ রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক তুলনা :

- জনপ্রতি বার্ষিক আয় সর্বাধিক (লক্ষ টাকায়) (১) দিল্লী ২.২৭, (২) গোয়া ২.২৩, (৩) সিকিম ১.৮৭, (৪) পন্ডিচেরী১.৪২, (৫) হরিয়ানা ১.৩৪
- সর্বাধিক অর্থনীতি (লক্ষ কোটি টাকা) : (১) মহারাষ্ট্র ১৬.৬, (২) তামিলনাড়ু ৯.৪৮ (৩) গুজরাট ৯.২, (৪) উত্তরপ্রদেশ ৯.২, (৫) কর্নাটক ৮.১৪। এই পাঁচটি রাজ্য দেশের জিডিপির ৪৫% বহন করে
- বি পি এলের নিরিখে স্বচ্ছল রাজ্য: (১) গোয়া ৫.১%, (২) কেরল ৭.১%, (৩) হিমাচল প্রদেশ ৮.১%, (৪) সিকিম ৮.২%,(৫) পাঞ্জাব ৮.৩%, (৯) অন্ধ্র ৯.২%, (১০) পুদিচেরী ৯.৭%, (১১) দিল্লী ১০%, (১২) জম্মু ও কাশ্মীর ১০.৪%, (১৩) হরিয়ানা ১১.২%,
- বিপি এলের নিরিখে দরিদ্র রাজ্য : (১) ঝাড়খন্ড ৩৭%, (২) মনিপুর ৩৬.৯%, (৩) অসম ৩২%, (৪) অরুনাচল প্রদেশ ৩৪.৭%, (৫) বিহার ৩৩.৭%, (৬) ওড়িশা ৩২.৫%, (৭) অসম ৩২%, (৮) মধ্যপ্রদেশ ৩১.৭%, (৯) উত্তর প্রদেশ ২৯.৪%, (১০) কর্ণাটক ২০.৯%

■ ভারতের নারী পাচারের অর্থনীতি:

ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য যত বাড়ছে, যত বাড়ছে নারীকে ভোগ্যপন্য হিসাবে দেখার প্রবণতা— তত বাড়ছে নারীর উপর অত্যাচার, অপরাধ, ধর্ষণ, খুন; বাড়ছে দরিদ্র অবহেলিত পরিবারগুলি থেকে বালিকা-কিশোরী-যুবতী পাচার, যৌনদাসী বা খামার বা হোটেলে যৌনকর্মী এবং বিভিন্ন পরিবারে বা গৃহে যৌনকর্মী হিসাবে বিক্রি। এমনকি মিথ্যা বিয়ে সাজিয়ে বিদেশে বিশেষত আরবমুলুকে শেখদের হারেম গুলিতে পাচার। একসময় হতদরিদ্র নেপাল, তাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসের দেহবিক্রির পর্যটন ও বাণিজ্য নিয়ে যে দুর্নাম ছিল আজ 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র ভারতের একই অবস্থা। গ্রাম থেকে শহর, চা বাগান থেকে হাই রাইজ এই অশুভ চক্রে যুক্ত হয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ দালাল জীবিকা নির্বাহ করছে, পুলিশ-নেতা-গুন্ডাদের সম্পত্তি বেড়েই চলেছে। পান্নালালদের মত বড় বড় দালালরা ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বাংলাদেশ, নেপালের হতদরিদ্র পরিবারগুলি থেকে নাবালিকদের পাচার করে কোটি কোটিপতি হয়ে উঠেছেন।

'গ্লোবাল মার্চ এগেনস্ট চাইল্ড লেবারে'র সমীক্ষায় বলছে যে নারী দেহ শোষণের বাণিজ্য করে (Commercial Sexual Exploitation Economy) ভারতে বার্ষিক দুই লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। এক একটি পতিতালয়ে গড়ে ৫০-১০০ যৌনকর্মী থাকে। তাদের প্রতিদিন গড়ে ৫-১০ জন গ্রাহকের লালসা মেটাতে হয়। এক একজন যৌনকর্মীর মাধ্যমে বার্ষিক গড় আয় তিন থেকে ১৪ লাখ টাকা। এক একটি পতিতালয়ের বার্ষিক গড় আয় দেড় থেকে চোদ্দ কোটি টাকা। 'ইউ এন ডি পি'-র ২০০৩ সালে করা সমীক্ষায় দেখা গেছিল পতিতাপল্লীর ২০% যৌনকর্মী নাবালিকা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'গুড়িয়া'র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে দেশে যৌন কর্মীর আনুমানিক সংখ্যা ৩০ লক্ষ, এর মধ্যে ১২ লক্ষ (৪০%) নাবালিকা এবং ৭৫%-র বেশী পাচার হয়ে আসা। হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ৮৩% গরীব, প্রান্তিক, দলিত, আদিবাসী, জনজাতি ও মুসলমান পরিবারের।

নারী ও নাবালিকা পাচারে শীর্ষে রয়েছে 'কন্যাশ্রী'র পশ্চিমবঙ্গ। সব জেলা থেকে হলেও শীর্ষে রয়েছে পশ্চাদপর এবং সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী অধ্যুষিত, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিন ২৪ পরগণা, বীরভূম, উ: ও দ: দিনাজপুর জেলা এবং আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের বন্ধ চা বাগানের নিরন্ন আদিবাসী পরিবারগুলি। পাচার হওয়া মেয়েদের পাঠানো হয় কলকাতা, শিলিগুড়ি, দিল্লী, ফরিদাবাদ, গুরুগ্রাম, মুম্বাই, পুনে, চন্ডীগড়, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, কোটা প্রভৃতি শহরে। দেখা গেছে এই মেয়েদের ৫০%-র বাবা মৃত বা রোজগার হারিয়েছে এবং ৩০%-র মা নেই। এ এক একমুখী যাত্রা, যেখানে ফেরার রাস্তা নেই। কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক কষ্টে উদ্ধার করলেও তাদের নিজেদের পরিবারই গ্রহণ করেনা। সরকারি-বেসরকারি হোমগুলির নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রা কহতব্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে রক্ষকই ভক্ষক। ফলে মেয়েগুলিকে ফিরে যেতে হয় বারাঙ্গনার জীবিকায়। অল্পবয়স থেকে ধারাবাহিক অত্যাচারে অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপরের জীবন মৃত্যুর চাইতেও খারাপ। অনেকে নানারকম যৌন ও সংক্রমক রোগ, যক্ষ্মা-এইডস্-এ ভোগেন। অনেকেই নেশাগ্রস্ত ও মানসিকভাবে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন।

■ **শৌচালয়ের অর্থনীতি :**

ভারতের ৭৩.২২ কোটি মানুষের শৌচালয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ তারা মাঠে, ঘাটে, রেললাইনের পাশে, ঝোপে ঝাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে। এর মধ্যে মহিলা ও বালিকার সংখ্যা ৩৬ কোটি। প্রতি বছর ৬১ হাজার শিশু মলবাহিত (ফিকো ওরাল রুট) আন্ত্রিক রোগে মারা যায়। কেন্দ্র সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযানে'র রিপোর্ট বলছে ১০৭ বিলিয়ান ডলার খরচ করে ২৭.৬ লক্ষ গ্রামে ৭.২ কোটি পরিবারের জন্য শৌচালয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টে'র সমীক্ষা বলছে ভারতে ব্যবহারযোগ্য শৌচালয়ের সংখ্যা ৭৯ লক্ষ। 'ওয়াটার এইড' জানাচ্ছে চীন ও ব্রাজিল অনেক কম খরচ করে, ৩৫.৯ ও ১০.৬ বিলিয়ন ডলার খরচ করে গরীবদের জন্য শৌচালয় বানিয়েছে।

■ **বহুরূপে একই প্রকল্প :**

কেন্দ্রের নাম	রাজ্যের নাম
• **জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন**	**খাদ্যসাথী**
গ্রামের ৭৫% ও শহরের ৫০% গরীবকে বিনামূল্যে চাল-গম	গরীবদের ২ টাকায় চাল
কেন্দ্রিয় ভতুর্কি ২৯.৬৭ টাকা প্রতি কেজিতে	রাজ্যের ভতুর্কি ১.৩৩ টাকা প্রতি কেজি
• **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা**	**বাংলার বাড়ি**
• **স্বচ্ছ ভারত অভিযান**	**নির্মল বাংলা মিশন**

■ **নোট ছাপানোর খরচ :**

৮ ডিসেম্বর' ১৭ পর্য্যন্ত কেন্দ্র সরকারের নতুন নোট ছাপাতে খরচ হয়েছে ৬,৮০০ কোটি টাকা

নোট	পরিমাণ (লক্ষ)	ছাপার খরচ (কোটি টাকায়)
২০০		৫২২.৮৩
৫০০	১,৫৯৫.৭০	৪,৯৫৮.৮৪
২০০০	৩৬৫.৪০	১,২৯৩.৬০

■ **ইউপি এ জমানার টুজি সেকট্রাম কেলেঙ্কারী প্রমানে মোদি সরকার ব্যর্থ :**

সরকারি কোষাগারের ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির অভিযোগ। সাত বছর ধরে শুনানি। ১৫৫ জন সাক্ষী। ৮০ হাজার পাতার নথি। কাঠগড়ায় মন্ত্রী-আমলা-কর্পোরেট রথী মহারথীরা। প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী ও ডি এমকে নেতা এ.রাজা এবং তার বান্ধবী ও ডিএম কে নেত্রী করুণানিধি কন্যা এম. কানিমাঝির জেল। বিচারক ও.পি.সাইনির ১৫৫২ পাতার রায়। আর সেই পরীক্ষায় ডাহা ফেল কেন্দ্র সরকারের পরিচালনাধীন সিবিআই ও ইডি। টুজি স্পেক্টট্রাম কেলেঙ্কারীর ৩৫ জন অভিযুক্তের একজনকেও আদালত দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না তারা।

■ **ঋণ কৃত্বা ঘৃতং পিবেত :**

প্রত্যাশামত আয় হচ্ছে না। ওদিকে খরচ ছাঁটা ও অপচয় বন্ধেরও উদ্যোগ নেই। তাই ২০১৮ বছরের শুরুতেই মোদি-জেটলি সরকারকে বাজার থেকে বাড়তি ৫০ হাজার কোটি টাকা ধার নিতে হয়েছে। ২০১৭'-১৮ আর্থিক বর্ষে ঘোষিত রাজকোষ ঘাটতি সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা (১৬%)। রাজস্ব ঘাটতি নির্ধারিত ৫২% বেশী, প্রত্যক্ষ কর আদায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি কম।

■ **আবার মোদি সরকারের কোপের মুখে স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার :**

পিপিএফ, এন এস সি, কেবিপি, এম আই এস সহ সমস্ত স্বল্প সঞ্চয়ের সুদের হার আরেকদফা কমিয়ে দেওয়া হল।

■ **অভিভাসনের চালচিত্র :**

২৬ কোটি অভিভাসী মানুষের (বিশ্ব জনসংখ্যার ৩.৩% এবং পঞ্চম সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ ব্রাজিলের চাইতে বেশী) মধ্যে ১৭ কোটি (৬৫%) বাস করেন 'বেশী আয়ের দেশগুলিতে'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ কোটি এবং ১.২ কোটি করে সৌদি, জার্মানী ও রাশিয়ায়। ৩.১ কোটি ভারতীয় বিদেশে থাকেন। তার মধ্যে এক কোটি মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে এবং ৪২লক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ভারতে রয়েছে ৫২ লক্ষ নথিভুক্ত বিদেশী অভিভাসী। তাদের মধ্যে ৩১ লক্ষ বাংলাদেশী।

■ **এয়ার ইন্ডিয়াতে বিদেশী পুঁজি :**

মোদি সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল। ১০ জানুয়ারী'১৮ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে স্থির হয় সংস্থার ৪৯% পর্যন্ত বিদেশী লগ্নীর ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

■ **কয়লার দাম বৃদ্ধি :**

মে মাসে কোল ইন্ডিয়া ৬.৩% দাম বাড়ায়। ডিসেম্বরে ইভ্যুকুয়েশন চার্জ ধরে টন প্রতি ৫০ টাকা। তারপর ৯ জানুয়ারী থেকে আরও দাম বাড়লে ৮.৫%। বিদ্যুৎ মাসুল বাড়ল ৩০ থেকে ৫০ পয়সা।

■ **অস্ত্র কেনায় এক নম্বর :**

বিদেশ থেকে ভারি অস্ত্র কেনার নিরিখে ভারত এখন বিশ্বের এক নম্বর দেশ। ইজরায়েল, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সাথে গত চার বছরে ১৮৭টি অস্ত্রশস্ত্র কেনার চুক্তি করে ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছে ভারত।

■ **পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক হাল :**

বছরভর মেলা, উৎসবের পশ্চিমবঙ্গে ২০১৭-'১৮এ রাজস্ব ঘাটতি : ২০.৩৪ কোটি (উদ্বৃত্ত), আর্থিক ঘাটতি ২০,৩৫৮ কোটি এবং বাজারি ঋণ ২০,৩৫৮ কোটি টাকা।

■ **মশলা খ্যাতি :**

ভারতের মশলার খ্যাতি বিশ্ব দরবারে সুবিদিত। সম্প্রতি ভারতীয় মশলার রপ্তানী পরিমাণগতভাবে ২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-র এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ৫.৫৭ লক্ষ টন মশলা রপ্তানী হয়েছে এবং আয় হয়েছে ৮,৮৫০.৫৩ কোটি টাকা। সবচাইতে বেশী রপ্তানী হয়েছে লঙ্কা। ২.৩৫ লক্ষ টন। তারপর জিরা।

■ **ছোট চা-বাগানের কথা :**

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গে ১.৪৫ লক্ষ একর জমিতে ৪০ হাজার ছোট চা বাগান যাতে যুক্ত ৫০ হাজার ছোট চা চাষী। ২০১৬-'১৭এ মোট উৎপাদন ১৫.৪০ কোটি কেজি। দার্জিলিঙ বাদে উত্তরবঙ্গের ৫৩% চা

উৎপন্ন হয় এইসব বাগানে। বেশীরভাগ জমির বৈধতা নেই, নেই সরকারি ছাড়পত্র, ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ। উৎপাদন প্রণালী ও গুণগত মানে নজরদাড়ি নেই। সুষ্ট বিপনন ও উপযুক্ত দামের অভাব।

■ বৈষম্যের রাজধানী বর্তমান ভারত :

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' ১৮-র প্রাক্কালে ফোরামের সমীক্ষা জানালো যে ৭৪টি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬২। ভারতের অনেক আগে প্রতিবেশী নেপাল (২২), চীন (২৬), বাংলাদেশ (৩৪), শ্রীলঙ্কা (৪০) ও পাকিস্তান (৪৭)। এই চূড়ান্ত লজ্জার মধ্যে 'অকসফ্যাম'র রিপোর্ট আতঙ্কিত করে। ভারতে ১% ধনকুবেরের হাতে ৭৩% সম্পদ। সরকারি বদান্যতায় এই ধনকুবেরদের সম্পত্তি '১৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা যা ২০১৭-'১৮-র কেন্দ্রীয় বাজেটের সমমূল্য।

■ অপার ক্ষুধা, অথচ অপচয় :

গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে বিশ্বের ক্ষুধার্ত ব্রিকস্ দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে পিছনে। অপুষ্টির কারণে ২১% শিশু খর্বাকৃতি, যা আগের বছরগুলির তুলনায় বেড়ে চলেছে। ভারতে বছরে ২৭২ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। যেখানে প্রতিদিন ১৯.৫ কোটি মানুষ ক্ষুধার কষ্টে ভোগে, সেখানে ৯২ হাজার কোটি টাকার খাদ্যবস্তু প্রতিবছর নষ্ট হয়। প্রতি বছর ফুড কর্পোরেশনের গুদামে ৬১,২৮৪ টন খাদ্যশস্য নষ্ট হয়।

■ জিডিপির তুলনায় লগ্নী হ্রাস :

বছর	জিডিপি-র তুলনায় লগ্নী হ্রাস
২০১১-'১২	৩৪.৩%
২০১৫-'১৭	২৭%
২০১৭-'১৮	২৬%

■ অর্থ সমীক্ষায় নারীর ক্ষমতা হ্রাস :

২০১৮-র বাজেট পূর্ব সরকারি সমীক্ষাতে বলা হয়েছে ভ্রূণহত্যা আকছার; যে মেয়েরা বেঁচে তাদের সাড়ে ছ কোটি মেয়ে চরম দারিদ্র, অবহেলা, অপুষ্টি, অত্যাচারের শিকার। ২০০৫-'০৬ তে যেখানে ৩৬% মহিলা চাকরি করতেন, ২০১৬ এ তা নেমে হয়েছে ২৪%। জনসংখ্যার ৪৯% হয়েও লোকসভায় নারী সাংসদ মাত্র ১১.৮%-ও বিধানসভায় নারী বিধায়ক ০.৯%।

■ নীরব মোদির নীরব ডাকাতি :

'পাঞ্জাব অ্যান্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের' কিছু আধিকারিককে হাত করে এবং সরকারে প্রভাব খাটিয়ে তদন্তকারীসংস্থাগুলিকে নিষ্ক্রিয় রেখে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা লুঠ। নোট বাতিলের সময় ব্যবসায়ীদের কালো টাকা সাদা করা এবং সোনার বাট কিনে তাদের সাহায্য করে মুনাফা। সরকারি সংস্থায় প্রভাব খাটিয়ে বিদেশ থেকে দামী রত্ন সুরাতের এস.ই.জেডে রপ্তানী করার নামে বিনা শুল্কয় এনে নগদে বেশী লাভে দেশের বাজারে বেচে দিতেন। আর কম দামের রত্ন দিয়ে তৈরী গয়না বানিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফা করতেন এবং সেগুলির বেশী দাম দেখিয়ে শুল্ক দপ্তরকে ধোঁকা দিতেন। এসব কাজে তার সঙ্গী ছিল বেলজিয়ামের নাগরিক তার ভাই নীশল এবং মামা মেহুল চোকসি। তারা পরিকল্পনা করে নিজেদের সম্পত্তি ও আত্মস্যাৎ করা অর্থ বিদেশে সড়িয়ে দিয়ে বিদেশে পালিয়ে গেলেন। এরকমভাবেই রোটোম্যাক কলম সংস্থার মালিক বিক্রম কোঠারি ব্যাঙ্কের ৩৫৯৫ কোটি টাকা গায়েব করে পালিয়ে গেলেন। দাভোস সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদী সঙ্গী শিল্পপতিদের মধ্যে দেখা গেল নীরব মোদিকে।

যতদিন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই তছরুপের ঘটনা আরও ব্যাপক এবং এর জাল আরও গভীরে। নীরবের ব্যবসাটাও জালিয়াতি। পরীক্ষাগারে তৈরী ঝুটো হীরে দিয়ে এতদিন ক্রেতাদের ঠকিয়ে গেছেন। পি এন বি-র পরে দেখা গেল রাষ্ট্রায়ত্ব 'ওরিয়েন্টাল ব্যঙ্ক অফ কমার্সে' বড় ধরনের তছরূপ।

■ বাজেট (২০১৮-১৯) বরাদ্দ এক নজরে (কোটি টাকায়) :

- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সেবক যোজনা : ১৯,০০০
- এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ : ৫৫,০০০
- রাস্তা ও হাইওয়ে খাতে : ৯৭, ০০০
- পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলি পূণর্গঠনে : ২৫, ০০০
- নাবারড : ৪০,০০০
- জলসেচ খাতে : ৪০,০০০
- পরিকাঠামো গঠন : ৪০,০০,০০০
- প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা : ২,৪৪,০০০
- কৃষিতে ঋণ মকুব ইত্যাদি খাতে : ১১,০০,০০০
- প্রতিরক্ষায় ২,৮০,০০০

■ বাজেটে ঘাটতি :

৪.১% জিডিপি ফিশকাল ডেফিশিট, ২.৯% রেভিনিউ ডেফিশিট, ১.৩% কারেন্ট একাউন্ড ডেফিসিট, মুদ্রাস্ফীতি ৫.১%

■ ভারতের 'মাইক্রো' স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টার প্রাইজেস (এম.এস.এম.ই.)' চালচিত্র :

মোট সংখ্যা : ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ। কৃষিভিত্তিক ১৩.১%, অ-কৃষিভিত্তিক ৪৫.৩%, পরিষেবা সেক্টর ৩৩.৭%, উৎপাদন শিল্প ১০.৩%, নির্মাণ ও অন্যান্য ১.৩% জিডিপির নিরিখে ২৪.৬% পরিষেবাকেন্দ্রিক, ৫.১% উৎপাদন কেন্দ্রিক।

■ অ্যাডভানটেজ অসম গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট সামিটে'র নেপথ্যে :

গুয়াহাটিতে সর্বানন্দ সোনোয়াল-চন্দ্র মোহন পাটোয়ারীরা যে মোদীকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করলেন এবং যেখানে নয়টি এশিয় দেশের প্রতিনিধি সহ রিলায়েন্সের মুকেশ আম্বানি, টাটার সন্সের এন. চন্দ্রশেখরণ, সান ফারমার দিলীপ সিংভি, এয়ার এশিয়ার অমর অব্রল, স্পাইস জেটের অজয় সিংহ, পতঞ্জলির বালকৃষ্ণ প্রমুখদের উড়িয়ে এনে ২০০ মউর কথা কথা ঘোষণা করলেন কার্যত প্রতিটি জেলায় জিও সিম কার্ড বিক্রির দোকান খোলা, ১৫ টি সরকারি হাসপাতালে প্রকল্পে অংশগ্রহণ ছাড়া বিশেষ কিছু এগোলো না।

■ **রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শিল্পপতি ও ক্রনি পুঁজিপতিদের ঋণ সেবা (নন-পারফরমিং অ্যাসট বা এন.পি.এ.), সেপ্টেম্বর ২০১৭**

ব্যাঙ্কের নাম	সামগ্রিক এন.পি.এ.	এন.পি.এ.র অনুপাত(%)
(১) এস.বি.আই	১,৮৬,১১৫	০৯.৮৩
(২) পি.এন.বি.	৫৭,৬৩০	১৩.৩১
(৩) আই.ডি.বি.আই	৫১,৩৫৮	২৪.৯৮
(৪) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৪৯,৩০৭	১২.৫২
(৫) ব্যাঙ্ক অফ বরোদা	৪৫,৩০৭	১১.১৬
(৬) কানাড়া ব্যাঙ্ক	৩৯,১৫৪	১০.৫১
(৭) ইউ.বি.আই	৩৮,২৮৬	১২.৩৫
(৮) ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	৩৪,৭০৯	১২.৮৪
(৯) সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া	৩১,৬৪১	১৭.২৭

■ **কৃষি সঙ্কটের খন্ডচিত্র :**

মোদি সরকারের চার বছরের রাজত্বে কৃষির বৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে নেতিবাচক, ১% -র কম, ৪.৯% ও ২.১%। প্রথম দুবছর ছিল খরার ধাক্কা, পরের দুবছর ফসলের দাম পড়ে যাওয়া। ২০২২-র মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার মোদির আরেক চালবাজির মধ্যে দেশের বেশীর ভাগ কৃষি জমিই সেচের বাইরে বৃষ্টিনির্ভর। মহারাষ্ট্রের মাত্র ১৯% জমি সেচভুক্ত, তাও পর্যাপ্ত নয়।

■ **ব্যাঙ্কের বাকি, বাকিতে ফাঁকি :**

২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি মোট অনুৎপাদক সম্পদের অঙ্ক প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে পাওনা ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকা।

যে ধার আদায়ের আর প্রায় কোন সম্ভাবনা নেই, ব্যাঙ্কের হিসাবের খাতা থেকে তা মুছে ফেলাকেই বলে 'লোন রাইট অফ'।

২০১২-'১৩ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে 'লোন রাইট অফ' ছিল ২৭,৩৬১ কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭ তে ৮১,৬৮৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ তে (সেপ্টেম্বর' ১৭ অবধি) ২৮,৭৮১ কোটি টাকা।

— সংকলন : বুনো রামনাথ

মহারাষ্ট্রে কৃষকদের লাল লং মার্চ

প্রবল গরম আর পথ কষ্টকে ভুলে ধুলি ধুসরিত কদম বাড়িয়ে মারাঠাওয়াড়া বিদর্ভ, নাসিক অঞ্চলের মূলত ভূমিহীন আদিবাসী ক্ষেত মজুরদের বর্ণাঢ্য ও সুশৃঙ্খল লাল মিছিল মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ছয় দিন ধরে ১৮০ কিমি পথ চলে ১২ মার্চ মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে সমবেত হল এক বিপুল জনসভায়। হান্নান মোল্লা, অশোক ধাবলে, বিজু কৃষ্ণন, কিষাণ গুজর, অজিত নাবালেদের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া কৃষক সভা (এ.আই.কে.এস.) আয়োজিত এই কৃষকদের দৃপ্ত লংমার্চ পাঁচ হাজার কৃষকদের যোগদান শুরু হয়ে অচিরে পনের হাজার এবং শেষে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানীতে ৩৫ হাজারের বেশী কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের জমায়েতে সারা দেশের নজর কাড়ল আর তার সহমর্মী, সুশৃঙ্খল, নীরব ও অমায়িক আচরণে মন জয় করল মুম্বাইবাসীর। কৃষি সঙ্কটে জর্জরিত হতদরিদ্র কৃষকদের প্রতি-স্পর্ধা কাঁপিয়ে দিল মহারাষ্ট্রের ফদনিশের বিজেপি সরকারকে। কারণ সমস্ত বিরোধী শক্তিই দাঁড়িয়ে পড়েছে কৃষকদের সমর্থনে। বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচীকে নিবৃত্ত করে সরকার তড়িঘড়ি ১১ জন কৃষক প্রতিনিধিকে ডেকে নিয়ে তাদের দাবী শুনলেন এবং তাদের সমস্ত দাবী পূরণ করবেন আগামী ছ মাসে তার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনে ২০১৯-এ লোকসভা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচন।

প্রথম দাবী, সরকার ঘোষিত ৩৫ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুবকে নানা কায়দায় এড়িয়ে যাওয়া সঙ্কুচিত করাকে বন্ধ করা। দ্বিতীয়, ভূমিহীন অদিবাসীদের জঙ্গলের পাট্টা দান। তৃতীয়, বৃদ্ধ অশক্ত কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের পেনশন। চতুর্থ, ফসলের ন্যায্য দামের জন্য কৃষক সভার প্রতিনিধিদের রেখে তৈরী হবে কমিটি। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কয়েক হাজার কৃষক ১৩ মার্চ 'বি.কে.ইউ'-র পতাকা নিয়ে সমদাবীতে দিল্লীতে সমবেত হল। এর আগে নভেম্বর ' দিল্লীর বুকে হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা কৃষকদের যৌথ সংগঠনগুলির বিশাল মিছিল। ১৫ মার্চ লক্ষ্ণৌতে এ.আর.কে.এস. করল কৃষকদের প্রতিরোধ সমাবেশ। ২৩-২৮ মার্চ পাঞ্জাবে কৃষক আন্দোলনের পীঠস্থান মানসায় অনুষ্ঠিত হল সিপিআই এম লিবারেশনের দশম পার্টি কংগ্রেস। ভুবনেশ্বর অভিযান চালাল ওড়িশার কৃষক সংগঠনগুলি।

■ **জল লবণমুক্ত করার গাড়ি :**

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানয়াহু ভারত সফরে ভারতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এই গড়িটি উপহার দিয়েছেন। যে কোন ধরনের জল তা সে সমুদ্রের জল হোক বা প্রচন্ড ঘোলা ও ময়লা জল মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী পানের উপযোগী করে তুলতে পারে। সমস্ত ঋতুতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এটি কর্মক্ষম থাকে। এটি স্বয়ংক্রিয় এবং স্বনির্ভরশক্তি যুক্ত মাত্র ১২ ভোল্টে চলে। মরুভূমি, উপকূল, পাহাড়ে এই গাড়ি চড়তে পারে। সামনে ড্রাইভার ছাড়াও আরেকজন বসতে পারে। সমুদ্রের জল ২০ হাজার লিটার ও ময়লা জল ৮০ হাজার লিটার একবারে ধারণ করতে পারে। ওজন ১৫৪০ কি.গ্রা. এবং সর্বোচ্চ গতি ৯০ কি.মি. ঘন্টায়। দাম ৭১ লক্ষ টাকা।

অর্ধেক আকাশ

গৌরী লঙ্কেশ কেন গৌরী লঙ্কেশ

নলিনী কৃষ্ণমূর্তি

নীতিনিষ্ঠ বামপন্থী, স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী, কন্নড় পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক পি.লঙ্কেশের কন্যা। কোন বিজ্ঞাপন না নেওয়া যে পত্রিকা গ্রাহকের টাকায় চলে। ছোটবেলা থেকে স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী, ঋজু, লড়াকু, স্পষ্টবাদী মেয়ে। যে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ও লিঙ্গ বৈষম্য মানে না, আবার কোন রাজনীতি, ছাত্রআন্দোলন বা একটিভিজমেও যুক্ত নন। ইংরেজী এলিট স্কুলে পড়াশুনা, মাতৃভাষা কন্নড়টাও ভাল জানেন না। দিল্লী কেন্দ্রিক সানডে, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ইটিভি প্রভৃতি সংবাদ মাধ্যমে ইংরাজী ভাষার সাংবাদিকতার কাজ করে যাওয়া। বাড়ির সম্বন্ধের বিয়ে দু-দুবার বানচাল করে সহপাঠী চিদানন্দ রাজঘাটাকে বিয়ে ও পরে ডির্ভোস। বাবার মৃত্যুতে কোন প্রথাগত সংস্কার না মানা। বাবার মৃত্যুর পর 'লঙ্কেশ পত্রিকা'র হাল ধরা আর আশ্চর্যজনকভাবে পত্রিকাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রান্তের কথা প্রতিবাদের কথা মিলিয়ে এমন অগ্নিময়ভাবে তুলে ধরলেন যে বিভিন্ন স্বার্থের অশুভ আঁতাত, ক্ষমতালোভী রাজনীতিক ও বিভাজন-দাঙ্গা-ঘৃনা ছড়ানো ক্ষমতালোলুপ হিন্দুত্ববাদী ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফ্রন্টে তাঁর তীক্ষ্ন লেখনী হয়ে উঠল সাংঘাতিক সব ক্ষেপনাস্ত্র। ফলে বিক্ষোভ, মামলা, হুমকি, চরিত্রহনন, যতকিছু। তাতেও না দমে গৌরীর আরও জ্বলে ওঠা। প্রবল চাপে গৌরীকে তাঁর ভাই পত্রিকা থেকে সরিয়ে দিলে নিজে শুরু করলেন 'গৌরী লঙ্কেশ পত্রিকে'। যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে মোকাবিলা করাটা অসম্ভব হচ্ছিল বলে তাকে শেষ করে দেওয়া হল। এটুকু গল্প সকলেরই জানা। আসলে নারী, দলিত ও আদিবাসীদের উপর শোষন ও পীড়ন, সামাজিক অসাম্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সমস্ত প্রতিবাদ ও প্রতিবাদীদের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছিলেন গৌরী। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী মাওবাদীদের সাথে কথা চালিয়ে তিনি অহিংস গণ আন্দোলনের পথে নিয়ে আসছিলেন। মাধবাচার্যদের নাম ভাঙ্গিয়ে উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাশালী কন্নড়দের ধর্ম-সংস্কার-জাতপাতের অন্তরালে নিস্পেষণের ধারা সমেত এই প্রচলিত কাঠামোটিকেই প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তি বিন্যাস, তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণ, গভীর মননশীল স্যাটায়ার ও বিদ্রুপের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিল নব শাসকদের হিন্দুত্বের এজেন্তা দিয়ে কর্ণাটক সহ ভারত দখলের কর্মকান্ডের তত্ত্ব কথা। এখানেই গৌরীর স্বার্থকতা, গৌরী লঙ্কেশের বিশেষ পরিচয়। অনমনীয় শহীদের গাঁথামালায় বাসবান্না এবং কালবুর্গির সাথে মিলে গেলেন গৌরী, আমাদের গৌরী। সারা দেশজুড়ে শ্লোগান উঠেছে: '' আমরা সবাই গৌরী লঙ্কেশ।''

আমরা সবাই গৌরী

এত ভয়!

গৌরী লঙ্কেশ। মধ্য পঞ্চাশের ভাঙাচোরা চেহারার এক রুগ্ন মহিলা সাংবাদিক। এর আগেও তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে। হুমকি কিছু কম দেওয়া হয় নি। হবে নাই বা কেন! কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কঠোর সমালোচনা তাঁর প্রতিটি লেখায়। মোদী সরকারের তীব্র সমালোচক এই গৌরী লঙ্কেশ। তাঁর কলমের অমিত শক্তি, তাঁর তুখোড় যুক্তি বিন্যাস-এসবের সঙ্গে এঁটে ওঠা সত্যিই বড় মুশকিল। সেপ্টেম্বর' ১৭। রাত তখন আটটা কি সাড়ে আটটা। ব্যাঙ্গালুরুতে তাঁর নিজের পত্রিকা দপ্তর থেকে সদ্য বাড়ি ফিরেছেন গৌরী। না । ফিরেছে বললে ঠিক বলা হয় না। সবে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্লান্ত শরীরে। হঠাৎ কোথা থেকে ভুঁইফোড়ের মত তিনটি বাইকে এসে হাজির সাতজন লোক। সাতজন লোক মোট ১১টি গুলি চালালো লঙ্কেশকে লক্ষ্য করে। একেবারে সামনে থেকে। আহাম্মকের দল এই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকেও নিশানা ঠিক রাখতে পারে নি। আটটা গুলিই লক্ষভ্রষ্ট হয়। বাকি তিনটের একটা কপালে, অন্য দুটো বুকে। গৌরীর রক্তাক্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকে তাঁরই বাড়ির সামনে। কি আশ্চর্য্য, ওটা কি সত্যিই গৌরীর দেহ! নাকি অবিকল ভারতবর্ষের রক্তমাখা এক মানচিত্র! দাভোলকর, কালবুর্গি, পানসারেদের তালিকায় নবতম সংযোজন। শহীদ হলেন গৌরী।

তারপর থেকে গৌরীর কলম আমাদের সকলের হাতে। তারপর থেকে আমরা সবাই এক এক জন গৌরী লঙ্কেশ।

[সৌজন্য : বাণীব্রত পাল]

■ **স্বাস্থ্যখাতে কোপ :**

স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির অন্তত আড়াই শতাংশ ব্যয় বরাদ্দের দাবী বহুদিনের। আগামী তিন আর্থিক বছরে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে স্বাস্থ্যদপ্তর চেয়েছিল ১.৫৯ লক্ষ কোটি টাকা। রাজকোষ ঘাটতির কারণ দেখিয়ে অর্থমন্ত্রক বরাদ্দ করল ৮৫ হাজার কোটি টাকা। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এর বিপুল প্রভাব পড়বে।

আসমা জাহাঙ্গীরকে খোলা চিঠি

শুভাশিষ চট্টোপাধ্যায়

আসমা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়াটা নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা। প্রায় ১৫ বছর কেটে গেলেও প্রথম সাক্ষাতের সেই স্মৃতি আজও টাটকা। দিনটা ছিল ১২ই ডিসেম্বর ২০০৩। সেদিনই লাহোর থেকে 'নাইট কুইন' সুপার ফাস্ট ট্রেনে চেপে সকালে করাচি পৌঁছেছি 'পাকিস্তান ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি'র ষষ্ঠ যৌথ সম্মেলনে যোগ দিতে। সঙ্গে মাত্র ১৫ দিন আগে বিয়ে হওয়া স্ত্রী আর আড়াইশো জনের বিশাল ডেলিগেট টিম। সন্ধ্যেয় কালচারাল প্রোগ্রামে বিস্তর নেচে, রাতের এলাহি খানা শেষ করে করাচিতে আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেই মেহরানের লবিতে বসে তুমুল আড্ডা চলছে। রাত তখন ১১টা ১২টা হবে। কিন্তু দেখে কে বলবে? সবে যেন সন্ধ্যে। আমরা যারা একটু কম বয়সী চ্যাংড়া গোছের তারা হোটেলের সিঁড়িতে বসে-দাঁড়িয়েই আড্ডা মারছি। গান-বাজনা চলছে খালি গলায়। আর মাঝে মধ্যেই কারণে-অকারণে হিহি-হাহা করে হেসে এর-ওর গায়ে ঢলে পড়া। আমাদের দলটাই ভারী। আমি তো আছিই, আছেন আমার স্ত্রীও। আছে ই-টিভির অর্ক, পয়োষ্ণী, আনন্দবাজারের সীমন্তিনী। কিছু পাঞ্জাবী, গুজরাটি তরুণ, তরুণী। আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন কিছু পাক যুবক যুবতীও। যাকে বলে একেবারে উপমহাদেশীয় আড্ডা। 'দ্য ডনে'র কার্টুনিস্ট ফিকিও আমাদের শিবিরে। একটু দূরে চুলে পাক ধরা ভারিক্কি প্রবীণ, প্রবীণারা। হঠাৎই আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন বব কাট চুলের মধ্য বয়স্কা এক মহিলা। সাদা রঙের সালোয়ার, নকসীর কাজ করা গায়ে জওহর কোট জাতীয় কিছু। আমাকেই সরাসরি প্রশ্ন আপ কিধার সে? বললাম কলকাত্তাসে।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন হ্যালো আই অ্যাম আসমা। আসমা জাহাঙ্গীর। ভদ্রতা করে বললাম আই অ্যাম শুভ। শুভাশিস চ্যাটার্জী। সত্যি বলছি তার আগে ওনাকে চিনতাম না। নামও শুনিনি। ওভাবে গায়ে পড়ে আলাপ জমাতে আসায় একটু অবাকই হয়েছিলাম। কিছুটা বা বিরক্ত। কারণ আমাদের আড্ডায় একটু ছেদ পড়ল। পাক যুবক-যুবতীদের অনেকেই ওনাকে চেনেন দেখলাম। ফিকিও এগিয়ে গিয়ে কথা বলল।

দূরের একটু বয়স্কদের জটলা থেকে কেউ বোধ হয় ওনাকে দেখে চিনে থাকবেন। প্রথমে এগিয়ে এলেন সাংবাদিক নীলাঞ্জন দা। তারপর একে একে কৃষ্ণাদি, বোলানদিরা। আমাদের আলাদা আলাদা আড্ডার বৃত্ত ভেঙে একটা বড় আড্ডার বৃত্ত পরিণত করে দিলেন উনি।

অবাক হয়ে দেখলাম কলকাতার অনেককেই উনি সরাসরি চেনেন। ওনাকে অনেকেই চেনেন। কবিতা পাঞ্জাবী আর কৃষ্ণাদিকে তো জড়িয়েই ধরলেন। আমি তখনো ভেবে চলেছি ভদ্রমহিলা আসলে কে? রাজনৈতিক নেত্রী, মন্ত্রী না শিল্পী না অভিনেত্রী। এর মধ্যেই বোলানদিকে একটু একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ভদ্রমহিলা কে? বোলান দি যেন আমার অজ্ঞতায় দারুণ অবাক হলেন। বললেন আসমা জাহাঙ্গীরকে চিনিস না! বোঝো ঠেলা! কি করে চিনব? পাকিস্তানে আসার আগে ইস্তক তো শুনে এলাম ওটা শক্তপুরী। কাউকেই বেশী বিশ্বাস করিস না। গায়ে পড়ে কেউ আলাপ জমাতে এলে খুব সাবধান। এখন বলছ আসমা জাহাঙ্গীরকে চিনিস না?

সেই রাতেই ১২-১৩ জন দল বেঁধে ৩টি ট্যাক্সি ভাড়া ফিরে আমরা করাচি বন্দর ও বিচ দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের গাইড ছিল পাকিস্তানের ডন পত্রিকার কার্টুনিস্ট ফিকি। ফিকিকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আসমার সম্বন্ধে। বিশিষ্ট সমাজকর্মী, সামরিক শাসনের ঘোরতর বিরোধী, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন।

আড্ডায় যিনি অনায়াসে বয়সে অনেক ছোট প্রতিবেশী দেশের ভাইকে ইয়ার্কি করে বলতে পারেন, হানিমুনে এসে এতক্ষণ বাইরের লোকের সঙ্গে আড্ডা মারা উচিৎ নয়। অন্তত আমি হলে তা করতাম না। সেই তিনিই পাকিস্তানে জেনারেল পরভেজ মুশারফের সামরিক শাসন নিয়ে অকুতভয়। প্রকাশ্যেই উগড়ে দেন ক্ষোভ। সেদিনই বুঝেছিলাম দম আছে ভদ্রমহিলার। ভারতে বসে মোদি, মমতার সমালোচনা এক জিনিস। আর পাকিস্তানের মাটিতে বসে সামরিক শাসকের বিরোধিতা করা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সেখানে প্রতি পদে গ্রেফতারের ভয় প্রাণের ভয়। কারাগারে থেকে গরাদ ভাঙতে যে কি দম লাগে তা আসমা ভালই জানতেন। বার বার তাঁকে বন্দি করেছে পাক সরকার। কিন্তু দমাতে পারেনি তাঁকে। জন্ম লাহোরে, ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি। এক অবস্থাপন্ন কাকাজাই পাখতুন পরিবারে। বাবা বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী মালিক গুলাম জিলানি। বিয়ে করেছিলেন আইনজীবী তাহির জাহাঙ্গীরকে। ১৯৭৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের স্নাতক হন। কিন্তু তার আগেই মামলা লড়ে সরকারকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনার নৃশংস অত্যাচার, গণহত্যা এবং গণধর্ষণের প্রতিবাদ করেছিলেন আসমার বাবা মালিক গুলাম জিলানি। অপরাধের জন্য পাক সেনাবাহিনীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিও তোলেন জিলানি। ফলে তাঁকে জেলে পোরে পাক সরকার। বাবাকে মুক্ত করতে মামলা করেন আসমা। এবং জেতেনও মামলায়। ২৬ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কলকাতার 'স্ময়ম্'-এর অফিসে পাক-ভারত মৈত্রীর উদ্যোগে আসমার স্মরণ সভায় এই কথাই বলেছিলেন মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র। ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের

জেলে থাকা রাজনৈতিক বন্দিদের হয়ে বিনা পয়সায় লড়াইয়ের জন্য একটা ট্রাস্ট খোলেন। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য ১৯৮৩ সালে তাঁকে গ্রেফতার করে জিয়াউল হকের সরকার। ২০০৭ সালে ফের গ্রেফতার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অপসারণের প্রতিবাদ করায় মুশারফের কোপে পড়েন তিনি। তবু দমেন নি। বালুচিস্তানে পাক রাষ্ট্রের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবিতে পথে নেমেছেন। প্রেম করে বিয়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তানে আরেকটা বড় সমস্যা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে খুন। সেই কালো প্রথার বিরুদ্ধেও এগিয়ে আসেন তিনি। রাজপথে মহিলাদের দাবি দাওয়া মিছিলে যেমন উদ্ধত বেয়নেট ধারী সেনাকে অবলীলায় তিনি বলে ওঠেন আগে আমাকে মারো। তারপর অন্যদের। পাকিস্তানে বারবার তার বিরুদ্ধে রব উঠেছে তিনি ভারতের চর। আর ভারতে তিনি আইএস আইয়ের এজেন্ট। ২০০৮ সালে মুম্বইতে বাল ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাই নিয়ে দেশে কম সমালোচনার

সামনে পড়তে হয়নি তাঁকে। আসমার সাফ জবাব সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতেই বাল ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেছি। সেদিনের স্মরণ সভায় সুজাত ভদ্র আরও একটা ঘটনার কথা শোনালেন। মহারাষ্ট্রে এসে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রবল সমালোচনা করছেন আসমা। দাবি করছেন আরও গণতন্ত্রের। হঠাৎই একদল আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মী সমর্থক সভা ঘরেই হট্টগোল শুরু করেদিল। তাদের দাবি পাকিস্থান নিয়ে নীরব কেন তিনি। সেখানে হিন্দুদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার নিয়ে কিছু বলুন। অন্য কেউ হলে সেই মারমুখী জনতার সামনে মাঝ পথেই সভা ছেড়ে পালাতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মহিলা পারভেজ মুশারফকে পর্যন্ত ভয় পান না আর এস এস তার কি করবে? হট্টগোলের মধ্যে গলা উচিয়ে বললেন সব সময় ভালর সঙ্গেই তুলনা করা উচিৎ। পাকিস্তানে গণতন্ত্র নেই কিন্তু ভারতে তা আছে। তাই ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ হলে তার প্রতিবাদও হবে। আসমার কথা শুনে হিন্দুত্ববাদীরা একেবারে চুপ।

আরেকটা গল্প গাড়িতে আসার সময় শোনালেন পাকিস্তান-ইন্ডিয়া পিপলস্ ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসির রাজ্য সম্পাদক প্রবীর সিংহ রায়। আসমাকে একবার তার মেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তোমার এইসব আন্দোলন, প্রতিবাদ করে কি হবে? তোমার কথা কী শাসকরা শুনবে? তোমার আন্দোলনের ফলে পাকিস্তান বড় জোর এক ঘণ্টা গণতন্ত্রের দিকে এগোবে। আসমা মেয়ের কথায় হেসে বলেছিলেন আমার সারা জীবনের আন্দোলনের ফলে যদি পাকিস্তান গণতন্ত্রের দিকে এক ঘণ্টাও এগোয় তাতেও আমি খুশি হব।

সবসময় জীবনের কথা বলতেন। ভালবাসা, শান্তি, দোস্তি, প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব, আমনের কথা বলতেন। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যদি এর জন্য তাঁকে মরতে হয় তবে তিনি ভয় পাবেন না?

উত্তরে আসমা বলেছিলেন এটা ঠিক আমি জীবনকে বড্ড ভালোবাসী। আরও অনেকদিন বাঁচতে চাই। তবে যদি আমার আদর্শের জন্য মৃত্যুও আসে, আমি ভয় পাব না। গর্বের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করবো।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা কবিতা পাঞ্জাবী শোনালেন ১৯৮২ সালে পাকিস্তানে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের নারীদের নিয়ে সম্মেলনের গল্প। মুক্তিযুদ্ধে লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত বাংলাদেশের মহিলাদের প্রতি তার সমমর্মিতার কথা।

অথচ প্রতিবেশী দেশের এই অকুতভয় মহিলাকে আমরা ক জনই বা চিনি। সব মৃত্যুই দুঃখের। পাঠক অন্যভাবে নেবেন না। কিন্তু শ্রীদেবী দুবাইয়ের পাঁচতারা হোটেলে বাথটবে মত্ত অবস্থায় পড়ে মারা গেলে তা নিয়ে সাত দিন ধরে কত খবর হয়। কত টন টন নিউজ প্রিন্ট খরচ হয়। দেশের প্রায় সবকটি ভাষার সবকটি চ্যানেলে কত যুক্তি-তর্ক গল্প, মুখোরোচক খবর। অথচ প্রতিবেশী দেশের একজন সুহৃদ চলে গেলেন প্রায় অলক্ষ্যেই। তার নাম গান্ধী শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করেছিলেন সাংসদ কৃষ্ণা বসু। কিন্তু ভারত সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। পুরস্কার না পেয়ে অবশ্য আসমা জাহাঙ্গীরের কিছু এসে যায়নি।

১২ ফেব্রুয়ারি খবরের কাগজে যখন আসমার হঠাৎ মাত্র ৬৬ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যাবার খবরটা পড়লাম মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কোথায় যেন একটা আত্মীয় বিয়োগের যন্ত্রণা হল মনে। আমরা যারা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ জিগিরের বিরোধী, দু-দেশের মধ্যে শান্তির কথা বলি তারা আজ বড় কোণঠাসা। হাজারে এক বা লাখেও এক নয়। দু-দেশে শান্তির পক্ষে গলা তোলার লোক এখন কোটিতে গুটিকতই বটে। এই অসময়ে আসমা জাহাঙ্গীর, আই.এ. রেহমানের মত মানবাধিকার কর্মী, শান্তির দূতরা তাই আলোকবর্তিকার মতই। যারা দূর সমুদ্রবর্তী জাহাজকে অন্ধকারে আলো দেখাতেন।

আসমাদির সঙ্গে আমার সেটাই প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। আমার আর পাকিস্তানে যাওয়া হয়নি। উনি ভারতে বার কয়েক এলেও আর দেখা হয়নি আমাদের। বেশ মনে আছে আমি ওনাকে দিদি বলায়, দিদি শব্দের মানে জানতে চেয়েছিলেন। আমার উত্তর দেওয়ার আগেই পাশ থেকে নীলাঞ্জন দা ইংরাজীতে তর্জমা করে বলে ওঠেন এলডার সিস্টার। আমার দিদি ডাক শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন।

ঈশ্বরে আমার মতি নেই। আল্লা পয়গম্বর আসমাদিও মানতেন না। মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরক আছে বলেও বিশ্বাস নেই। তবু যদি কিছু থেকে থাকে এবং আসমাদি স্বর্গ বা বেহস্ত যেখানেই যান না সেখানে গিয়েও গণতন্ত্র আর সমানাধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করে দেবেন। প্রথম দেখায় তোমার অযাচিত আলাপ জমানোকে ঠিক পছন্দ হয়নি। সত্যি বলছি আজ এই দুঃসময়ে তোমাকে খুব মিস্ করছি আসমাদি। তুমি বিশ্রাম নাও। আমাদের তোমার অসম্পূর্ণ কাজ যে শেষ করতে হবে।

ইতি — তোমার কলকাতার ভাই

জেল যাপনের কিছু কথা

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাই ছিল মিটিং এর পর সকালে যে যার শেল্টার-এ চলে যাবে। প্রায় সারা রাত মিটিং শেষে রাতের অন্ধকার কেটে গেলে ভোর ভোর থাকতে চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিন মেয়ে। প্রথম বাসটা পেয়ে গেলেই ভাল। শেল্টার-এ তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব।

বাস-স্টপের কাছে অত সকালেই দেখলাম একটা দোকানে কচুরি ভাজা হচ্ছে। খিদেও পেয়েছিল। তিনজনে কুমড়োর ছক্কা সহযোগে কচুরি খেয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি দেখলাম একটি প্রাইভেট কার আমরা যেদিকে যাব তার উল্টোদিকে খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। কেমন একটা সন্দেহ হল। ওদের দুজনকে বললাম, কীরে খোচর (উর্দি ছাড়া পুলিশকে এই বিশেষণই দেওয়া হয়েছিল তখন, অবশ্য এখনও সেটা চলছে)-এর গাড়ি নয়তো? এর মধ্যেই বাস এসে পড়াতে তিনজনেই উঠে পড়লাম বাসে। বাস স্টার্ট নিতে নিতেই থেমে গেল। কী হয়েছে ভাবতে ভাবতেই তিনজন পুরুষ বাসে উঠে যাত্রীদের বলল, 'আপনারা ভয় পাবেন না এই বাসে তিনজন 'মদ পাচারকারী' উঠেছে?' এই বলে রিভলবার বের করে আমাদের তিনজনকে বাস থেকে নামতে বলে। 'মদ পাচারকারী'? বিপ্লবী আঁতে ঘা লাগে। যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলি, 'আমরা মদ পাচারকারী' নই। আমরা নকশালবাড়ির রাজনীতি করি, আমরা বিপ্লবী' তিনজনে স্লোগান দিতে থাকি 'নকশাল বাড়ি লাল সেলাম।' কিছু দরকারি কাগজপত্র সঙ্গে ছিল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে সামনে বসা যাত্রীর পেছনে ফেলে দি-ই। আশ্চর্য ওই যাত্রী কিন্তু একবারও বললেন না আমার পেছনে কীসব কাগজ-পত্র ফেলেছে। তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। হওয়ার কথাও নয়, জানি না উনি ওই কাগজ-পত্র নিয়ে কী করেছিলেন! যাই হোক আমাদের বাস থেকে নামিয়ে একটা ইটের পাঁজা ছিল তার সামনে দাঁড় করাল। তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বললাম, 'কীরে পালাবি?' এক মুহূর্ত দেরি না করে উল্টোদিকে দৌড়ালাম। সেদিকে গঙ্গা-পূণ্যার্থী যারা গঙ্গাস্নানে এসেছিলেন তাদের মধ্যে মিশে যাবার জন্য। একজন চিৎকার করে উঠল, 'দৌড়োলে গুলি করে দেব।' ছুটে কয়েক পা এগোতেই একজন দৌড়ে এসে শক্ত করে আমার হাত ধরল। পরে জেনেছি লোকটির নাম তারাপদ রায়। কুখ্যাত অত্যাচারী। যে কারণে আমাদের কমরেডরা ওর নাম দিয়েছিল 'টর্পেডো'। আমাদের তিনজনকে একটি গাড়িতে তুলল, যে গাড়িটাকে সঠিক অনুমান করেছিলাম 'খোচরের' গাড়ি হিসেবে।

যে জায়গাটায় ধরা পড়ি সেটি ছিল হুগলি উত্তরপাড়ার কাছাকাছি। আমাদের প্রথমে কোতরং থানা, সেখান থেকে উল্টোডাঙা থানায় নিয়ে যাওয়া হল। তিনজনেই নিজেদের নাম গোপন করে আলাদা নাম বললাম। তারপর নিয়ে যাওয়া হল আর একটি জায়গায়। জানতে পারলাম এটিই সেই লর্ডসিন্‌হা রোডের বিখ্যাত এস.বি. অফিস।

তারাপদ রায় খুব গর্বের সঙ্গে তার বসকে বলল, 'স্যর আর একটু বেগড়বাই করলে গুলি চালিয়ে দিতাম। আমার সামনে দিয়ে পালাবার মতলব।' যাকে বলল সে উত্তর দিল' 'তোমার যা বুদ্ধি, ভাগ্যিস সেটা অ্যাপ্লাই করনি।' এরপর ওদের আরও যা কাজ থাকে আমাদের নিয়ে অর্থাৎ ছবি তোলা, আঙুলের ছাপ নেওয়া, গায়ের রঙ, মুখের গড়ন সব লেখা হল।

এবার আমাদের তিনজনকে আলাদা-আলাদা করে তিনটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, শর্ট হাইট, ফর্সা, টাক আছে এইরকম একজনের ঘরে, পরে জানলাম এই সে-ই অ্যান্টি নকশাল স্কোয়াডের স্বনামধন্য অফিসার অশোক খাসনবিশ।

অনেক নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলাম। পি.সি., জে.সি., ইউটি প্রিজনার। জানলাম আমরা এখন পিসি অর্থাৎ পুলিশ কাস্টোডিতে। এরপর শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। এক-একজন অফিসারের ঘরে এক-একদিন হাজির করা হত, সে তার কায়দায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাত।

এস বি অফিসে যেহেতু কোনও লক-আপ ছিল না তাই আমাদের তিনজনকে তিন থানা লক-আপ এ রাখা হত। আমাকে রাখা হয়েছিল আলিপুর থানা লক-আপ-এ। সারাদিন এসবি অফিসে রাতে নিয়ে আসা হত থানায়। কয়েকদিন ওই থানায় থাকার পর একদিন জমাদার লক-আপ-এর সামনে এসে বলে, 'জয়া কে আছে তাকে অফিসে একবার সাহেব ডাকছে, চলুন'। স্যার অর্থাৎ এই থানার ও.সি।

আমাকে নিয়ে যাওয়া হল তার ঘরে। উনি খুব ভদ্রভাবেই আমাকে ওনার টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন। এরপর বললেন, আপনাকে আমি কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করব না, সে এক্তিয়ারও আমার

নেই। আপনাকে এস.বি ধরেছে তারাই যা বলার বলবে। তারপর বললেন, 'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' একটু হাসলাম (মনে হল যেন ওনার অতিথি নিবাসে আছি)। উনি আমার হাসি দেখে অন্য কথায় চলে গেলেন। বললেন, 'চা খাবেন'? খুব ইচ্ছে করছিল তা-ও না করলাম। উনি বললেন, 'এখন তো পুলিশের খাবারই খাচ্ছেন, তাহলে চায়ের বেলায় না কেন?' কিছুক্ষন পর এক পুলিশ কর্মচারী ভাল দুটো কাপ-প্লেটে চা আর বিস্কুট নিয়ে এলেন। কিছু বললাম না। চা-টা খুব ভাল ছিল আস্তে আস্তে খেয়ে নিলাম। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুনীতিবাবু কেমন আছেন?' মনে মনে ভাবলাম উনি বললেন কিছু জানতে চাইবেন না। তবে? সতর্ক হলাম। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না না, আমি কিছু জানতে চাই না। আসলে আমি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। উনি ওই কলেজে আমার খুব প্রিয় স্যার ছিলেন। আমাকে খুব পছন্দও করতেন। সেখান থেকেই জানতে চাওয়া উনি ভাল আছেন তো?' আমি বললাম, 'আমি জানি না।' এরপর সুনীতি বাবু কত ভাল টিচার কত ভাল পড়াতেন এসব টুকিটাকি কথা বলে জমাদারকে বললেন, 'ওনাকে লক-অপ-এ নিয়ে যাও।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোনও অসুবিধে হলে অবশ্যই বললেন।'

আমরা ধরা পড়ার সাতদিন পর-প্রকাশ্যে জানানো হল আমাদের ধরা পড়ার কথা। বাড়িতেও জানানো হল। খবর পেয়ে মা আর বোন এল। সেদিনের কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না। অম্বিকা ভট্টাচার্য ছিলেন এস.বি.-র বড় অফিসার, এসি থ্রি। সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে ওনার জিজ্ঞাসাবাদের কথা। অর্থাৎ ঝুলিয়ে মার। দুপুরের দিকে আমার মা আর বোন এল। মা-এর চোখে জল। এরপর পুলিশের সামনে যতটুকু কথার আদান-প্রদান করা যায় সেটুকুই করছি। এর মধ্যে আমার মাকে একজন এসে অম্বিকা ভট্টাচার্যের ঘরে -নিয়ে গেলেন।

অম্বিকা ভট্টাচার্যর ঘর-খাসনবিশের ঘরের পাশেই। ওনার গলার স্বর খুব ভরাট আর গম গম করত। শুনেছি উনি নাকি যাত্রা-থিয়েটার করতেন। খুব ভয়ে আছি মা-কে কী প্রশ্ন করবে আর মা-ই বা কী উত্তর দেবে। আবার মায়ের চেহারার মধ্যে একটা শান্তশ্রী ভাব ছিল। গলার স্বরও খুব নরম। রাস্তায় বেরোলেও আটপৌরে করে শাড়ি পরত। তাতে অন্যরকম একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠত। প্রথমেই ভারী গলায় মাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'ওটি আপনার নিজের মেয়ে? আপনাকে তো একেবারে মা লক্ষ্মীর মতো দেখতে আর ওইরকম একটা খুনি মেয়ে তৈরি হল কীভাবে?' আমার মা শান্ত অথচ বেশ দৃঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'আমার মেয়ে খুব ভাল। ও খুন করতে পারে না। ও কোনওদিন একটাও খারাপ কাজ করেনি।' 'মেয়ে নকশাল করত। নকশাল করা খারাপ কাজ নয়?' মা ততধিক শান্ত স্বরে বলল, 'কী জানি বুঝতে পারি না।' আরও কিছু কথার পর মাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মা- বোন চলে গেল।

দুরুদুরু বক্ষে বসে আছি। মা মেয়েকে ভাল বলে গেছে সব শোধ তুলবে। এবার বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়বে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

হঠাৎ 'খাসনবিশ খাশনবিশ' করে উনি চিৎকার করতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আজ আর ওকে এই ঘরে পাঠাবে না। আজ ওর মায়ের মধ্যে মাতৃরূপ দর্শন করলাম। আজ আমি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বের হব।' শুনেছিলাম উনি 'মা কালী'-র একনিষ্ঠ ভক্ত। দেব দ্বিজে কোনওদিনই আমার ভক্তি নেই। কিন্তু সেদিন আমার 'ভক্তদের' ভালই লাগল। আর মনে মনে বললাম, মা অত্যাচারের হাত থকে বাঁচাতে আমার জন্য তোমার মাতৃমূর্তি নিয়ে বারে বারে এস।

আমাদের কেসগুলি কোন বিচারকের হাতে তাকে দেখতে কেমন আমরা জানতেই পারতাম না। ১৪ দিন পর পর পুলিশের গাড়ি করে আমাদের নিয়ে আসা হত। গাড়িতেই বসে থাকতাম। আই.ও প্রত্যেকবারই ১৪ দিনের পি.সি.র অর্ডার নিয়ে আসত। এইভাবে প্রায় দু'মাস এস.বি. হেফাজতে ছিলাম।

দুমাস পর এক সন্ধেবেলায় কোর্ট থেকে সরাসরি প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে এল। জেলের যা সব নিয়ম-কানুন জেল অফিসে সারার পর 'ফিমেল ওয়ার্ড'-এ নিয়ে আসা হল। জেল অফিস ঘরে সারা দেহ সার্চ করল। আবার ফিমেল ওয়ার্ড-এ এক প্রস্থ সার্চ। নীল বা সবুজ পাড় দেওয়া সাদা শাড়ি পরিহিতা খুব খারাপভাবে সার্চ করল। পরে জেনেছি ওদের বলে মেট। ওরা সাজাপ্রাপ্ত বন্দি। বেশিরভাগই যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। বন্দি হলেও জেলের ওয়ার্ডগুলো (ফিমেল)-র শাসনভার ওদের হাতে। জেল কর্তৃপক্ষই ওদের অমানবিক নিষ্ঠুর তৈরি করে। সাধারণ বন্দিরা ওদের ভয়ে তটস্থ। প্রথমদিন আমাদের তিনজনকে বাথরুম (বাথরুম বলে কিছু নেই। ওয়ার্ডের শেষ অংশটায় শুধু দুটো নর্দমার মুখ আছে সেখানেই পায়খানা পেচ্ছাপ করে সব বন্দি)-এর পাশে থাকার ব্যবস্থা করল। অসহ্য গন্ধ। তিনজনে কথা বলতে পারছি না। বমি চলে আসছে। বমি দেখলেই মেটরা হাসাহাসি করবে 'এ কেমন নকশাল, এই গন্ধ সহ্য করতে পারছে না।' অনেক কষ্টে বমি চাপার চেষ্টা করছি। ভাবছি এখানে থাকতে হবে? কারাগার বিপ্লবীদের পরীক্ষাগার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

পরের দিন পুরুষ ওয়ার্ডেন, ফিমেল ওয়ার্ডের মেট্রন এবং চার-পাঁচ জন মেট ঢুকল, শুয়ে শুয়ে জানতে পারলাম গুনতি হবে। কোনওরকমে শুয়েছি তিনজন। সেভাবেই শুয়ে রইলাম। মেটরা হম্বিতম্বি করল। আমরা তা-ও উঠলাম না, আর খুব না ঘাঁটিয়ে ওরা গুনতি করে চলে গেল। এরপর লাইন দিয়ে বাইরে দাঁড়ালাম। সেখানে আমাদের একটা করে কার্ড দিল। যেখানে কেস হিস্ট্রি লেখা। কার্ড-এর ওপরে লেখা ইউ টি প্রিজনার (আন্ডার-ট্রায়াল-বিচারাধীন বন্দি)। ওইদিন আমাকে আর কাজলকে ডিভিশন ওয়ার্ড (কোনও সময়ে হয়তো যে বন্দিরা ডিভিশন নিতেন তাঁরা থাকতেন তাই ওই নাম। এখন সেটা নকশালদের ওয়ার্ড)-এ

পাঠাল। রুমিকে ওখানেই রেখে দিল। কয়েকদিন পর ওকেও নকশাল ওয়ার্ড-এ পাঠিয়ে দিল। ওয়ার্ডে এসে অন্যান্য নকশাল বন্দি কমরেডদের সঙ্গে আলাপ হল। রীতা, বিজু, খুকু, মিতা, বুলু, মাসিমা (শান্তি দেব)। মীনা ছিল এই ওয়ার্ডে। রাজশ্রী, মীনাক্ষী, কল্পনা তখন সেলে। দোতলায় ছিল সেল। রুমাকে ২/৩ দিনের মধ্যে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আসলে কোনও নকশালের সঙ্গে সাধারণ বন্দিদের ওরা রাখে না। যদি ছোঁয়াচেতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এই ভয়ে। কোনও বন্দি কখনও আমাদের সঙ্গে সুযোগ পেলে কথা বলত। তার জন্য প্রচন্ড অত্যাচার অপেক্ষা করত। এরপরই মলয়া (ঘোষ) খুব অসুস্থ হয়ে (লালবাজার লক অপে কুখ্যাত রুনু গুহ নিয়োগীও তার সাগরেদরা প্রচন্ড টর্চার করেছিল যে কারনে লক-আপ থেকে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল) হাসপাতালে থেকে এল। কয়েকদিনের মধ্যে এল লতিকা, অর্চনাদি, গৌরী। তার পরপরই এল বৌমা (জয়শ্রী ভট্টাচার্য/কবি-শাহিদ কমরেড অজয় ভট্টাচার্যের স্ত্রী)। এই নামেই ডাকতাম ওকে। এর মধ্যেই রাজশ্রী, মীনাক্ষী আর কয়েকদিন পর কল্পনাকে সেল থেকে নকশাল ওয়ার্ডে নিয়ে এল। সকালে গুনতি হত। আমরা যথারীতি কম্বল (জেলের দেয়া) মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতাম। ওরা কম্বল মুড়ি-দেওয়াকেই গুনে নিত। ওয়ার্ডের মধ্যে ছোট পাঁচিল দেওয়া ঢাকা জায়গা। সেখানে টিনের কৌটো থাকত। লক-আপ এর পর ওখানেই পেচ্ছাপ পায়খানা করা হত। সকালে জমাদার মাসিরা আসত পরিষ্কার করতে। আমাদের টয়লেট আমরাই পরিষ্কার করতাম, ওরা ময়লাটা নিয়ে যেত। সকালে উঠে আমাদের ওয়ার্ডে ঘরের বাইরে বড় তিনদিক ঢাকা একটা বাথরুম ছিল। কলও ছিল সেখানে। মুখ ধোওয়া, স্নান, কাপড়, জামা কাঁচা সবই চলত। অন্যদিকে দুটো পায়খানা ছিল। তার-বাইরে কল ছিল সেই কলে গঙ্গাজল আসত। সকালে মুখ ধুয়ে খাবার আনতে যেতে হত লাগোয়া ভাটিখানা থেকে। সকালের বরাদ্দ ছিল এক ডাব্বা পোকা আলা মটর সেদ্ধ। এখন শুনি চা আর এক পিস করে পাউরুটি দেয়। তখন চা দিত না। আমাদের মধ্যে কাজের ভাগ নিজেরাই করে নিতাম। কারও জল তোলা, খাওয়া বাসন ধোওয়া, কারও জমাদার মাসিদের জল দেওয়া, সপ্তাহে একদিন করে কাঁচা, ভাটিখানা থেকে গরম সাবান জলে কাপড় জামা সেদ্ধ করে দিত এটাও সপ্তাহে সপ্তাহে ভাগ করা হত।

সকাল সকাল স্নান করে সবাই ছুটতাম পাশের মেয়াদি ঘরের পেছন দিককার গরাদের কাছে। বাইরের মানুষের সঙ্গে (অর্থাৎ অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে) যোগাযোগের লোভনীয় জায়গা। ওই ওয়ার্ডে থাকতেন পাকিস্তান সেনাদের স্ত্রী, মা, বোন আত্মীয় আর তাদের ছোট ছেলে মেয়েরা। এরাও যুদ্ধবন্দি। (অনেকেই জানেন না বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় অনেক পাকিস্তান যুদ্ধবন্দিকে পশ্চিমবঙ্গের জেলে আটকে রাখা হয়েছিল।) আজ বহু মানুষ প্রশ্ন তোলে পাকিস্তান কেন কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াচ্ছে? তখন অনেকেই ভুলে যান বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় ভারত শুধু পাশে দাঁড়ায়নি অস্ত্র সেনা দিয়ে যুদ্ধ লড়েছিল এবং পাকিস্তানের সেনাদের বন্দি করে এপার বাংলার জেলে রেখেছিল।

যাই হোক তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা ওই গরাদ। সেখানে সাধারণ বন্দিরা যে ওয়ার্ডে থাকে, সেই ওয়ার্ডের মানুষেরা লুকিয়ে আসতেন। জেল কর্তৃপক্ষের কড়া নির্দেশ ছিল আমাদের সঙ্গে কেউ যেন না মেশে। মাঝে মাঝে দু-একজন বন্দি ধরা পড়ে যেত তাদের যে কী অত্যাচার করা হত যা চিন্তার বাইরে। আবার পাগলবাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এই হুমকিও চলত। এবং আমি থাকাকালীনই একজনকে ঢোকাতে দেখেছি।

গরাদের একপাশে আমরা আর ওপাশে ওরা, ওরা আমরা ওই গরাদের সীমানা ভেদ করে আমরা হয়ে যেতাম। আমাদের গল্প বেশিরভাগটাই থাকত বিপ্লবের কথা। রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ের গল্প, চীন, ভিয়েৎনাম সবই থাকত গল্পে। ওঁরা ছিলেন উর্দুভাষী আর আমাদের বাংলাভাষা। কিন্তু গল্প করতে অসুবিধে হত না। আমাদের গানও বাচ্চাগুলি কণ্ঠে তুলে নিয়েছিল। দুপুর ১২টায় লক-আপ হলে দু'জন করে এক সপ্তাহে কমিউন ম্যানেজার ছিল। তারা রান্নায় মন দিত। এত অসুবিধের মধ্যেও ওই অখাদ্যকে কী করে সুখাদ্যে পরিণত করা হত আজ ভাবলে অবাক লাগে। আমরা চা খেয়েছি। চিঁড়ের পোলাও এমনকী পিঠে বানিয়েও খেয়েছি।

প্রেসিডেন্সি জেলে যারা ছিলাম তাদের মধ্যে আমাদের একটা 'বদমায়েশের দিল' ছিল। তাদের কাজই ছিল 'অকাম' করা। একদিন ধার ছাড়া অর্থাৎ ভোঁতা এক কাঁচি (কাঁচি রাখা বারণ) দিয়ে অনেক মেহনত করে আমাদের ওই পাঁচজনের সবাই একেবারে ছোট করে চুল কেটে ফেললাম। মীনাক্ষী আমাদের ওই দলটির ওপর খুব রেগে থাকত। সেই দিন ওই ছোট ছোট চুল নিয়ে ওর সামনে আমরা যখন হাজির ও রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, 'এবার তো তল্লাশি চলবে। কীভাবে চুল কাটল, কাঁচি পেল কোথায়? আবার এটাও ভাবতে পারে চেহারা পালটিয়ে ভাগবার মতলব করছে নিশ্চয়ই। আরও পাহারা বাড়াও।' বৌমাও সেদিন আমাদের দলে ছিল। পরে রাজশ্রীর চুল ছোট করল। সন্ধেবেলা লক-আপ-এর পর পড়াশুনা করতে বসতাম। কখনও একজন পড়ত অন্যরা শুনত বা নিজেরা নিজেরা পড়তাম। ছবি আঁকতাম, সেলাই করতাম। আমি জেলেই একটু-আধটু সেলাই শিখেছিলাম। কখনও 'মেমরি টেস্ট' খেলা হত। কখনও অন্ত্যাক্ষরী। এটা কিন্তু আমরা তখনই খেলেছি। কোনও টিভি (তখনও আসেনি। ৭৫ সালে এসেছে। প্রেসিডেন্সিতে একটা টিভি সেট এসেছিল কিন্তু সেটা কোথায় বসানো হয়েছিল আমরা জানি না) বা সিনেমার দৌলতে নয়। এর কিছুদিনের মধ্যে নাটক নিয়ে মেতে উঠলাম।

লক-আপ হওয়ার আগে মেয়াদি ঘর থেকে আমাদের যে অংশটা দেখা যায় সেখানে নাটক করতাম.। ওই ওয়ার্ডের সবাই এমনকি ফাইল-এর বন্দিরা ওই নাটক দেখত। হাততালি দিত।

রাষ্ট্র চাইত আমাদের মেরে ধরে আটকে রেখে শাস্তি দিতে, আমরা হাসি-গান-গল্প-কবিতা-নাটক-মজা দিয়ে প্রতিস্পর্ধী লড়াই জারি রাখতাম। আমি যেহেতু হুগলির মেয়ে তাই স্বাভাবিকভাবে হুগলির কিছু কেস থাকবে আবার বর্ধমান জামালপুর কনস্‌পিরেসি-তে ছিলাম তাই সেখানকার কেসও বাদ যাবে না। অতএব হুগলি, বর্ধমান সব জেলেই আমাকে যেতে হবে।

ঠিক এইরকম সময় আমাকে হুগলিতে 'চালান' দেবার ডাক এল। তখন নতুন একটা নাটকের রিহার্সাল চলছে তাই 'চালান' আটকাতে হবে। উপায় বের করতে লাগলাম সবাই। মাসিমা গুঁড়াকু দিয়ে দাঁত মাজে। মাসিমার থেকে বেশ খানিকটা গুঁড়াকু নিয়ে দাঁত মাজলাম। তাতে ভয়ানক 'প্যালপিটিশন' শুরু হল। সব সাথী ওয়ার্ডেন মাসিদের চিৎকার করে ডাকতে লাগল—'জয়া (আমার পার্টির নাম ওই নামেই আমি বেশি পরিচিত)-র খুব শরীর খারাপ তাড়াতাড়ি এস।' রাজশ্রী আর এক ধাপে এগিয়ে বলল। 'জয়ার অবস্থা একদম ভাল নয় ডাক্তার নিয়ে তাড়াতাড়ি এস।' সেদিন যার ডিউটি ছিল সেই মাসি, হেড ওয়ার্ডেন (পুরুষ) ডাক্তারকে নিয়ে হাজির। সবাই এর আগেই আমাকে একদম চোখ খুলতে বারন করেছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছি। ডাক্তার পালস্‌, প্রেসার সবই দেখলেন।

স্টেথো নিয়ে বুকের ওঠা নামা পরখ করলেন। বললেন, সাতদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবাই চলে যেতে প্রথমে মুখে চাপা দিয়ে খুক খুক করে পরে হো হো করে হেসে উঠল বন্ধুরা। সে যাত্রায় যাওয়া আটকানো গেল। নাটকও করলাম। কিন্তু দিন দশ পরে চলে যেতেই হল।

হুগলি জেলে ফিমেল ওয়ার্ড। আমি একাই নকশাল। জেল ওয়ার্ডে বেশ কয়েকজন ছিল। কোর্টের দিন দেখা হয়। দ্রোণাচার্যর (শহীদ কবি দ্রোণাচার্য ঘোষ) গল্প করে ছেলে বন্দিরা। প্রথম দুদিন খুব মন খারাপ ছিল। এই জেলেই দ্রোনকে পিটিয়ে মেরেছে! পান্ত (প্রশান্ত) একজন মস্তান। ডাকাতি কেস-এ অনেকদিন থেকে জেলে। পান্ত আর আমরা ছোটবেলায় এক পাড়াতে থাকতাম। তখন একসঙ্গে খেলাধূলো ও করেছি। বন্ধুর সম্পর্ক ছিল। পরে ও ওইরকম হয়ে যাওয়াতে কোনও যোগাযোগ ছিল না। পান্ত জেলের অনেক কাজ করত। কারণ ওর সাজা হয়েছে। তবে হুগলী জেলে রেখে দেওয়ার কারণ জানি না। যাইহোক, দ্রোণের সেলে ও কাজ করত। পান্ত একদিন কোর্টে যাচ্ছে আমাকে বলল, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। দ্রোণের শেষ সময় আমিই ওর কাছে ছিলাম। যাই হোক ও সাজাপ্রাপ্ত তাই জেলের ভেতরে ওর অবাধ যাতায়াত। জেল কর্তৃপক্ষকে দেখাত ও দালাল হয়ে উঠেছে কিন্তু আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। আমার সঙ্গে দিব্যি সুযোগ করে দ্রোণ যে জেলব্রেক-এর প্রোগ্রাম-এ শহিদ হয় তাঁর সব কথা বলেছিল। ও বলেছিল দ্রোণ যখন মারা যায় তখন পান্তর কোলে শুয়ে বলেছিল, ''পান্ত আমাকে 'ভাগীরথী তুমি মেকং নদীর সীমানা ভাঙো' গানটা শোনাবি। পান্ত কাঁদতে কাঁদতে আমায় বলেছিল, 'কৃষ্ণা, কাঁদতে কাঁদতে এই গান শুনিয়েছিলাম। যেটা ওর থেকেই শেখা।' শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আজ কোনও সাথী আমার সঙ্গে নেই। এখানে সবাই অভিযুক্ত একজন। এইরকম সব বন্দি আছে। একজন বন্দি তাকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা দিয়ে গেছে পাগল হিসেবে। এখানে প্রথম দিকে একদম ভাল লাগত না। গরাদের সামনে বসে নিজের মনে গান গাইতাম। সেদিন পান্তর সঙ্গে কোর্টের পথে কথা হয়েছিল। কোর্ট থেকে ফিরে গরাদে মাথা এলিয়ে বসে বসে কাঁদছি। কার কাছে বলব। এখানকার বন্দিরা গালাগালি করে, স্থূল রসিকতা করে, একদম নিতে পারতাম না। সেদিন একজন বন্দি মেয়ে নাম কুলজুম আমাকে বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে না মিশে একা থাক, একা গান গাও, আজ আবার একা একা কাঁদছ কেন?

'তোমাদের কথা, গালাগালি একদম আমার ভাল লাগে না,' ও বলল, 'আমাদের সঙ্গে মিশে দেখ, আমরা খারাপ মানুষ নই গো।' এরপর আমাকে জোর করে টানতে টানতে ওদের আড্ডায় নিয়ে গেল। সবাই আমার কথা জানতে চায়, কেন আমি জেলে তাও শুনতে চায়। আস্তে আস্তে ওদের সবটা বলি। ওরা সেদিন থেকে আমাকে 'লাল দিদি' বলা শুরু করল। নিজের ওপর খুব রাগ হল। এই হচ্ছে মানসিকতা। নিজেকে নিজেই শাসন করলাম। দ্রোণের কথা মন হল, ও তো পান্তর মতো ছেলেকে ভালবাসত আর অমি! কখন যে ওরা আমার বন্ধু হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এখন তো ওদের রসিকতা স্থূল মনে হয় না। আমিও তো বেশ যোগ দিই আড্ডায়। ওদের গালাগালিটা কিছুটা হলেও বন্ধ করতে পেরেছিলাম। এক এক করে সবার জীবনের কথা শুনলাম। সাবেরা খুনের কেসে অভিযুক্ত। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওর বরকে ও খুন করেছে। সাবেরা খুব সুন্দর দেখতে। কেসে যদি অভিযোগ সত্যি বলে প্রমানিত হয় তাহলে সাজা হয়ে বহরমপুর না হলে প্রেসিডেন্সিতে চলে যাবে। শান্ত চেহারা। ওকে দেখে মনেই হয় না খুন করতে পারে। এই ফিমেল ওয়ার্ডের যে লিডার তার নাম চম্পা। বেশ ভাল লম্বা চওড়া চেহারা। গায়ের রঙ কালো। অসাধারন সুন্দর দুটি চোখ। ধবধবে সাদা দাঁতের সারি নিয়ে ও যখন হাসত তখন যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত। কয়েকদিনের মধ্যে চম্পা আমাকে এত ভালবেসে ফেলল যা বলার নয়। আমার কোর্ট-এর দিন আমার খাবার নিয়ে কী সুন্দর পরিপাটি করে রেখে দিত। ওর থেকেই শিখেছি ভাতের মধ্যে জল দিয়ে তাতে নুন দিয়ে রাখলে ভাত খুব ভাল থাকে। জেলের ওইরকম খারাপ চালের ভাত ওর থিওরি মেনে চলে একদিনও খারাপ হয়নি। বাড়ি থেকে ইনটারভিউ করতে এলে বলে দিতাম ভাল খাবার আমার জন্য এন না বরং বেশি করে গুড়,চিঁড়ে মুড়ি এনে দিও এখানে সবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে খাব। বাড়ির লোকেরা তাই-ই করত। সন্ধে বেলা এক একজনের জীবনের কথা শুনতাম। আমারও সব কথা বলতে হয়েছে কিছু গোপন তো অবশ্যই ছিল। চম্পা ওয়ার্ডের মধ্যে করুনাদির পেছনে সবচেয়ে বেশি লাগত। একদিন চম্পা করুনাদিকে বলল আজ 'টিকটিকি ভাতারি'র গল্প শুনব। করুনাদি রেগে গিয়ে বলল তোর মতো 'গিরগিটি ভাতারি' তো নই। লেগে গেল। করুনাদি সাদা ফর্সা (রক্তশূন্য দেখলেই বোঝা যায়) আর নীল নীল শিরা বের করা হাত, গলা, খুব রোগা। রেগে গেলে শিরা ফুলে ওঠে। আমি বললাম এটা কী হচ্ছে, একজন তো থাম। চম্পা বলে, রাগিয়ে না দিলে ও গল্প হলে না। সত্যিই দেখলাম।

করুনাদি এরপরই শুরু করল। করুনাদি বলে চলে। চেয়ে দেখি চম্পার কোলে করুনাদির বাচ্চা ছেলেটি। করুনাদিরা ধনী ছিল না কোনওদিনই। কিন্তু বরের আয়ে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কেটে যেত মোটামুটি। বরের কী কারণে চাকরি চলে যায় তখন থেকে করুনাদি লোকের বাড়িতে 'ঠিকে' কাজ করে। বেশ কয়েকটা বাড়িতে কাজ নেয়।

এক বাড়ির গৃহকর্তার লোলুপ দৃষ্টিতে পড়েও। মাঝে মধ্যেই কর্তাটি ইশারা কুইঙ্গিত দেয়। ও গায়ে না মেখে কাজ করে যায়। বাড়ির অন্য কাউকে বলে না কারণ তাদের কর্তাটি যে এইরকম করতে পারে তারা তা বিশ্বাসই করবে না। মাঝখান থেকে চাকরিটা খোয়াতে হবে। একদিন বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে 'বাবু' তার লালসা চরিতার্থ করে। ধর্ষণ করার পর বলে কাউকে একথা জানালে প্রাণে মেরে দেব। খুব ভয় পেয়ে যায় করুনা। একদিন 'পিরিয়ড' বন্ধ হয়ে যায়, ও লক্ষ করে শারীরিক পরিবর্তনও দেখা দিতে শুরু করেছে শরীরে।

এটা বুঝে 'বাবুটি' থানায় চুরির অভিযোগ জানিয়ে থানায় এফ আই. আর. করে, বর কোনও কথা না শুনে গালাগালি করে লাঠি ঝাঁটা দিয়ে মার দেয়। তারপর ঘর ছাড়া করে। বাবু'র এফ. আই আর-এর কল্যাণে 'চুরি কেসে' করুনাদি এই জেল হাজতে। সেই সন্তানই এই ছেলে। মায়ের ছেলে। আমি ওদের কাছে জবালার গল্প করেছিলাম। ওর ছেলেকে আমি সত্যকাম বলে ডাকতাম। ওদের বিষয়টা আগের থেকে জানা বলে 'নাম রাখাটা' বুঝতে পারে। ওর অন্য সন্তান বর কেউই ওর খোঁজ রাখেনি। ২ বছর ধরে করুনাদি জেলে। ছেলে জেলেতেই জন্মেছে।

যে মেয়েটিকে পাগল বলে শ্বশুড়বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে সে খুব আদুরে মতন। সবসময় গা ঘেঁষে বসে থাকত। বলত, একটু আদর কর না দিদি। আমি একটা গান করতাম 'চলেছে কৃষকের গণ ফৌজ জনযুদ্ধের পথ ধরে।' সে কারণে ও আমাকে 'ফৌজি দিদি' বলত। ওকে এর মধ্যে প্রেসিডেন্সিতে চালানের ব্যবস্থা করল। যাওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে কী কান্না।

প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে মেয়াদি ওয়ার্ড থেকে আমাদের কমরেডদের দেখে কীভাবে ও যেন বুঝতে পারে ওরা আর আমি এক। ও সরাসরি জিজ্ঞেস করে তোমরা কি আমার ফৌজিদিদির বন্ধু? বন্ধুরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ও হুগলি থেকে এসেছে। তাতেই বন্ধুরা বুঝতে পারে ফৌজি দিদি মানে আমার কথাই বলছে। আমরা জেলে মাসে একটা পোস্ট কার্ড আর একটা ইনল্যান্ড লেটার পেতাম চিঠি লেখার জন্য। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে হুগলি জেলে ওরা আমাকে চিঠি পাঠায় তাতে লেখে, 'জয়া হুগলি জেল থেকে পাগলাবাড়িতে একজন এসেছে সে খালি তোর কথা বলছে। কিছুদিন পর আবার একটা চিঠি আসে তাতে লেখা 'জয়া তোর সেই বোনকে মৃত অবস্থায় পাগলাবাড়ি থেকে বের করেছে?' যারা মীনাক্ষী সেন-এর 'জেলের ভেতর জেল-পাগলাবাড়ি পর্ব' পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন কেন আমার বোনটি এত তাড়াতাড়ি মারা গেল। ওরা ওই চিঠিতে আর একটি খবর দিয়েছে 'সাবেরা' নামে যে মেয়েটি যাবজ্জীবন সাজা নিয়ে এসেছে এই ক'দিনের মধ্যে সে বড় দালাল হয়ে উঠেছে। সাধারণ বন্দিদের অত্যাচার করা শুরু করে দিয়েছে।

হুগলি জেলের বন্দিরা আমার কথা বিশ্বাস করেছিল, একদিন সবাই ওরা মুক্ত হবে। ওদের আর দুঃখ কষ্ট থাকবে না। এক নতুন পৃথিবী হবে। এরপর আবার আমাকে চালান করা হল বর্ধমান জেলে। সেখানেও আমি ফিমেল ওয়ার্ডে একা। তবে হুগলি জেলের মধ্যবিত্ত সুলভ অহংকার ত্যাগ করে প্রথম থেকেই অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম। কোর্টের দিন আমাদের কেসের পুরুষ কমরেডদের সঙ্গে দেখা হত। তখন বর্ধমানে সুমন্ত দা, বাপি (পুলক মুখার্জি) সলিলদা (সমর) সবার সঙ্গে দেখা হত। এখানেও কোর্ট থেকে ফিরে দেখতাম গায়ত্রী মাসি (খুনে অভিযুক্ত) আমার খাবার যত্ন করে ঢেকে রেখে দিত। গায়ত্রী মাসি সাঁওতাল ছিলেন। বেশ বড় সড় চেহারা। কিন্তু ওই চেহারা নিয়ে কী সুন্দর আদিবাসী নাচ নাচতেন। মাঝে মধ্যে ওর নাচের সঙ্গে আমাকেও নিত। ওখানে দু/তিনদিনের জন্য একজন হিজড়ে এসেছিলেন বন্দি হয়ে। নাম যমুনা। হিজড়েদের জীবনের অনেক কথা আমি যমুনা মাসির থেকে শুনেছি। সারা রাত গরাদের সামনে বসে আমরা গল্প করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে কোনও মিল নেই এইরকম এক নতুন জগতের কথা শুনেছিলাম। গায়ত্রী মাসি ছিলেন আমার অভিভাবক, আমাকে সারারাত জাগিয়ে রাখার জন্য যমুনা মাসিকে বেশ বকুনি দিল। অথচ আমিই যে যমুনা মাসিকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিলাম সে কে শোনে? যমুনা মাসি আমাকে ইশারা করে থামতে বলল। যমুনা মাসি শরীরে লুকিয়ে বেশ কয়েক তাড়া বিড়ি এনেছিল। সারা রাত বিড়ি খেয়েছি আর গল্প করেছি। মাসি যাওয়ার সময় পুরো বিড়ি আমাকে দিয়েদিল।

সুপ্রিয়া আর বিলকিস ছিল লেসবিয়ান। দুজনের গভীর সম্পর্ক। হঠাৎ সুপ্রিয়া বিলকিসকে ছেড়ে আমাকে ভালবাসতে শুরু করে। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। গায়ত্রী মাসি আমাকে বিষয়টা বলে। আমি সুপ্রিয়াকে বলি, সুপ্রিয়া জেলের বাইরে আমার বর আছে; আমরা দুজনকে দুজন ভালবাসি। এছাড়া তুই তো বিলকিসকে ভালবাসিস। কিছুই কানে নেবে না একটা মরিয়া ভাব। বিলকিস একদিন আমাকে বলে, তুমি আমার আর সুপ্রিয়ার মধ্যে এস না। খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। খুব ভয় পেয়ে যাই। আমার মুসকিল আসান গায়ত্রী মাসিই আমাকে বাঁচায়। একটা কথা বলতেই হবে, মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন ওখানকার বন্দিদের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলাম। গায়ত্রী মাসি আমাকে একজনের থেকে সতর্ক করেছিল, ওকে সব কথা বলবি না। ওর নাম সবিতা। আমার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলত। সব বিষয়ে ওর বিশেষ কৌতূহলটা আমাকে ভাবাত।

ফিমেল ওয়ার্ডের মাঝখানে একটা বড় নিমগাছ, গাছটার মধ্যে একটা কোটর আছে লক্ষ করেছিলাম। আমার কিছু কাগজপত্র ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ও কীভাবে জানতে পারে। ও সেই কাগজপত্র ওয়ার্ডারের মাধ্যমে জেলারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমার ওপর নজরদারি বেড়ে যায়, তবে আলাদা কোনও শাস্তি পেতে হয়নি। গায়ত্রী মাসি একদিন ওকে খুব শাসিয়ে ছিল ওর 'খোচর গিরি' করার জন্য। আমাকে অন্য বন্দিরা খুব ভালবাসত। এই ঘটনার পর ও একেবারে একা হয়ে গেল। মাসির মতো এত স্নেহ-মায়া কম মানুষের মধ্যে দেখেছি। ভাবতাম সাজা পাওয়ার পর জেলের পরিবেশে মাসিও কি একদিন নিষ্ঠুর হয়ে

জেল কর্তৃপক্ষের লোক হয়ে উঠবে? মাসির পাশে শুয়ে কখনও বুকের মধ্যে মুখ গুজে আদর খেতে খেতে বলতাম। মাসি সাজা পাওয়ার পর অন্য সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের মতো দালাল হয়ে যেও না।

আমাদের অস্ত্র ছিল আমাদের রাজনীতি। ওদের কাছে রাজনীতি নেই। আছে জেল কর্তৃপক্ষের শাসন, প্রলোভন। তার থেকে বেরিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। সাবেরাকে হুগলি জেলে দেখেছিলাম এক ভীরু গ্রামের মেয়ে হিসেবে। প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে ও কীভাবে বদলে গেল ভাবলে অবাক লাগে।

জেলখানাকে বিশ্ব বিদ্যালয় বলা হয়। সত্যিই জেলে থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কমরেড কথাটার সঠিক অর্থ ২৪ ঘন্টা একসঙ্গে থাকার ফলে অনুধাবন করেছি। এর আগে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের শেল্টারে থাকার সময়। তাঁরা ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন। আর জেলে যে সব সাধারণ বন্দি মানুষকে দেখেছি তাদের তথাকথিত শিক্ষা নেই। রাজনীতি নেই। তাদের আপনজনেরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এইসব মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে কাছে টেনে নিলে তাদের অদেয় কিছুই থাকে না। দুহাত ভরে দিয়ে দেয়। চম্পা, কুলসুম, গায়ত্রী মাসি। করুনাদি, যমুনা মাসি, আমার সেই ফৌজি দিদি ডাকা বোন। পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্দি মুন্নি, মৌসি, ভাবি আর আমার প্রেমিক ৭/৮ বছরের জেল বন্দি আসলাম। এখন বয়েসের সঙ্গে অতীতটা বেশি সামনে চলে আসে ওদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাই। আমাদের দেখানো স্বপ্ন ওরাও কেমন দেখতে পায় সেই স্বপ্ন। তাই তো আসলাম যে বড় হয়ে আমাকে বিয়ে করবে, সে আমায় বলেছিল, একদিন সবাই মুক্ত হব বল। আর সেদিন মুক্ত হয়ে তোকে লাহোর নিয়ে যাব নারে জয়া? নকশালবাড়ির রাজনীতি এদের ও আরও অনেককে আমায় উপহার দিয়েছিল। এই রাজনীতি না করলে এত ভালবাসা পেতাম কোথায়? নকশালবাড়ি আন্দোলনের ৫০ বছরে ওই 'নকশাল' শব্দটি আজও আমাকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। আজও আমি নিজেকে 'নকশাল' হিসেবে অন্যের কাছে পরিচিত করাই।

■ বুলেট ট্রেনের সালতামামি :

- জাপানের টোকিও ও ওসাকার মধ্যে শুরু ১৯৬৪ সালে
- জাপানি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও পরিচালনায় ভারতে ১৫ আগষ্ট ২০২১ এ চালু করার প্রস্তাব
- প্রথম রুট মুম্বাই -আমদাবাদ
- এলিভেটেড করিডর প্রয়োজন। দূরত্ব ৫০৮ কি.মি.। ২১ কি.মি. সুরঙ্গ। ০৭ কিমি সুরঙ্গ আরবসাগরের নীচ দিয়ে
- ১০ কামরার ট্রেন। যাত্রী ৭৫০। ভাড়া ৩০০০ টাকা
- সর্বোচ্চ গতি ৩৫০ কিমি। সময় লাগবে ৩ ঘন্টা। ১২ টি স্টেশন
- খরচ ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। ১৮% সুদে জাপান দিচ্ছে ৮৮ হাজার কোটি টাকা
- অর্থনীতিবিদদের একাংশের প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে এবং বিপুল ঋণের বোঝা ও সুদ নিয়ে উদ্বেগ
- ৮২৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ৯২% রেলপথ এলিভেটেড, ৬% রেলপথ সুরঙ্গে ও ২% রেলপথ মাটিতে
- আই.আই.টি. আমেদাবাদের এক গবেষণা অনুযায়ী, ঐ পরিমাণ টাকা ঢেলে মুনাফা করতে গেলে ট্রেনকে দৈনিক অন্তত ১০০ বার যাতয়াত করতে হবে এবং গড়ে ৮৮ হাজার থেকে ১লক্ষ লোককে ট্রেনে চড়তে হবে। অথচ তিন হাজারের কম টাকায় মাত্র ঘন্টা খানেকের মধ্যেই মুম্বাই থেকে উড়ানে আমদাবাদ পৌঁছনো যায়
- এই মুহূর্তে মুম্বাই — আমদাবাদ যে শতাব্দী এক্সপ্রেস চলে তার ৩০% আসনই খালি থাকে।

■ ভারতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার হাল :

- ২০১৪ ও'১৫ দুবছরে ১৪২ জন সাংবাদিক আক্রান্ত
- ১৯৯২ থেকে ৩১ জন সাংবাদিক হত্যা
- সাংবাদিক হত্যার জন্য কারো গ্রেফতার না হওয়া
- দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ১৬৫ জন গ্রেফতার
- ২০১৭-র প্রথম ছমাসে ২০ বার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা

■ পশ্চিমবঙ্গের আটকে থাকা রেল প্রকল্প :

পূর্বরেল	দ:পূ: রেল	মেট্রো রেল
● কামারপুকুর-ময়নাপুর	● চাঁপাডাঙ্গা-তারকেশ্বর	● দমদম-ব্যারাকপুর
● আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ	● আমতা-বাগনান	● দমদম-বারাসত
● নামখানা-চন্দননগর	● জাঙ্গিপাড়া-ফুরফুরা	● মাঝেরহাট-ধর্মতলা
● হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ	● কাঁথি-এগরা	● গড়িয়া-বারুইপুর
● বেলানগর-বালি-লিলুয়া	● বোয়াইচন্ডী-আরামবাগ	
● ক্যানিং-বাসন্তী		

শিক্ষা প্রসঙ্গে

জিডি বিড়লার ঘটনা এবং কিছু প্রশ্ন

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের এক সকালে অভূতপূর্ব এক আন্দোলনে নড়ে চড়ে বসল কলকাতা। এর আগে অনেক রাজনৈতিক সামাজিক দাবি দাওয়া, ছাত্র আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছে আমাদের মহানগর কিন্তু অভিভাবকদের স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমন ফুঁসে ওঠা জেহাদের ঘটনা আমার অন্তত মনে পড়ছে না।

মুখবন্ধ দেখেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কোন্ ঘটনাটার কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন আমি শহরের নামজাদা দুটি বেসরকারী ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল জিডিবিড়লা এবং এমপি বিড়লার কথাই বলছি। ডিসেম্বরের ৭ তারিখের ঘটনায় কেঁপে ওঠে নাগরিক সমাজ। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে নিজের স্কুলেই ৪ বছরের ছোট শিশু কন্যার যৌন নির্যাতনের শিকারের ঘটনা। কেঁপে ওঠে নাগরিক মন। আমার শিশু সন্তান কি তাহলে স্কুলের মধ্যেও আর নিরাপদ নয়? এই দুশ্চিন্তা আর অপরাধীর প্রতি ঘৃণাই আছড়ে পড়ে। জিডি বিড়লা এবং এমপি বিড়লা স্কুলের অচলায়তনের উপর।

কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেন এই আন্দোলন? তা বুঝতেহলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। দিল্লির রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের টয়লেটের মধ্যে ছোট প্রদ্যুম্নের খুন হওয়ার ঘটনায় নড়ে বসে গোটা দেশ। স্কুলের মধ্যেও তাহলে নিরাপদ নয় আমাদের সন্তান? যে স্কুলে এত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে পড়াচ্ছি সেই স্কুলে কেন থাকবে না সিসিটিভি ক্যামেরা? কেন থাকবে না পর্যাপ্ত মহিলা অ্যাটেনডেন্ট? এই মৌলিক প্রশ্ন দুটির সদুত্তর তো স্কুল কর্তৃপক্ষ দিতেই পারল না, উপরন্তু অপরাধ ঢাকতে প্রথম থেকেই কিছুই হয়নি' বলে বিবৃতি দিয়ে আগুনে ঘি ঢাললেন জিডি বিড়লার প্রিন্সিপাল।

ক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়াল এই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা। বস্তুত প্রায় চার বছর আগে ২০১৪ সালেও একই অভিযোগ উঠেছিল জিডি বিড়লা স্কুলটির বিরুদ্ধে। তখনও প্রতিবাদে সোচ্চার হন অভিভাবকদের একাংশ। আমার মেয়েও ওই স্কুলে পড়ে বলে স্কুল গেটের সামনে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশের সামনেই আমাকে 'বহিরাগত' আখ্যা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় কিছুলোক। পুলিশ সব দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। আমি অবশ্য কস্মিনকালেও যারা আমার ওপর চড়াও হয়েছিলেন তাদের স্কুল গেটের সামনে দেখিনি। সে সময় স্কুলে সিসিটিভি বসানোর দাবি মানেনি জিডি বিড়লা কর্তৃপক্ষ। গার্জিয়ান ফোরাম তৈরির দাবিও উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিন যদি এই দাবিগুলি মেনে নেওয়া হতো তাহলে বোধ হয় আজকের পরিস্থিতির সৃষ্টিই হতো না।

বেশ কিছু অভিভাবক সন্দেহ প্রকাশ করেন শিশুটিকে যৌন হেনস্থার ঘটনা আদৌ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে। সবই ওই শিশুটির অভিভাবকদের মন গড়া ভাবনা নয় তো? তাই অভিযুক্তদের টি আই প্যারেডে প্রথমদিকে শনাক্তকরনই করতে পারেনি শিশুটি। অভিযুক্ত দুই শারীরবিদ্যার শিক্ষক নির্দোষ। তাদের ট্র্যাক রেকর্ডও ভাল। অতিতে কোনও কাল দাগ নেই। শিশুটিহয়তো ভয়ে কিছু বলেছে। আর তার বাবা-মা সেটা থেকেই মন গড়া ধারনা করে নিয়েছেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই অভিভাবকদের একাংশের এই ধারনা সঠিক, অভিযুক্তরা নির্দোষ, তাহলেও কিন্তু দায় এড়াতে পারেনা জিডি বিড়লা স্কুল কর্তৃপক্ষ। কারণ স্রেফ তাদের জেদের বলি হলেন দুই তরুন শিক্ষক। ২০১৪ সালেই যদি করিডোরে সিসিটিভি লাগানো হতো তাহলে সেই ফুটেজ দেখেই বোঝা যেত প্রকৃত সত্যটা। 'দুধ বা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে যেত তৎক্ষনাত। পুলিশকেও আর তদন্তের ব্যাপারে তত মাথা কুটতে হতো না।

জিডি বিড়লার প্রিন্সিপাল শর্মিলা নাথের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। পেরেন্টস-টিচার মিটিংয়ে দু-একবার মিনিট ১০-১৫র জন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার মনে হয়েছে উনি কড়া ধাঁচের প্রশাসক। স্কুলের রেজাল্ট এবং সুনাম বৃদ্ধি করতে চান। তাই হয়তো স্কুল মালকিন মঞ্জুশ্রী খৈতানের চাপে পড়ে তদন্তের আগে প্রথম থেকেই ঘটনার কথা অস্বীকার করে গেছেন। আর সেটাই ওনার কাল হল। যে স্কুলের সুনাম বজায় রাখতে ঘটনার কথা উনি অস্বীকার করলেন। অভিভাবকদের তীব্র চাপের মুখে পড়ে ওনাকেই বলির পাঁঠা করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। জঞ্জালের মতো ছুঁড়ে দিতে এতটুকু সময় নিলেন না।

আজকের এই সময় থেকে যখন মুখ ফিরাই পিছনের দিকে, প্রায় তিন দশক আগেকার আমার ছেলেবেলার দিকে দেখি এক ভিন্ন চিত্র। গত শতাব্দির আট এবং নয়ের দশকের প্রথমদিকে যখন আমরা স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা কেমন ছিল? ছিল শাসন ও স্নেহের। শ্রদ্ধা ও ভয়ের। পড়া না পারলে ছিল রামঠেঙানি। হোম টাস্ক না করে আনলে নিলডাউন বা বেঞ্চের ওপর কান ধরে দাঁড়ানো। নীচু ক্লাসের পড়ুয়াদের কাছে বেইজ্জতির ভয়। আবার বাড়িতে শিক্ষক-শিক্ষিকার নামে নালিশ করেও বাবা-মার কাছে কিন্তু কিছু সুবিধা হত না। উল্টে কোন কোনও ক্ষেত্রে নালিশ করলে বাড়িতেও জুটতো চড় চাপড়। আমাদের কালের স্কুল পড়ুয়াদের তখন ডাঙায় বাঘ জলে কুমীরের মত অবস্থা। তখন যে এসব হতোই না তা বলতে চাইছিনা। হলেও এত ব্যাপকতা যেমন ছিল না, সেভাবে সামনে বা খবরে আসত না।

গত শতাব্দির শেষের দশক থেকে আরও বলা ভাল এই শতকের প্রথম থেকেই অবস্থাটা দ্রুত বদলাতে শুরু করল। উচ্চবিত্তরা তো অগেই সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুল থেকে মুখ ঘোরানো শুরু করে দিয়েছিলেন এবার মধ্যবিত্ত এমন কি দিন আনি দিন খাই মানুষজনও বাংলা মিডিয়াম স্কুল ত্যাগ করে অন্ধের মতো ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলগুলির দিকে ছুটলেন। ফলে একদিকে যেমন ব্যাঙের ছাতার মতো বিভিন্ন ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠল তেমনি বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলি ছাত্রের অভাবে শুকিয়ে যেতে বসল। শহরে কত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কর্পোরেশন চালিত শিক্ষাকেন্দ্র যে ছাত্রের অভাবে স্রেফ উঠে গেল তা আর কতজন হিসাব রাখেন? আর সেসব জায়গা রাজনৈতিক মাফিয়া- প্রোমোটারেরা দ্রুত দখল করে তৈরী করল অত্যন্ত লাভজনক বহুতল আবাসন।

'আমার সন্তান ইংরেজি শিখবে, ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে' অভিভাবকদের এই স্বপ্ন দেখার মধ্যে আমি অবশ্য কোনও অপরাধ দেখতে পাই না। অপরাধ নিজের ভাষাকে হেয় জ্ঞান করা। একবিংশ শতকে যখন সারা বিশ্ব পরস্পর পরস্পরের কাছে সব রকম আদান প্রদানের দুয়ার খুলে দিয়েছে সেই Corporate World এর কল্যাণে। শুধু মাতৃভাষার দৌলতে অন্নসংস্থান যে কত দূরহ তা আমার মতো ভুক্তভুগিরা ভালই জানেন। দোষের হল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিরা এই সমস্যার কথাটা বুঝতেই পারলেন না বা বুঝতে চাইলেন না। ৩৪ বছরের রাজত্বে সিপিএম পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত ইংরাজী তুলে দিয়ে গোটা একটা প্রজন্মের পায়ে কুড়ুল মেরে গেল। একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলল বর্তমানের তৃণমূল সরকারও। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করল না। স্কুলগুলির পরিকাঠামোয় নজর দিল না। এমন কি নিজেরা এগিয়ে এসে একটাও ইংরাজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করল না। বরং সেই একই ভরতুকির রাস্তায় হাঁটল। অনেক অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীকে আক্ষেপ করতে শুনেছি একটু টিউশন ফি বাড়িয়ে মাসে ৫০০ টাকার মধ্যে করে যদি সরকার বেশ কয়েকটি ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল তৈরি করতো, তবে বহু অভিভাবকই প্রাইভেট স্কুলে বাচ্চাদের না পাঠিয়ে সরকার পোষিত ইংরাজি মিডিয়াম স্কুলেই পাঠাতেন। আর তাহলে প্রতিযোগিতার মুখে বেসরকারী স্কুলগুলিও এমন লুঠতরাজ করতে পারতো না।

পরিশেষে একটা কথা বলে এই লেখায় ইতি টানব। বর্তমানে স্বাস্থ্যের মতো শিক্ষাও একটা কমোডিটি বা ব্যবসা। এখানে একটাই নীতি'ফেল কড়ি মাখো তেল'। পয়সা খরচ করতে না পারলে শিক্ষা মিলবে না, চিকিৎসা মিলবে না। আর যে একদমই পারবে না তার জন্য অগ্রগতির গতি অব্যবস্থাপূর্ণ সরকারি হাসপাতাল, নয়তো সরকার চালিত ধুকতে থাকা স্কুল। এখানে দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভালবাসার সম্পর্ক বলে কিছু নেই। কিছু হয়না। নয়া উদারতাবাদী অর্থনীতির এই বিপদ আমাদের প্রায় গিলে খেতে বসেছে। তাই শিক্ষক-ছাত্র, চিকিৎসক- রোগির মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক আজ ক্রম ভঙ্গুর। এক হাত পেতে রোগি অথবা ছাত্রের কাছ থেকে কথায় কথায় টাকা নেব আবার শ্রদ্ধা-সন্মানেরও দাবি জানাব, দুটো তো একসঙ্গে হয়না। তাই হয়তো সময় এসেছে ফিরে দেখার। নিজেদের আত্মমূল্যায়ণের। আমরা কি চাই তা ঠিক করার। এই দুঃসময়েও গুটি কয়েক চিকিৎসক ও শিক্ষক যে গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে নীরবে তাদের কাজ করে চলেছেন, অন্ধকারের মধ্যে সেটুকুই যা আশার আলো।

এক নজরে প্রেসিডেন্সি

শরদ্বত সরকার

প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ হিসাবে ১৮১৭ সালে। এর কয়েক বছর পরে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়ে ওঠে। এই কলেজটি তৈরি হওয়ার ৪০ বছর পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয় এবং ২০১১- তে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার আগে পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার বহু পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২২, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অর্থে এই প্রতিষ্ঠানটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনায় তৈরি হয়ে ২০০ বছর পার করে দেয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভবতোষ দত্ত, সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন দের মত দিক্‌পালরা পড়িয়েছেন। কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা প্ল্যানিং কমিশনে ডেপুটি চেয়ারম্যন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ কিছুদিন এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনীদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (এক দিনের জন্য), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধন গুপ্ত, অম্লান দত্ত, অমর্ত্য সেন, সুখময় চক্রবর্তী, পার্থসারথি সেনগুপ্ত, অমিয় বাগচি, মিহির রক্ষিত, নির্মল কুমার চন্দ্র, অমিত ভাদুড়ি, প্রণব বর্ধন, বিমল জালান, কবি শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৯ এবং ২০১০ সালে একক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদায় উন্নীত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নের দেখভাল করার জন্য নামী প্রাক্তনীদের নিয়ে মেন্টর গ্রুপও তৈরি করা হয়। কিন্তু অচিরেই অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী, অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তীর মত ব্যক্তিরা মেন্টর গ্রুপ থেকে পদত্যাগ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মালবিকা সরকার উপাচার্য হিসাবে কাজ শুরু করার কিছুদিন পর থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝামেলা শুরু হয়। তাঁর পরে স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপিকা অনুরাধা লোহিয়া; যার আমলে (এখনও তিনি দায়িত্বে) অশান্তি, ঝামেলা, গোলমাল, আর্থিক অনিয়মের অভিশাপ ও সর্বোপরি মানের ক্রমাবনতি ও ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে অনীহার (ভর্তির ৩০০ আসন এই বছর খালি আছে) সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য বেতন না পেয়ে বহু শিক্ষক (অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক সোমিক রায়চৌধুরী প্রমুখ) প্রতিষ্ঠান ছেড়েছেন।

দেখনদার গেট বানাতে গিয়ে ১০০ বছরের পুরনো অশথ গাছকে কেটে ফেলা হয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরনো ক্যান্টিন পরিচালক প্রমোদদাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের সংগে প্রেসিডেন্সির মানের কোনদিন তারতম্য ঘটেনি। উজ্জল ছাত্ররাই আন্দোলনে জড়িয়েছেন, ভালও ফলও করে প্রেসিডেন্সির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কয়েকবছর হল প্রেসিডেন্সির রসায়ন ল্যাবরেটরি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেন সেই রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। নানা কারনে প্রেসিডেন্সির অতীত গৌরব আজ ভূলুণ্ঠিত।

উচ্চ শিক্ষার ক্রমাবনতি

সনাতন মুর্মু

পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্রমাবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিদ্যালয়ে স্কুল ছুটও বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। রাজ্যে উচ্চ শিক্ষায় ক্রমাবনতি সাম্প্রতিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ, বি এস সি (অনার্স ও জেনারেল) পার্ট ওয়ান ফলপ্রকাশে স্পষ্ট। বহু গৌরবের অধিকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন দুর্গতি গত কয়েকদশকে দৃষ্টিগোচর হয়নি। ২৪ জানুয়ারি '১৮ ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল বি এ-তে ২০১৬-র ৭৫ শতাংশ থেকে নেমে হয়েছে ৪২.৫০ শতাংশ, আর্ধেকের বেশ কম। এবং বি এস সি- তে ২০১৬-র ৮৫ শতাংশ থেকে কমে

হয়েছে ৭১ শতাংশ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-ফেলের চিত্র স্পষ্ট হতেই দেখা গেল নিউ আলিপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যা জুলজি, অনার্সের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া ছাত্রীর আত্ম হনন। এ ঘটনা লজ্জার ও অত্যন্ত বেদনার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত আধিকারিকদের তরফে বলা হচ্ছে বছরখানেক আগে আগের সময়কার নীতিপরিবর্তনেই নাকি এই বিপর্যয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আছে ১৪২টি কলেজ। স্নাতকস্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যেখানে নীতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে বিএ। বি এস সি (অনার্স)-এ যে সব পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের অনার্সের সব পত্রের সংগে পাশের দু'দুটি বিষয়ের যে কোন একটিতে উত্তীর্ণ হতেই হবে। অন্যদিকে জেনারেল পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের যে কোন দুটিতে পাশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা মেনে পড়ুয়ারা পার্ট-ওয়ান পাশ করলেই পার্ট-টু তে বসার ছাড়পত্র পাবেন। শিক্ষা জগতের হালহকিকতের খোঁজ রাখেন এমনসব ব্যক্তিই জানেন যে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ১+১+১ পদ্ধতি চালু করে। এবং ২০১০থেকে আটকে রাখা নয় (নো-ডিটেনশান) করা হয়। ফলে অর্নাসের কোন পড়ুয়া কোয়ালিফাই (৩৫ শতাংশ অর্নাসের পত্রে পেলে কোয়ালিফাই করবে) করলেই জেনারেল দুটি বিষয়ের একটিতে এ পাশ না করলেও পার্ট-টু পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করতেন, এবং জেনারেল পত্র আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করতেন। বি এ, বি এস সি-র তিনটি জেনারেল বিষয়ের মধ্যে একটিতে পাশ করে কোয়ালিফাই নাম্বার থাকলে অন্য দুটি বিষয়ে ফেল করলেও পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে পারতেন। পার্ট-টু-র ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি মানা হত। তৃতীয় বর্ষে ফেল করা পত্রে উত্তীর্ণ হতে হত। এ বছরের পার্ট-ওয়ান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরেই উচ্চশিক্ষামহলে সর্বস্তরে সমালোচনা শুরু হয়েছে। খোদ উচ্চশিক্ষামন্ত্রীও পড়ুয়াদের এই ফল দেখে উদ্বিগ্ন

হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত সিস্টেমের পরিবর্তন ঘটলেও পড়ুয়াদের সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করা হয় নি। বিষয়টি খুব দ্রুত কার্যকর করা হয়েচে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছেন। ফল প্রকাশের পর ব্যাপক হৈ চৈ শুরু হয়। তাঁর দপ্তরে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারকে ডেকে পাঠান। পরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পুরনো সিস্টেমেই পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার অনুরোধও করেন শিক্ষামন্ত্রী। সিন্ডিকেটের বৈঠক ডাকা হয়। এবং সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পুরনো পদ্ধতিতেই অকৃতকার্যদের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন হল এক বছরেই কি উচ্চশিক্ষার এই মানের অবনতি ঘটে গেল? এই প্রশ্নের উত্তর এক দৈনিকে দিয়েছেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) দীপক কর। তিনি বলেন, ''এক বছরেই পড়াশোনার মান খারাপ হয়ে গিয়েছে, এরকম নয়। প্রয়োজনে ছাত্রদের স্বার্থে নিয়ম পরিবর্তন করতে হতে পারে।'' সহ-উপাচার্যের বক্তব্যের দুটো দিক আছে। এক, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান এক বছরে খারাপ হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরেই হাল খারাপ ছিল এবছরের ফল প্রকাশের পর তা প্রতীয়মান হয়েছে। দ্বিতীয় যে নিয়ম পরিবর্তন ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নেওয়া হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সহ-উপাচার্য তাঁর বক্তব্যের কোনটিকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন? না কি তাঁর বক্তব্যের দুটি অংশই স্বত:সিদ্ধ? সাম্প্রতিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ বিএস সি পার্ট ওয়ান ফল প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে। তা হল উচ্চশিক্ষার ক্রমাবনতি রাজ্যে স্পষ্ট। প্রথমত আগের জমানায় যা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই সাত বছরের পরিবর্তনের জমানায় তা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংখ্যার হিসেব নিকেশে সরকার যেভাবে শ্লাঘা প্রকাশ করেন তা যে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের সংগে সম্পর্কিত নয় তা বোঝা যায়। পরিকাঠামোর উন্নয়ন না ঘটিয়ে, শূন্যপদে শিক্ষক প্রয়োজনের আর্ধেকও না নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই উচ্চ শিক্ষার মানের বৃদ্ধি হয় না। অন্যদিকে কলেজে কলেজে যা ক্যাপাসিটি তার চেয়ে দ্বিগুণ ছাত্রসংখ্যা ভর্তি করলেও যে (বিগত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ করা হচ্ছে) উচ্চ শিক্ষার মান বৃদ্ধি হবে না, পরিকাঠামো ঠিকঠাক না থাকলে। উচ্চশিক্ষার ক্রমাবনতি ঘটার আরেক কারণ হল বিপুল মাইনে পাওয়া এক শ্রেণির স্থায়ী শিক্ষকের নিজের নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহেলা করা। এই ফাঁকিবাজ শিক্ষকদেরই কয়েকজন দলীয় অনুগ্রহে কলেজে কলেজে অধ্যক্ষও নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ছাত্র পড়ানোর চেয়ে বা ঠিকঠাক ক্লাস নেওয়ানোর পরিবর্তে অধ্যক্ষ কক্ষে অন্যান্য শিক্ষকদের দিনের পর দিন তাঁদের সামনে বসিয়ে রাখেন। বর্তমানে ক্যানিং-এর বঙ্কিম সরদার কলেজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমান কলেজ অধ্যক্ষ এবং তাঁর আগে যিনি টিচার ইন-চার্জ ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ক্লাস না নেওয়ার বিস্তর অভিযোগ আছে! ফলে এই অবস্থা হলে ছাত্রছাত্রীরা ভুক্তভোগী হয় এবং পরিণতিতে তাঁরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। সুতরাং বিসমিল্লার গলদ থাকলে শিক্ষার মানোন্নয়ন কখনওই সম্ভব নয়।

প্রযুক্তিকে দর, অবজ্ঞা বিজ্ঞানকে, এই হাল! — পথিক গুহ

সমাজ এবং সরকার মৌলবিজ্ঞানকে গুরুত্ব না দিলে ভারত বিজ্ঞানে এগোতে পারবে না। বুধবার স্পষ্ট বললেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সি এন আর রাও। ভারতরত্নে ভূষিত অশীতিপর গবেষক বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে এ দিন বললেন, ''ইউরোপ আমেরিকা তো দূরের কথা, আমাদের পাশের দেশ চিন কিংবা তার পাশের দেশ দক্ষিণ কোরিয়া যে হারে উন্নতি করেছে, সেখানে আমার কোথায়?''

বিজ্ঞান অদ্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক, এ কথা বারবার বলে রাও জোর দিলেন, তুলনা-বিচারে। জানালেন, আশির দশকে তিনি যখন রাজীব গান্ধীর বিজ্ঞান পরামর্শদাতা, তখন ভারতের গবেষকদের একটি দল চিনে গবেষণা জরিপ করতে গিয়েছিল। ''সে দিন চিনে যে ল্যাবরেটরিতেই যাই, সেখানেই টিমটিম করে জ্বলছে আলো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই, হি হি করে কাঁপছি। আর আজ? সেই চিন গবেষণায় কোথায় গিয়েছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না!''

এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাও বললেন, ''দেশের যে প্রান্তেই যাই, দেখি কৌতূহলী এবং জ্ঞানপিপাসু শিশুদের। আমার অনুমান ওদের সংখ্যা হবে এক কোটি। কাল কিন্তু ওরা চাকরি চাইবে, গবেষণায় নামতে চাইবে। সরকার এই সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেছেন বলে তো আমার মনে হয় না।''

রাওয়ের মতে, ব্যাধিগ্রস্তের মতো ভারতের সমাজ মূল্য দেয় প্রযুক্তিকে, অবজ্ঞা করে বিজ্ঞানকে। জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রামন বা শ্রীনিবাস রামানুজনেরা যা নিয়ে ভাবতেন, তা হল মৌলবিজ্ঞান। ''আমার গুরু নোবেলজয়ী স্যার নেভিল মট জগদীশ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষটা এত কিছু করলেন কী করে বলতে পারো?'' উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে রাওয়ের প্রশ্ন ছিল, পরমাণুর কণা ইলেক্ট্রন কোন সালে আবিষ্কৃত হয়? উত্তরটা দিলেন নিজেই, ''১৮৯৭-তে। অথচ বেতারতরঙ্গ-সংক্রান্ত জগদীশের যুগান্তকারী আবিষ্কার ১৮৯৪-এ। ভাবা যায়?'' ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রাওয়ের পরামর্শ, ''স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পেয়ো না।'' তাঁর অভিজ্ঞতা বলে, ''সেটা ছিল এক সায়েন্স কংগ্রেস। উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁকে থামিয়ে প্রথম সারিতে বসা সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি বাজে বকছেন। বিজ্ঞানীর এমন সাহস চাই।'' সখেদে বলে গেলেন, ''এক অধিবেশনে আমার বক্তৃতার পরে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন রামন। বলেছিলেন, আমার বয়স ৮২। এখনও ভারতকে বিজ্ঞানে উন্নত দেখে যেতে পারলাম না।'' রাওয়ের সংযোজন, ''আমার নিজের বয়স ৮৪। আমিও পুনরুক্তি করতে পারি রামনের।''

বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তিসভায় আজ বক্তৃতা দেন বিকাশ সিংহ, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রধান সিদ্ধার্থ রায় এবং বিজ্ঞানী দীপঙ্কর হোমও।

[সৌজন্য : আনন্দবাজার পত্রিকা]

জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে

ডেঙ্গু জ্বর

সঞ্জয় সেনগুপ্ত

পরেশদা বিমর্ষ মুখে বসেছিলেন। পটলা প্রথম খেয়াল করল, 'কি বস্, মুখ শুকনো কেন? বৌদি আবার ঝাড় দিয়েছে?' বয়সে অনেকটা বড় হলেও পরেশবাবু এই ক্লাবের ছেলেগুলোর সঙ্গে বন্ধুর মতই মেশেন। তাই স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, 'একটু টেনসনে পড়ে গেছি রে! ছেলেটার দুদিন ধরে ধুম জ্বর। অমিয় ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে বলেছেন ডেঙ্গু হতে পারে। অথচ বাবানকে হাসপাতালে ভর্তি করতে বারনই করলেন। বললেন পর্যাপ্ত নুন চিনির জল খাওয়াতে আর জ্বরের জন্য প্যারিসিটামল দিতে। অবশ্য প্রতিদিন রক্তের প্লেটলেট পরীক্ষা করাতে বলেছেন। কাগজে এত কিছু লিখছে- ভাবছি নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দেব কিনা?'

পরের সপ্তাহে পরেশদার ছেলে বাড়ীতেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল।

পরেশদা তো ডাক্তারবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গত কয়েক বছর ধরেই চারপাশে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আলোচনা চলছে। আতঙ্কিত পরিবার রোগীকে নিয়ে নার্সিংহোম, হাসপাতালের দরজায় দরজায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। রোগের সঙ্গে লড়তে গেলে প্রথমেই দরকার সচেতনতা। সরকারী বা বেসরকারী স্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টাও চলছে। চলুন না, রোগ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি।

প্রশ্ন-১ : ডেঙ্গু কি ধরণের রোগ?

উত্তর : ডেঙ্গু মশাবাহিত সংক্রামক জ্বর। রোগের কারণ ডেঙ্গু ভাইরাস। এই ভাইরাস ফ্লাভি ভাইরাস পারিবারের সদস্য। অন্যান্য কয়েকটি একই পরিবারভুক্ত ভাইরাস থেকে ইয়েলো ফিভার, এনকেফেলাইটিসের মত রোগ হয়। এই ধরনের বেশীরভাগ ভাইরাস সন্ধিপদ প্রাণীর যেমন মশার মাধ্যমেই ছড়ায়।

প্রশ্ন-২ : ডেঙ্গু কিভাবে ছড়ায়?

উত্তর : ইডিস শ্রেণীর মশা বিশেষত ইডিস ইজিপ্টি (Aedes aegypti) এই রোগের বাহক। স্ত্রী ইডিস মশা রোগাক্রান্তর শরীর থেকে রক্ত পান করে (জ্বরের প্রথম দুই থেকে দশদিনের মধ্যে) আক্রান্ত হয়। এর আট থেকে দশদিন পরে সুস্থ মানুষের দেহে রক্তপানের সময় সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে পারে। ভাইরাস কিন্তু মশার কোন শারীরিক ক্ষতি করে না।

ইডিস মশা সকাল ও সন্ধেবেলা বেশী কামড়ালেও দিনের যে কোন সময়েই কামড়াতে পারে। ইডিস ইজিপ্টি মানুষের কাছাকাছি জমা জলে ডিম পাড়ে এবং মানুষের রক্ত বেশী পছন্দ করে- এইজন্যই রোগ ছড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

প্রশ্ন-৩ : রোগটির লক্ষণ কি?

উত্তর : ডেঙ্গু অন্য বহু ভাইরাসজনিত জ্বরের মত হঠাৎ জ্বর, গায়ে হাতেব্যাথা, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ হয়। বিশেষ লক্ষণ বলতে চোখের পিছনে ব্যাথা এবং গায়ে হাতে প্রচন্ড যন্ত্রণার উল্লেখ করতে হয়। ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে জ্বর আসে। তবে মনে রাখতে হবে শতকরা প্রায় আশি শতাংশ আক্রান্তই আপাতভাবে সুস্থ (Asymptomatic infection) থাকেন। বাকী কুড়ি শতাংশের বেশীরভাগই প্রাথমিক জ্বরের পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। মাত্র পাঁচ শতাংশ রোগীর গুরুতর অসুবিধা দেখা দেয় এবং এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। রোগাক্রমনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে দুই থেকে সাত দিনের জ্বর আসে। এর মধ্যে জ্বর কমে আবার দ্বিতীয় দফায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে (Biphasic)। অর্ধেকের বেশী আক্রান্তের দেহে হামের মত দাগ (rash) দেখা দেয়। বমিবমি ভাবও হয়।

অল্প কয়েকজনের ক্ষেত্রে জ্বর ছেড়ে গেলেও সংক্রমণ জটিল আকার ধারণ করে। শিশু এবং অল্পবয়স্কদের ক্ষেত্রেই এই জটিলতা বেশী করে দেখা দেয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তপাত, বুকে বা পেটে জল জমে যাওয়া অথবা রক্তচাপ কমে 'শক' (shock) এই সময়ের বৈশিষ্ট্য। রোগ জটিল হলে মৃত্যুও অসম্ভব নয়।

তবে অধিকাংশ রোগীই দু থেকে সাতদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন-৪ : রোগের জটিলতার বিশেষ কোন পূর্ব লক্ষণ আছে কি?

উত্তর : বিশেষ কিছু লক্ষণের প্রাদুর্ভাব রোগ জটিলতা নির্দেশ করে যেমন—

প্রচন্ড পেটে ব্যথা, ক্রমাগত বমি, যকৃৎ বৃদ্ধি (Liver enlargement), আবরণী ঝিল্লীতে (Mucosal membrane) রক্তপাত, দুর্বলতা, ছটফট করা, বুকে বা পেটে জল জমে যাওয়া বা রক্তে অনুচক্রিকার মাত্রা কমে যাওয়া।

ডেঙ্গু রোগে বিশেষ বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। স্নায়ুঘটিত দুর্বলতা, এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। গর্ভবতী মহিলারা আক্রান্ত হলে ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্ন ৫: ডেঙ্গু রোগ নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করার উপায় কি?

উত্তর : রোগের প্রকোপ যে সব জায়গায় বেশী,সেখানে রোগলক্ষণ দেখেই সনাক্ত করা হয়। জ্বরের সঙ্গে বমি, র‍্যাশ, সারাশরীরে ব্যথা ইত্যাদি একাধিক লক্ষণ থাকলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা হ্রাস পায়। হাতে শক্ত করে বাধন দিয়ে কয়েক মিনিট রাখলে হাতের চামড়ায় ছোট ছোট রক্ত জমার দাগ দেখা দিতে পারে (tourniquet test)। এছাড়া জটিলতা সংক্রান্ত বিশেষ লক্ষণগুলি আগেই আলোচিত হয়েছে।

ডেঙ্গু রোগ সনাক্তকরণে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়। দ্রুত নির্ণয়ের জন্যে NS-1 অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটি জ্বরের প্রথম দিন থেকেই Positive হতে পারে। শতকরা ৯০ ভাগ ডেঙ্গু সংক্রমন পরীক্ষাটির মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় জ্বরেও Positive ফলাফল আসতে পারে। তাই রোগনির্ণয়ে পরীক্ষাটির ব্যবহার সীমিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ELISA পদ্ধতি অনুমোদন করে।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরী হতে ৫-৭ দিন সময় লাগে। প্রথমে IgM এবং পরে IgG শ্রেণীর অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। এইধরণের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি রোগাক্রমণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ বহন করে। ELISA পদ্ধতিতে নির্ণয় করে রোগ প্রমাণ করা হয়।

যেহেতু প্রথম সাতদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবডি তৈরী হয় না, জ্বরের প্রথম সপ্তাহে ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রমাণ করতে ভাইরাস কালচার অথবা PCR পরীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি দেখানো দরকার। তবে সাধারণ ল্যাবরেটরীতে এই জাতীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না।

তবে সমস্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের নিয়মিত প্লেটলেট পরীক্ষা করা উচিৎ। এইমাত্রা হ্রাস পেলে রোগ জটিল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রশ্ন-৬ : ডেঙ্গুর চিকিৎসা কি?

উত্তর জটিলতা বিহীন ডেঙ্গু জ্বরে বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। পরিপূর্ণ বিশ্রাম, উপযুক্ত পথ্য ও পর্যাপ্ত জলপান ধীরে ধীরে রোগীকে সুস্থ করে তুলবে। জ্বরের জন্য paracetamal ছাড়া আর কোনও ওষুধ ব্যবহার অনুচিৎ।

রোগ জটিল হলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন দেওয়ার দরকার। জটিলতর রোগে রক্ত অথবা অনুচক্রিকা চালাতে হয়।

এছাড়াও শকের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হয়।

প্রশ্ন-৭ : রোগ প্রতিরোধের জন্য কি করা প্রয়োজন ?

উত্তর : রোগ প্রতিরোধের প্রধান পথ বাহকের অর্থাৎ মশার বংশবিস্তার রোধ। এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন মশার লার্ভার বিস্তার বন্ধ করা। বাড়ীর মধ্যে বা চারপাশে জল জমা বন্ধ করতে হবে অথবা জমা জলে বংশবিস্তার বন্ধ করার জন্য লার্ভিসিডাল (ভেষজ হলে ভাল) দিতে হবে। এজন্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিও (যেমন গাপ্পি জাতীয় মাছের চাষ যেগুলো মশার লার্ভা খেয়ে নেয়) ব্যবহার করা যেতে পারে। মশার বিস্তার রোধে আগে যে স্প্রে ব্যবহার হত তার কার্যকারিতা সীমিত। হাত পা ঢাকা পোষাক বা মশারীর ব্যবহার মশার কামড় থেকে বাঁচাতে পারে।

রোগ প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিন তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। কিছুটা সাফল্য মিললেও, এখনও নিরাপদ ও সস্তা ভ্যাকসিন আবিস্কৃত হয় নি।

সবশেষে বলতে হবে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় রোগের দমন সম্ভব নয়। আমাদের সচেতন হতে হবে চারপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ব্যক্তিগত সর্তকতাও জরুরী। আর ডেঙ্গু হওয়া মানেই ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু রোগ আপনা থেকেই সেরে যায়।

প্রথমেই আমরা পরেশবাবুর ছেলের কথা জেনেছিলাম। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু একেবারে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথম কয়েকদিনের জ্বরের রোগীকে তিনি ডেঙ্গু হয়েছে বলেন নি বরং প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করিয়ে রোগাক্রমণের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য শারীরিক লক্ষণ দেখেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। আর অযথা উদ্বিগ্ন না হয়ে, বাড়ীতে উপযুক্ত চিকিৎসার যে নিদান তিনি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক। অধিকাংশ আক্রান্ত সহজেই সেরে ওঠেন। তবে মনে রাখতে হবে জ্বর তিন চারদিনের মধ্যে না ছাড়লে ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়াটা জরুরী। তিনিই ঠিক করবেন ভর্তির প্রয়োজন আছে কিনা।

মোদি কেয়ার বা নমো কেয়ারের ঘোষণা

গৌতম মৃধা

■ **নমো কেয়ারের পশ্চাতপট : জাতীয় স্বাস্থ্য :**

- ৩২% গ্রামের মানুষকে পাঁচ কি.মি.র বেশী যেতে হয় সরকারি উপ বা প্রাথমিক অথবা কমুনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিতে
- এক হাজার জনসংখ্যায়স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী 'আশা' কর্মীর ৫০% পদ শূন্য
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খাতা কলমে ১২% চিকিৎসকের পদ শূন্য; কার্যত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের দেখা মেলে না।
- দেশে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র (সাবসেন্টার) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের (পি.এইচ.সি.) সংখ্যা সরকারি হিসাবে যথাক্রমে দেড় লক্ষ এবং ২৫,০০০ যদিও বাস্তবে অনেক গুলিই অস্তিত্বহীন কিংবা খন্ডহর হয়ে পড়ে আছে।

- দেশে কমুনিটি বা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (সি.এইচ.সি.) এবং মহকুমা বা জেলা হাসপাতালের সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫০০ ও ৬০০-র কাছাকাছি। খাতাকলমেই চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদ শূন্য যথাক্রমে ১২% ও ৮১%

- গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালে ভর্তির হার প্রতি বছরে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ১৯৯৬ তে ছিল ১৩, বেড়ে ২০০৪ এ হল ২৩ এবং ২০১৪ তে ৩৫; অথচ গ্রামীন সরকারি হাসপাতালে ভর্তির হার কমে গেল, ১৯৯৬ তে ৪৩%, ২০০৪ ৩৮% এবং ২০১৪ তে ৩২%
- ৮৬% গ্রামে বসবাসকারী ও ৮২% শহরে বসবাসকারী ভারতীয়র কোন ধরনের স্বাস্থ্যবীমা বা স্বাস্থ্যপ্রকল্পের সদস্য পদ নেই।
- চিকিৎসায় ক্রমাগত খরচ বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর ছয় কোটি ৩০ লক্ষ ভারতীয় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।
- স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচকে ১৯৫ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৫৪, প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপালেরও পেছনে।
- স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বরাদ্দে ভারত সবচাইতে পেছিয়ে, জিডিপি-র মাত্র ১.১৫%, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮%, চীনে ৬%, ফিলিপিনসে ৪.৭%
- সরকারি হিসাবেই ভারতে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা :প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ০.৭; চিকিৎসকের সংখ্যা: প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ০.৬; সেবিকার সংখ্যা : প্রতি আড়াই হাজার জনসংখ্যায় ১জন; ৪৭২ টি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক শিক্ষকের পদশূন্য ৪০%, বছরে প্রয়োজন সাড়ে ছ কোটি অস্ত্রপচার, হয় সেখানে আড়াই কোটি
- পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশী, ৭০ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয় অসুস্থতার কারণে (ডি.এ.এল. ওয়াই)। এর মধ্যে ৫৫% অসংক্রামক রোগ, ৩৩% সংক্রামক রোগ, প্রসূতি ও নবজাতকের সমস্যা, অপুষ্টিজনিত কারণে এবং ১২% দুর্ঘটনা, চোট-আঘাতের কারণে।
- হৃদপিন্ডের অসুখ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের চিকিৎসার কারণে গত দশ বছরে প্রায় ২৩৭,০০ কোটি ডলার খরচ হয়েছে। যা ২০৩০ এ বেড়ে দাঁড়াবে ০৬.২ ট্রিলিয়ন ডলার
- ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বছরে জনপ্রতি বরাদ্দ মাত্র ৫৮ ডলার (২০১৭) যেখানে মালয়েশিয়ায় ২১৮ ডলার, চীনে ৩২২ ডলার, তাইল্যান্ডে ২৪৭ ডলার।
- সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগ, উভয় কারণে মৃত্যুতে ভারত একদম প্রথম সারিতে। এক লক্ষ জনসংখ্যায় যথাক্রমে ২৫৩ ও ৬৮২
- এছাড়াও ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বেশী সংক্রামক ও মারণঘাতী অসংক্রামক রোগের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ভারত, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুন গুনিয়া, জাপানী এনকেফেলাইটিস, এইচ.আই.ভি.-এইডস্, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ ও হৃদপিন্ডের অসুখ, স্ট্রোক, ছানি, গ্লুকোমা, অন্ধত্ব, মানসিক রোগ, ক্যানসার প্রভৃতি অসুখেরও রাজধানী।
- গত দশ বছরে হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ বেড়েছে ১৭.৫% এবং রোগী পিছু খরচ বেড়েছে ১৬০%
- ভারতে স্বাস্থ্য বীমার ব্যবসা বাড়ছে বছরে ১৮-২৪%

■ মোদি কেয়ার বা নমো কেয়ারের ঘোষণা :

১৯১৪ এ সারা জাগিয়ে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর তখত্ দখল করার পর থেকে অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একটিও না রাখতে পারা, হিসাবের কারচুপি করেও জিডিপি তলানিতে ঠেকা, তার উপর নানারকম ফিসকাল ডেফিসিট, ক্ষরা, কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থা, ঋণগ্রস্ত আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলা, বিমুদ্রাকরনের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতির রক্তশূন্যতা, জিএসটি লাগুর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও অসংগঠিত শিল্প ও ব্যবসায় বিপর্যয়, এছাড়াও পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতা, দলের মধ্যেই অসন্তোষ, সাম্প্রতিক নির্বাচন গুলিতে জনবিক্ষোভের ছাপ, যখন লোকসভা

নির্বাচন পূর্ব বছরে মোদি ও তার কোর গ্রুপকে চিন্তায় ফেলেছিল তখন ২০১৮ -র একীকৃত সাধারণ ও রেল বাজেটে জনমোহিনীর ছাপ ফেলে হাওয়া ঘোরানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল।

১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সাংসদের যৌথ অধিবেশনে ২০১৮-২০১৯ বর্ষের বাজেট পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলি ঘোষণা করলেন যে '২০২২-র মধ্যে নতুন ভারত' গড়তে সংসদে এমন এক ঐতিহাসিক বিষয় পেশ করা হচ্ছে যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা ও আশা-আকাঙ্খাগুলি মিটিয়ে দেবে। তার বাজেট ভাষণের মধ্যে ৪১ মিনিট ধরে তিনি 'ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন স্কীম (এন.এইচ. পি.এস.) বা মোদী কেয়ারের গুণ কীর্তন করলেন। সরকারি বেঞ্চের হর্ষধ্বনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদির জোরালো তালির মধ্যে তিনি জানালেন এটি বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ সরকারি অর্থপুষ্ট স্বাস্থ্য

পরিষেবার প্রকল্প যার মাধ্যমে ১০ কোটি দরিদ্র ভারতীয় পরিবার এবং ৫০ কোটি গরীব দেশবাসী বছরে ৫ লক্ষ টাকার হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ অর্জন করবে। ভারত অর্জন করবে 'ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার'। এতদিন নরেন্দ্র মোদির 'আধার লিঙ্কিং', 'জনধন যোজনা', 'বিমুদ্রাকরণ', 'পহাল', 'স্বচ্ছ ভারত', 'ডিজিটাল স্বাক্ষরতা', 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা,' 'সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা,' 'জি এস টি' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকল্পের কথা শুনেছেন, এবার তার সাথে যুক্ত হল 'আয়ুস্মান ভারত যোজনা' ও তার অঙ্গ হিসাবে এন.এইচ.পি.এস। অরুন জেটলির ভাষায় মোদিকেয়ার , আর অমিত শাহের কথায় নমো কেয়ার।

■ মোদি কেয়ারের অভ্যন্তরে :

অদ্ভুতভাবে যে মোদিকেয়ার বা নমো কেয়ার অর্থাৎ এন.এইচ.পি.এস. ও তার মূল প্রকল্প 'আয়ুস্মান ভারত যোজনা' নিয়ে এত প্রশংসা ও প্রচার করা হচ্ছে বাজেটে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তো দূরের কথা, কার্যত কিছুই বলা হল না। পরে নাকি কোন বিশেষ দিনে বলা হবে। আরও অদ্ভুত যে বাজেটে এর জন্য বরাদ্দ সেভাবে রাখাই হয় নি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ভাষায় বাজেটে ঘোষনা ও বাজেটের কাগজের মধ্যে অঙ্কের ব্যাপক গরমিল আছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি.চিদাম্বরম বলেছেন এই খাতে বাজেটে কোন অর্থ সংস্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন মোদি সরকারের এটি আরেকটি ধোঁকা। অন্য বিরোধিরা বলেছেন এটি মোদির আরেকটি জুমলা বা লোক ঠকানো কারবার।

নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের বক্তব্য যে দেশের নাগরিকদের খুব কম খরচে বুনিয়াদী স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয় যদি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীরা ঠিকমত তাদের কাজটা করেন। পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ডা. কে. এস. রেড্ডি বলেছেন যে যা বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপ্রতুল এবং সরকার যে বিরাট মাপে কভারেজ দিচ্ছেন তাতে বিভিন্ন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলি যুক্ত না করতে পারলে সম্ভব নয়। মেদান্ত মেডিসিটির চেয়ারম্যান ডা: নরেশ ট্রেহান বলেছেন যে এই জাতীয় প্রকল্পের সাথে রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য নীতিকে যুক্ত করতে হবে এবং ক্রমশ উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গরীব ও অক্ষমদের জন্য প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্থান রাখতে হবে। মধ্যবিত্ত, যাদের পক্ষে প্রাইমারি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ সম্ভব, তাদের সেকেন্ডরি ও টারসিয়ারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্থান রাখা।

ধনীরা বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করবেন। সমগ্র পরিষেবায় ব্যয় সঙ্কোচনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া এনজিও, ব্যক্তিগত সংস্থাগুলির সাহায্য গ্রহণও প্রয়োজন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক 'আশা' কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে কাজে লাগাতে হবে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ২ ফেব্রুয়ারী প্রেসমিটে জানিয়েছেন এটি স্বাস্থ্যবীমার থেকে অনেক বড় বিষয়। এছাড়াও অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব প্রীতি সুদান, নীতি আয়োগের সিই ও অমিতাভ কান্ত্ ও নীতি আয়োগ সদস্য ডা: বিনোদ কুমার পাল; শ্রীকান্ত্ এই প্রকল্পকে 'গেম চেঞ্জার' অভিহিত করেছেন। এই প্রকল্পের অন্যতম সমর্থক নারায়ানা হেলথ-র চেয়ারম্যান ডা: দেবী শেঠি বলেছেন যে এই প্রথম সরকার স্বীকৃতি দিল। এই মানুষগুলির সেই অর্থ নেই যা দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করা সম্ভব। বিপিএল দিয়ে এদের ঠিকমত সংজ্ঞায়িতও করা যায় না। এছাড়া উত্তর ভারতসহ অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত হাসপাতালও নেই। এর ফলে মানুষের অনেক সুবিধা হবে।

■ 'এনএইচ.পি.এস' সম্পর্কে এখনবধি যতটুকু জানা যাচ্ছে :

'আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পে'র দুটি অংশ থাকবে। (ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ফাউন্ডেশন গঠন ও শক্তিশালী করা, (খ) অভাবী রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় আর্থিক সহযোগ।

প্রতি পাঁচ হাজার জনসংখ্যার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে 'ওয়েলনেস সেন্টার' হিসাবে রূপান্তরিত করা হবে যেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়াও বিভিন্ন রোগের স্ক্রীনিং এমনকি ক্যানসারের স্ক্রীনিং,মানসিক ও প্রবীণদের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে টেলি মেডিসিন ব্যবস্থা। আয়ুশ ও গ্রামীন চিকিৎসকদের ব্রীজ কোর্স দিয়ে ওখানে বসানো হবে।

এন.এইচ. পি.এসের কাজ হবে গরীব পরিবারগুলির হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসার খরচ জোগানো। এখানে দরিদ্র নির্ণয়ের মাপকাঠি হবে 'সোশাল ইকনমিক কাস্ট সেনসাস ২০১১'। প্রক্রিয়াটি হবে ক্যাশলেস, পেপারলেস ও পোর্টেবেল (ডিজিটাল)। যেহেতু স্বাস্থ্য মূলত রাজ্যের বিষয় তাই ব্যয়ভারের ৬০% কেন্দ্র দিলেও ৪০% রাজ্যকে দিতে হবে। এটি কার্যকরি করার জন্য 'ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' গঠন করা হবে। রাজ্যগুলিকে তাদের অংশিদারত্বের অপশন দিতে হবে। এর মধ্যে থেকে : (ক) রাজ্যকে মধ্যবর্তী বীমা সংস্থা স্থির করে দিতে হবে যেখানে উপভোক্তার বীমার প্রিমিয়াম রাজ্য দেবে, (খ) রাজ্য একটি ট্রাস্ট গঠন করবে যা এই প্রক্রিয়াটা পরিচালনা করবে এবং কেন্দ্র এই ট্রাস্টকে অর্থ দেবে। হাসপাতালগুলি বিপিএল তালিকাভুক্ত রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে ট্রাস্টের কাছ থেকে খরচ নেবেন।

রাজ্যগুলির এত ভূমিকা থাকবে অথচ রাজ্যগুলি জানেই না। সরকারি হিসাবে প্রাথমিকভাবে প্রতি পরিবারের বার্ষিক বীমা কিস্তি

লাগবে গড়ে এক হাজার থেকে বারোশো টাকা, আর সেই হিসাবে মোট লাগবে ১০ থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা। এবং এই প্রকল্পের জন্য যথারীতি আধার-সংযুক্তিকরণের কাজটিও করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে এক বৃহৎ তথ্য ভাণ্ডার, উপভোক্তাদের তালিকা, পরিষেবাদায়ী হাসপাতালগুলিকে তালিকাভুক্ত করা, অন্যান্য পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা।

■ মোদি কেয়ারের হেঁয়ালি :

বহু ঘোষিত 'ফসল বীমা যোজনা'র পর্বতের মূষিকপ্রসব সম্পর্কে কৃষকেরা ওয়াকিবহাল। অন্যদিকে বেসরকারি ও বিদেশী বীমা কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা সুযোগের অপেক্ষায়। খরচা, ঝুঁকি, মুনাফার হার নিয়ে হিসেব করতে ব্যস্ত। নীতি আয়োগ সূত্রে জানা যাচ্ছে তারা জনপ্রতি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবীমা ধরে, গড় পরিবারভিত্তিক বীমার বার্ষিক কিস্তি হাজার থেকে বারোশো টাকা ধরে দশ কোটি পরিবারের জন্য বার্ষিক ১২,০০০ কোটি টাকার সংস্থানের সুপারিশ করেছে। এরপর কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০ : ৪০ হারে খরচ করলে কেন্দ্রের দায় থাকবে ৭,২০০ কোটি টাকা এক বছরের জন্য বরাদ্দ করা। এই ২০১৮-'১৯ কেন্দ্রীয় বাজেটে ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দে কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান বাজারে বার্ষিক জনপ্রতি পাঁচ লক্ষ টাকা স্বাস্থ্যবীমার জন্য অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তির চিকিৎসার জন্য গড়ে পাঁচজনের একটি পরিবারকে বছরে স্বাস্থ্যবীমার কিস্তি দিতে হয় ১২,০০০ টাকা থেকে ২৪,০০০ টাকা। জি এস টির কারণে তা আরও বাড়বে। সেই হিসাবে কিন্তু বছরে লাগবে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা। নীতি আয়োগ যে হাজার-বারোশো টাকার কিস্তির কথা বলেছেন তা অবাস্তব। আর সমস্ত কিছুর স্বাস্থ্য বীমা (Comprehensive Health Insurance) ধরলে তো বার্ষিক কিস্তি ৫০ হাজার টাকায় পৌঁছে যাবে।

এমনিতেই সরকার আর্থিক সংকটে ভুগছে; যেখানে জিডিপি বাড়ছে না; ক্রমাগত ফিসকাল ও এক্সাইজ ডেফিসিট বাড়ছে; ফসল, সার, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুতে ব্যাপক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে, এর উপর ৫৫ হাজার কোটি টাকার এম জি এন আর ই জি এ বা ১৩ হাজার কোটি টাকার ফসল বীমা যোজনার মত প্রকল্পগুলি আছে সেখানে দশ কোটি পরিবারের জন্য তাদের হিসাবেই বছরে হাজার-বারোশো টাকা করে বরাদ্দ আদৌ বাস্তবোচিত কি?

যেখানে কেন্দ্র সরকারের ফ্ল্যাগ শিপ স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনার (আর.এস.বি.ওয়াই)', যাতে প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকের বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবীমা রয়েছে, ব্যাপক লুঠতরাজ আত্মসাতের পরও বরাদ্দ ৩০,০০০ কোটি টাকার বীমা ১০% ও কার্যকর হয়নি সেখানে এই নতুন ও আরও অনেক বড় প্রকল্প এত বড় এতরকম সমস্যাসঙ্কুল দেশে কিভাবে কার্যকরী হবে বিরাট প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

এবার আসবে মোদিকেয়ারের কভারেজ কেবল হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত খরচের বীমা হিসাবে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে ভারতের বিপুল সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোয় তো নিঃখরচাতেই চিকিৎসা চলে। সেই কাঠামোকে শক্তিশালী করলে তো সাধারণ মানুষ আরও ভাল চিকিৎসা পেত। তাহলে কি জনগণের কর দেওয়া এত পরিমাণ টাকা বেসরকারি চিকিৎসাক্ষেত্র ও বেসরকারি বীমা কোম্পানীগুলিকে পরিপুষ্ট করতে এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণকে সম্পূর্ণ করতে?

এছাড়াও প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, প্রিভেনটিভ ও প্রোমোটিভ কেয়ার, প্রাইমারি অ্যাণ্ড বেসিক হেলথ কেয়ার যার মধ্যে গর্ভবতী মা, প্রসূতি, শিশু, ১৫ বছর অবধি বালক-বালিকার যাবতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও টীকা সংক্রান্ত বিষয় সবকিছুই এই মোদি বা নমো কেয়ার থেকে বাদ পড়ে গেছে। এগুলি বাদ দিয়ে কি কোন দেশ বা সমাজে প্রকৃত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে?

বেসরকারি বীমা সংস্থা ও টিপিএগুলির সূত্রে জানা যাচ্ছে এখন তাদের পৌষ মাস, ব্যবসা প্রতি বছর ১৮-২৪% লাফিয়ে বাড়ছে। এরপর আসবে দুর্নীতির প্রশ্ন। প্রচলিত সরকারি স্বাস্থ্যবীমার পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৫%-ই ভুয়ো। তাহলে এই নতুন অতি বৃহৎ স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক-আমলা-চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্য মাফিয়াদের যোগসাজশে কত কি যে করবে!

তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সরকারের এই ধরনের নির্বাচনী গিমিক সর্বস্ব বিশাল অপচয় থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। জোর দেওয়া উচিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর। বীমাগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা, উপভোক্তা ও বীমাসংস্থার পক্ষে কার্যকরী চার্জ, নজরদাড়ির উপর জোর দেওয়া উচিত। উচিত অতীতের থেকে শিক্ষা নিতে। প্রচলিত কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যপ্রকল্প (সি জি এইচ, এস) ও কর্মীবর্গের রাষ্ট্রীয় বীমা প্রকল্প (ই.এস.আই.এস) কে শক্তিশালী করা উচিত। অন্ধ্র সরকারের 'আরোগশ্রী', মহারাষ্ট্র সররারের 'জীবনদায়ী যোজনা', তামিল নাড়ু সরকারের 'মুখ্যমন্ত্রী সার্বিক স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্প', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'স্বাস্থ্যশ্রী' হরেকরকম সরকারি স্বাস্থ্যবীমার মধ্যে একটা তালমিল আনা।

[সৌজন্য : সংসদ নিউজ, সেভেন × টোয়েন্টি ফোর, আজতক, ইন্ডিয়া টুডে, নীতি আয়োগ কমিউনিক]

প্লাস্টিক বোতলের পানীয় জলে মাইক্রোপ্লাসটিকের দূষণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক সংস্থা ওরব মেডিয়া নয়টি দেশের ১৯ টি অঞ্চল থেকে ১১টি নামী ব্র্যান্ডের ২৫০ টি প্লাস্টিকের পানীয় জলের বোতল পরীক্ষা করে ২৩৩ টি বোতলে (৯৩%) মাইক্রোপ্লাস্টিক, পলিপ্রপিলিন,নায়লন, পলিথিলিন, টেরেপথ্যলেট প্রভৃতি দূষিত পদার্থের উপস্থিতি থেকে জোরালো অবস্থানের প্রমাণ পেয়েছেন।

অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেক্শন (ARI)

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ মানবদেহের সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য একটি রোগ। অনেক প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই এটি যেমন জরা, জীর্ণতা ও অক্ষমতার কারন, তেমনই ছোটো বাচ্চা এবং বয়স্কদের মৃত্যুর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এ.আর.আই রোগটিতে নাক (নাসারন্ধ্র) থেকে অ্যালভিওলাস পর্যন্ত যেকোনো অংশের প্রদাহ হতে পারে এবং অসংখ্য সমস্যা ও লক্ষণ এর সমন্বয়ে রোগটি বিস্তরভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। সাধারণ কাশি, ফ্যারিংস (Pharynx) এবং কানের সংক্রমণ হলে তাকে শ্বাসতন্ত্রের উর্দ্ধাংশের সংক্রমণ বলা হয়, আবার এপিগ্লটিস, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল এগুলির প্রদাহ এবং নিউমোনিয়া হলে তাকে শ্বাসতন্ত্রের নিম্নাংশের সংক্রমণ বলা হয়।

■ **রোগের লক্ষণ** গুলি হলো নাক থেকে জল গড়িয়ে পড়া, কাশি, গলা খুশখুশানি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং কানের সমস্যা। গুরুতর ক্ষেত্রে খেতে এবং পান করতে- অক্ষমতা, খিঁচুনি কিংবা রোগীকে ঘোরে থাকতেও দেখা যেতে পারে।

■ **সমস্যার উপস্থাপন ঃ**

বিশ্বজুড়ে প্রত্যেক বছর ৩৯ লক্ষ শিশুমৃত্যুর কারণ হিসেবে এ.আর.আই দায়ী যার অধিকাংশই হল নিউমোনিয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রবল অপুষ্টির হার, জন্মের সময় কম ওজন, ঘরের ভিতরে বায়ুদূষণ ইত্যাদি কারণে এই রোগীটির প্রকোপ বেশী। প্রত্যেক বছরে প্রতিটি শিশুর জন্য প্রায় ৫ বার এই মারণব্যাধির প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।

২০১৪ সালে ভারতবর্ষে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ রোগের রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং ২৯৩২ টি মৃত্যু হয়েছে এ.আর.আই এর কারণে যার মধ্যে ২৬৬১ টি মৃত্যুর জন্য নিউমোনিয়া দায়ী।

ARI এর কারণ হিসেবে ব্যাপক-বিস্তারে জীবাণুদের কথা বলা যায় যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য অণুজীব-ও বর্তমান। গুরুতর নিউমোনিয়া এবং তার জন্য হওয়া মৃত্যুর অন্যতম কারণ হলো স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-টাইপ বি (Hib হিব ব্যাকটেরিয়া), হুপিং কাফ্ এর ব্যাকটেরিয়া (Bacillus Partusis), ডিপথেরিয়ার ব্যাকটেরিয়া (Corneybacterium diptheri)। মিসল্স্ ভাইরাস এর জন্য হওয়া এ.আর.আই-ও শিশুমৃত্যুর গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

■ **আশঙ্কাজনক কারণগুলি** — (Risk Factor) হল ছোটো বাচ্চা, অপুষ্ট বাচ্চা, অপুষ্টি, জন্মের সময় কম ওজন, ঘরের ভেতর বায়ুদূষণ, বাবা মায়ের ধুমপানের অভ্যাস, আর্থসামাজিক-দারিদ্র, ডে কেয়ার সেন্টারে আসা বাচ্চা এবং শহুরে ঘিঞ্জি এলাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

■ **সংক্রমণ মাধ্যম ঃ**

বায়ুবাহিত এই রোগটি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়াতে পারে।

■ **এ.আর.আই প্রতিরোধ এবং প্রতিকার ঃ**

আশঙ্কাজনক কারণগুলির উপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ করে এ.আর.আই এর প্রকোপ কমানো যেতে পারে, যেমন— পরিবেশ ও বাসস্থানের উন্নয়ন, শিশুদের পুষ্টিবর্ধন, ঘরে-বাইরে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, উন্নততর জননী ও শিশু স্বাস্থ্য পরিসেবা, টীকাকরণ ইত্যাদি।

শিশুকে আগে থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, আগে থেকে রোগ বুঝতে পারা এবং চিকিৎসা পরিসেবার দ্বারস্থ হওয়ার জন্য মায়েদের শিক্ষিত করতে হবে।

জাতীয় যে প্রোগ্রামটি এই রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আছে, সেই প্রোগ্রামটি আগে থেকে রোগনির্ণয় এর উপর আধারিত। কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা রোগনির্ণয় সম্ভব। প্যারামেডিকেল কর্মীরাও তা করতে পারেন এবং প্রান্তিক অঞ্চলেও নিরাময় পরিষেবা শুরু করা যেতে পারে।

■ **প্রতিরোধের জন্য টীকাকরণ ঃ**

ডিপথেরিয়া, হুপিং কাফ, মিসল্স্, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি টাইপ বি এবং নিউমোকক্কাল সংক্রমণ এর বিরুদ্ধে টীকা বর্তমান। নিউমোকক্কাল ভ্যাক্সিন ছাড়া সবগুলি ইউনিভার্সাল ইমুনাইজেশন প্রোগ্রাম এর তত্ত্বাবধানে শিশুদের দেওয়া হয়ে থাকে।

■ **GAPPD : জি. এ. পি. পি. ডি**

নিউমোনিয়া এবং ডায়রিয়ার জন্য হওয়া মৃত্যু কমাতে একটি সুসংহত শক্তিশালী পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে এই সংস্থাটির দ্বারা। জটিল চিকিৎসা পরিষেবা এবং জটিল প্রয়োগপদ্ধতি কে একত্রিত করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা, শিশুদের রোগপ্রতিরোধের জন্য প্রচলিত বা পরিচিত- কর্মপদ্ধতির অভ্যাস বাড়িয়ে তোলা, প্রতিটি শিশুর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাময়দায়ক চিকিৎসা-পরিষেবার উপর অধিকার সুনিশ্চিত করা এই সংস্থাটির উদ্দেশ্যবিধির মধ্যে পড়ছে।

■ **ভারতে মুক্ত সংবাদজগতের উপর আক্রমণ :**

১৯১৭-এ ১৪জন সাংবাদিক জেলে, তার মধ্যে ১২ জন 'অপারেশন গ্রীন হান্ট' সামরিক অভিযান চলা ছত্তিশগড়ে। ১২ জন সাংবাদিক খুন যা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধদীর্ণ ইরাক (৯), আফগানিস্তান (৮), ইয়েমেন (৮) ও পাকিস্তানের (৭) চাইতে বেশী। ২০১৫-'১৭ তিনবছরে নথিভুক্ত আক্রমণ ১৪২।

জরায়ুর ক্যানসার প্রতিরোধী টীকা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

HPV এর অর্থ মানবদেহের প্যাপিলোমা জীবাণু। ১০০ টা সেরোটাইপ জীবানুর ১৫ থেকে ২০ টারই নিজস্ব ক্যানসার আক্রান্তের ক্ষমতা থাকে। এগুলো মহিলাদের জরায়ু, মলদ্বার, যোনিপথ এবং যোনিমুখে ক্যানসার ঘটাবার কারণ। এগুলো পুরুষদেরও যৌনাঙ্গে ক্যানসার ঘটাবার কারণ। এছাড়া এটা পুরুষ ও মহিলাদের গলা ও মলদ্বারের ক্যানসারের জন্যও দায়ি। বিশ্বব্যাপি এইচ. পি. ভি. টাইপ ১৬ এবং ১৮ শতকরা ৭০ ভাগই জরায়ুর ক্যানসারের ভার বহন করে থাকে। অন্তরঙ্গ সহবাস এবং মুখ ও মলদ্বার দিয়ে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমেও এটি ছড়িয়ে পরে। যাদের মধ্যে এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ রয়েছে, বিশেষ করে তাদের। যদি ধূমপায়ী হন বা গর্ভনিরোধক পিল যথেষ্ট ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যে এইচ. পি. ভাইরাস-এ আক্রান্ত হবার ভয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

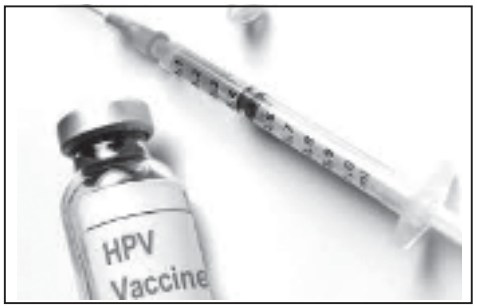

■ ভারতের অবস্থা :

জরায়ুর ক্যানসার প্রতি বছর ৭০,০০০ মহিলার মৃত্যুর কারণ। মাত্র শতকরা ৪১ ভাগ মহিলা উন্নতিশীল দেশগুলিতে মেডিক্যাল চিকিৎসা পেয়ে থাকে। যদিও প্রাথমিকভাবে স্ক্রীনিং-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে অনেক মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা লাগু করা মুশকিল। সুতরাং টীকার মাধমে এইচ. পি. ভি. রোগ প্রতিরোধ বিশেষ করে কার্যকর হবে ভারতের মত উন্নতিশীল দেশগুলিতে, সারভাইকাল স্ক্রীনিং-এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করার চেয়ে।

■ অনুমোদন :

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়াও এইচ.পি. টীকাকে সার্বজনীন টীকাকরণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। টীকাকরণের জাতীয় প্রযুক্তি পরামর্শ সংস্থাও (এন.টি.এ.জি.আই) এইচ.পি. টীকাকে ভারতের জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে।

■ টীকা প্রসঙ্গে :

বিশ্বে তিন ধরনের এইচ. পি. ভি. টীকা পাওয়া যায়। যথা, Gardasil, Gardasil 9 এবং Cervarix । যে সমস্ত টীকা বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি সাধারণত টাইপ ২, ৪ অথবা ৯ এইচ. পি. ভি. সংক্রমণ-এর জন্য প্রযোজ্য। সকল টীকাই অন্তত এইচ.পি.ভি. ১৬ এবং ১৮-র থেকে রক্ষা করে যাতে না জরায়ু ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ভারতে কেবলমাত্র দুটি টীকা পাওয়া যায়। Gardasil এবং Cervarix। Cervarix হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট টীকা যেটা এইচ.পি.ভি. ১৬ এবং ১৮ কে প্রতিরোধ করে, আর Gardasil হচ্ছে কোয়াট্রিভ্যালেন্ট টীকা যেটা এইচ.পি.ভি ১৬, ১৮ এবং ১১ কে প্রতিরোধ করে।

■ টীকা দানের সময় :

সাধারণত টীকাগুলি নয় থেকে তের বছরের মেয়েদের দেওয়া হয় তাদের যৌন ক্ষমতা অর্জনের পূর্বে। দুটি ডোজ দেওয়া হয় ছয় মাস অন্তর পর। টীকাগুলি পাঁচ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত রোগ প্রতিরোধ করে। যারা টীকা নেবার পূর্বেই আক্রান্ত হন তখন টীকা কোনো কাজ করেনা।

■ কার্যকারিতা :

এইচ. পি.ভি টীকা এইচ.পি. জীবাণুর সংক্রমনকে ভালোভাবেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম যদি না আগের থেকে রোগ ছড়িয়ে থাকে অর্থাৎ যদি না যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়ে থাকে। সমস্ত জরায়ু ক্যানসারের তিনভাগের দুই ভাগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

■ নিরাপত্তা :

এইচ.পি.ভি. টীকা খুবই নিরাপদ। জাতীয় ক্যানসার সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে টীকাকরনের মাধ্যমে জরায়ু ক্যানসারের দরুন পৃথিবীতে মৃত্যুর সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ কমানো যায়। এছাড়া এই টীকাকরণের ফলে রোগির ডাক্তারি পরিষেবা, বাইওপসি, ফলোআপ ও মাত্রাছাড়া প্যাপটেষ্ট ইত্যাদির জন্য হেলথকেয়ারের অতিরিক্ত খরচ ও মানসিক চিন্তারও উপসম হবে। চিকিৎসা সম্বন্ধে যাবতীয় নথিপত্র ও ড্রাগের বাজারে নিরাপত্তার বিষয়ে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে Gardasil এবং Cervarix vaccine গুলিকে নিরাপদ টীকা বলেই বলা হয়েছে।

■ বিতর্ক :

প্রথম এইচ.পি.ভি টীকা ২০০৬ সালে বাজারে এসেছে। ২০১৭ সালে বিশেষকরে মেয়েদের জন্য ৭১টি দেশ এই টীকাকরণ কর্মসূচীতে যুক্ত হয়েছে।

ভারতে এটা ব্যবহারে অত্যাধিক দামের জন্য মতবিরোধ ছিল। এছাড়াও অভিযোগ ছিল সংক্রমণ হলে, এটা সেভাবে কাজ করে না। সাবটাইপ কিছু এইচ.পি.ভি.-এর ক্ষেত্রেও সঠিক কাজ করতো না। কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল, প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী দিন ছিলো না। এছাড়া এইচ.পি.ভি সংক্রমণ ছাড়াও একাধিক যৌনসঙ্গী, অত্যাধিক গর্ভনিরোধক পিল সেবন ও দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণে ও জরায়ু ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই প্রাথমিকভাবে স্ক্রীনিং-এর মাধ্যমে রোগ নির্ণয়কে টীকাকরণের চাইতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

যাই হোক, সমর্থকেরা এই টীকা চালু করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। বিশ্বে মেয়েদের ক্যানসার দ্রুত ছড়ানোর ক্ষেত্রে

জরায়ু ক্যানসার প্রথম দিকে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ভারতে এটা দ্বিতীয় স্থানে আছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে বছরে ১.৩২ লক্ষ রোগীর রোগ নির্ণয় হয় অন্তিম অবস্থায় এসে (ডব্লিউ.এইচ.ও. রিপোর্ট)। বিশ্বে ভারত জরায়ু ক্যানসারে মৃত্যুতেও তিন নম্বরে আছে। এই টীকা এখন নিরাপদ। রোগের চিকিৎসার থেকে রোগ নিবারণের খরচ অনেক কম। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের প্রথম দেশ যারা এই এইচ.পি.ভি. টীকাকরণ স্কুলের মাধ্যমেই শুরু করেছে। বর্তমানে তাই জরায়ু ক্যানসারের আক্রমণ কমছে। ভারতে যৌনরোগ সতর্কতার জ্ঞান ও বৃহৎ ক্ষেত্রে রুটিন স্ক্রিনিং-এর প্রভাব প্রভৃতি দরকারি বিষয়ের উপর এইচ.পি.ভি. টীকার প্রয়োগ নির্ভর করবে। এছাড়া এমন কোনো পরিস্কার প্রমাণ নেই যা এইচ. পি. ভি. সংক্রমণকে কন্ডোমের ব্যবহারের মাধ্যমে আটকানো যায়।

২০১০ এ ভারতে এইচ.পি.ভি. টীকার ট্রায়াল হয়েছিল। পাইলট টীকাকরণ কর্মসূচী ২০১৬ সালে দিল্লী ও পাঞ্জাব সরকার অনুষ্ঠিত করেছিলো, যেখানে ১১ থেকে ১৩ বছরের মেয়েদের টীকা দেওয়া হয়েছিলো। বাইভ্যালেন্ট সারভারিক্স টীকা দিল্লীতে দেওয়া হয়েছে যেখানে কোয়াড্রিভ্যালেন্ট গারডাসিল টীকা পাঞ্জাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র মতে ভারতে পাইলট কর্মসূচীতে ভালোই সারা পাওয়া গেছে। অতএব ভারতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এইচ.পি.ভি.ভ্যাকসিন চালু করা হবে। যদিও স্ক্রিনিং করে জরায়ু ক্যানসার নির্ণয়ও যথারীতি পাশাপাশি চলবে।

অক্টোবর বিপ্লব ও স্বাস্থ্য : একটি উপক্রমনিকা

অরুণ সিংহ

■ চিকিৎসক হিসেবে আমাদের প্রজন্মের কাছে অক্টোবর বিপ্লবের সার্থকতা কোথায়?

অক্টোবর বিপ্লব নিয়ে কোনো কথা উঠলে, একবিংশ শতকের চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশীদারী হিসেবে আমাদের একটা সহজ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। একশো বছর আগে একটা কিছু ঘটেছিল, আজ এতদিন পরে তাই নিয়ে কেন ভাবতে যাব আমরা? সেই ঘটনার কোনো তাৎপর্য এ যুগে নেই, এমনই শুনি চারদিকে, তাহলে? আমাদের নিজেদের সমস্যা কি কম? আমাদের রোগী আছে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে তাল রাখতে হয়, আর পরিবারকেও তো সময় দিতে হয়। এর মধ্যে আবার পুরোনো সেই ঘটনা নিয়ে ভাবতে যাব কেন আমরা?

আজকে বসে একশো বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যার রেশ পর্যন্ত কবেই চুকে-বুকে গেছে, সেটা নিয়ে সময় খরচ করা নেহাতই বিলাসিতা নয় কি? যারা এসব বিপ্লব-টিপ্লব নিয়ে এখনও ভাবছে, তাদের ইতিহাস খরচার খাতায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ এখনও খোয়াব দেখছে। ফুঃ, তারা জানেইনা বর্তমানকাল হল এমন একটা সময় যখন অতীতের অস্তিত্বের দাম নেই। বর্তমানকাল আমাদের ডাকছে। বাঁচো নিজের মতন, অন্যরা বাঁচুক যে যার মতো করে, ব্যস! উৎসব হোক, খানাপিনা, নতুন জামাকাপড়, উপভোগের আলো-ঝলকানি, শব্দ, আর প্রিয়সান্নিধ্য। আমরা পৌঁছে গেছি পৃথিবীর সম্ভাব্য স্বর্গে, তাই না? ইতিহাস? ধুর, গুলি মারো ইয়ার! তবে হ্যাঁ, অমন ভয়ানক সময়ে আমরা জন্মাইনি সেটা ভগবানের দয়া। আর জন্মাইনি যখন তখন ঐ সময় নিয়ে ভাবতে বয়েই গেছে।

কিন্তু সমস্ত ডাক্তারদের দুটো প্রশ্ন যুগ যুগ ধরেই তাড়া করে। প্রথম প্রশ্ন, কাকে চিকিৎসা করছে সে, ভিখারি না ভিআইপি, তার ওপরই কেন ডাক্তারের সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে, কেন তার চিকিৎসা-দক্ষতার ওপর নয়? দ্বিতীয়ত, কেন স্রেফ রোগ হলে সেই রোগ ধরে রোগীর চিকিৎসা করেই বেড়াব আমরা, কেন রোগকে আটকাতে, তাকে নিশ্চিহ্ন করা না হোক কমাতে, ডাক্তারের জ্ঞান থাকবে, কিন্তু কার্যকর ভূমিকা কেন থাকবে না? আমরা কি তবে সমাজের কয়েকটা ভাড়াটে হাত, যারা অন্যের মস্তিষ্কচালিত হয়েই চলে? আমাদের এত পরিশ্রম কি তবে সরাসরি বা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অন্য কারও সুবিধা করে দেবার আর লাভ জোগানোর কাজে লাগে? তাহলে বিজ্ঞান আর যুক্তির কথা বলেও আমরা কি কোথাও অন্ধ হয়ে আছি, একচক্ষু হরিণের মতো?আমরা কি তবে এক প্রশ্নহীন চিন্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া মানুষের ভিড়ের অংশমাত্র? বা, আমরা কি আদৌ মানুষ, কেননা গতানুগতিক পথকে প্রশ্ন করেই নিজের চলার পথ না বাছলে মনুষ্যত্বের কীই-বা অবশিষ্ট থাকে?

নোবেলজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, ‘‘আমার জীবন একেবারে বৃথাই গেল। প্রথম এশিয়ার মানুষ হিসেবে নোবেল প্রাইজ পেয়ে আমি ভেবেছিলাম এদেশে সত্যিকারের বিজ্ঞানচর্চা করার রাস্তা তৈরি করব, কিন্তু আমাদের দেশে শুধু অনুগতদের দলই তৈরি হয়, আর তা দিয়ে মুক্তির পথ খোঁজা বৃথা।’’

কেন এ ব্যাপারটা ঘটে? বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মালিকানা কিছু লোক বা গোষ্ঠীর হাতে, আর শেষ বিচারে তারাই ঠিক করে কীভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার হবে, আর বিজ্ঞান কোন পথে এগোবে। এই অবস্থা

চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীর মালিকের স্বার্থের পক্ষে বিনা প্রশ্নে দাঁড়ানোকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

একবার ভাবা যাক আপনি ডাক্তার, কিন্তু আপনি চিকিৎসা করেন শ্রমিক -কৃষকের, বিশেষ করে অদক্ষ শ্রমিকের, যাঁরা সমাজের নিম্নতম ধাপে আছেন। এঁরাই জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ। আপনি চিকিৎসা করেন যে শ্রেণির সেই শ্রেণির উদ্দেশও, এক কথায়: ''আমরা সবাই কাজ করি, আর আমরা সবাইকে খাওয়াই।'' যদিও এঁরাই সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করেন, এঁদের নিজেদের বাচ্চারা ক্ষুধায় ভোগে। এঁদের চিকিৎসা করলে সমাজ আপনাকে ডাক্তার হিসেবে নীচু নজরেই দেখবে। আপনি সমাজের চোখে একজন দরিদ্র ডাক্তার হিসেবে গণ্য হবেন, যদিও জ্ঞানের দিক থেকে আপনি মোটেই দরিদ্র নন।

এবার দ্বিতীয় ধাপ। আপনি হলেন ছোটো ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী, দোকানদার—এঁদের ডাক্তার। এঁদের সাধারণ বিবরণ হল : ''তোমাদের জন্যই অন্যরা খেতে পায়।'' এঁরা জনসংখ্যার শতকরা ১৫-২০ ভাগ। এবার সমাজ আপনাকে ডাক্তার হিসেবে গ্রহণযোগ্য ভাববে,কিন্তু আপনি এখনও শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের আসেন পাবেন না। এর ওপরে রয়েছে আরেকটা শ্রেণি— মিলিটারি, প্যারামিলিটারি, পুলিশ ইত্যাদি। তাঁদের সেবা করা ডাক্তার হলে আপনি হবেন সুবিধাভোগী। আর এই শ্রেণিগুলোর সাধারণ বিবরণ হল: ''আমরা তোমাদের হত্যা করতে পারি।'' এরও ওপরে আছে ধর্মগুরু, বড়ো কাগজের মালিক— সাংবাদিক, এঁদের সাধারণ বিবরণ হল : ''আমরা তোমাদের বোকা বানাই''। এদের ডাক্তার হতে পারলে আপনি বেশ ভালো অবস্থায় পৌঁছেছেন, কিন্তু এখনও উচ্চতম মার্গে যাননি। এর ওপরে পঞ্চম ধাপে আছে শাসকেরা, অর্থাৎ রাজনীতির উচ্চস্তরের লোক, এমপি, এমএলএ, রাজাগজারা। এঁদের সাধারণ বিবরণ হল : ''আমরা তোমাদের শাসন করি।'' এঁদেরও ওপরে কিন্তু আছেন উচ্চতম দল, পুঁজিপতি আর একচেটিয়া ব্যবসামালিক, যাঁদের সাধারণ বিবরণ হল : ''আমরা দেশ, পৃথিবী ও সব নীতির নিয়ন্ত্রণকর্তা।'' এঁদের চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারলে তবেই আপনি সেরা ডাক্তার আর সবথেকে বেশি সুবিধাভোগী।

শেষের দলটি, পুঁজিপতি আর একচেটিয়া ব্যাবসামালিক, সংখ্যায় দেশের শতকরা ১-৩ ভাগ মাত্র, কিন্তু এরাই রাজনীতিবিদ্, ধর্মগুরু , মিলিটারি, পুলিশ ইত্যাদির মাধ্যমে সরাসরি, আর পরোক্ষে বুদ্ধিজীবী আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মনোজগত দখল করে, দেশের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। এই ব্যবস্থার দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। টাকা নীচ থেকে ওপরে গিয়ে সঞ্চিত হয়, আর কাজের ভার ওপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে দরিদ্র হয় দরিদ্রতর, আর ধনী হয় আরও ধনী। ওপরের তলার এই লোকগুলোই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে, কোনদিক তার বিকাশ হবে সেটা ঠিক করে। সেটা করতে তারা কেবল সরাসরি ক্ষমতা আর টাকা ব্যবহার করে তা কিন্তু নয়। তারা বিজ্ঞানী থেকে চিন্তাবিদ, অর্থনীতিজ্ঞ থেকে চিকিৎসক, এদের সবাইকে ব্যবহার করে একই ধাঁচের চিন্তার একটা পরিমন্ডল তৈরি করে।

'অক্টোবর বিপ্লব' হল ঐ নীচের তলার শতকরা সত্তরজনকে এই পুরোনো ব্যবস্থার সাঁড়াশির থেকে মুক্ত করার চেষ্টা, যাতে আমাদেরও মুক্তি হয়। যাতে আমরা মুক্তভাবে রোগ দেখতে পারি, চিকিৎসাশাস্ত্রকে মুক্তভাবে মানুষের স্বার্থে প্রশ্ন করতে পারি, এমনকী মুক্ত হয়ে কবিতা লিখতে পারি, কথা বলতে পারি, আর আর্থিক মুক্তি অর্জন করতে পারি। পুরোনো রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, অক্টোবর মাস ছিল সেটা, তাই তার পুরোনো নাম 'অক্টোবর বিপ্লব'। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার তখনও রাশিয়ায় সংশোধিত হয়নি। মান্য ক্যালেন্ডার মতে সেই সময়টা ছিল নভেম্বর মাস, তাই একে নভেম্বর বিপ্লবও বলা হয়।

■ **অক্টোবর বিপ্লবের আগে ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ সালের রাশিয়া :** আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি পিছিয়ে গিয়ে যদি ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ সালের রাশিয়ার কথা ভাবি, দেখতে পাব যে তখন একদিকে বালটিক সাগর আর অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে এই বিশাল জারশাসিত ভূখণ্ডে জনসংখ্যা ছিল বারো কোটি ছয় লক্ষ। তার মধ্যে বিভিন্ন জাতি উপজাতির সংখ্যা ছিল ১৯৪। জার দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রাজত্ব করতেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরই তাঁকে জার বা সম্রাটের পদে বসিয়েছেন।

কিন্তু রাশিয়াই ছিল গোটা ইওরোপের বড়ো দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র সত্যিকারের রাজতন্ত্রী দেশ। তা ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এক গ্রামপ্রধান দেশ, যেখানে ভারী শিল্প সবেমাত্র গড়ে উঠছিল। নিকোলাসের বাসনা ছিল তিনি সেনাদের নিয়ে যুদ্ধজয় করবেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে কেবলই হেরে যেতেন। বিশেষ করে জাপানের কাছে হার হজম করা বেশ কঠিন হয়েছিল। জার্মানি, ব্রিটেন বা আমেরিকার তুলনায় রাশিয়া ছিল অনেক পেছনে, কেননা সে সব দেশে ভারী শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। ফলে বিজ্ঞানের উন্নতির ফসল তারা ঘরে তুলেছিল; এটা চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রেও সত্যি ছিল।

ভ্লাদিমির লেনিন ছিলেন বড়োমাপের চিন্তানায়ক ও নেতা। ১৮৮৭ সালে তাঁর দাদাকে জারের বিচারব্যবস্থা মৃত্যুদণ্ড দেয়। লেনিন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন ও ১৮৯৩ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে এসে মার্কসবাদী দল 'রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' (আরএসডিএলপি)-র কেন্দ্রীয়স্তরের নেতা হয়ে ওঠেন। ১৯০৩ সালে আরএসডিএলপি-এর মতাদর্শগত বিভাজনের সময় লেনিন মুখ্য ভূমিকা নিলেন ও 'বলশেভিক' অর্থাৎ বৃহত্তর অংশটির নেতৃত্বে এলেন; অন্য অংশটি জুলিয়াস মার্তভের নেতৃত্বে মেনশেভিক বলে পরিচিত হল।

১৯০৫ সালের রাশিয়ান বিপ্লব ব্যর্থ হল, কিন্তু এতে জারের সাম্রাজ্যব্যাপী বিশাল রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল।

বিক্ষোভগুলোর মধ্যে বেশ বড়ো অংশ ছিল সরকারবিরোধী। এর মধ্যে ছিল শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন, আর সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ। এর ফলে সাংবিধানিক সংস্কার হলো আর দেশের ডুমা (সংসদ বা পার্লামেন্ট), বহুদলীয় ব্যবস্থা নিয়ে ১৯০৬ সালের রাশিয়ান সংবিধান কার্যকর হল।

■ ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল :
সেটা শেষ হয়েছিল ১১ নভেম্বর ১৯১৮। রাশিয়ার জন্য এই বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা। রাশিয়ায় এই একটি যুদ্ধেই যতজন মারা গিয়েছিলেন, অতীতের কোনো যুদ্ধে কোনো দেশেই ততজন মানুষ মারা যাননি। এর সঙ্গে যুদ্ধের খরচ জোগাতে গিয়ে রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরোধিতা করে বলেন, সৈন্যরা প্রকৃতপক্ষে সর্বহারা শ্রেণির সন্তান। তাদের এই খুনে যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়ে যার যার নিজের দেশের পুঁজিপতি অর্থনীতির দাস দেশনেতাদের দিকে বন্দুক ঘুরিয়ে ধরতে ডাক দেন লেনিন।

১৯১৭-র মার্চ মাসে পেট্রোগ্রাদ শহরে খাদ্যের অভাবে ধর্মঘট আর দাঙ্গা শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা ধর্মঘটিদের পক্ষে যোগ দেয়, আর ২৫ মার্চ ১৯১৭ তারিখে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বহু শতকের জারতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৯১৭-র মার্চ মাসে এই বিপ্লব সংঘটিত হলেও রাশিয়ান ক্যালেন্ডার যেহেতু জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের চাইতে আলাদা ছিল তাই তা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামেই পরিচিতি পায়। জারের কাছ থেকে রাজনৈতিক শক্তি হস্তান্তরিত হয় এক অপদার্থ সাময়িক (provisional) সরকার আর সৈনিক আর শ্রমিকদের সমিতিগুলোর 'সোভিয়েত' (সম্মেলন)-এর হাতে।

■ অক্টোবর বিপ্লব ও আন্দোলনের ফসল :
১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন ও অন্য কিছু বিপ্লবীরা জুরিখ (সুইজারল্যান্ড) থেকে প্রথমে ট্রেনে জার্মানি, সুইডেন, ফিনল্যান্ড পেরিয়ে, ফিনল্যান্ডের মধ্যেকার বরফজমা নদী ঘোড়ায় টানা স্লেজগাড়িতে পেরিয়ে, সেন্ট পিটার্সবার্গে ফেরেন। এর আটদিন পরে এই সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরটিই নতুন নামে পরিচিত হবে, পেট্রোগ্রাদ। ট্রেন ছাড়ার সময় লেনিন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক বন্ধুর কাছে বিদায় নেন এই বলে, ''আর তিন মাস পরে আমরা হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলব, কিংবা আমরা ক্ষমতা দখল করব।''

■ অক্টোবর বিপ্লব ১৯১৭ (তখনকার রাশিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে, আধুনিক ক্যালেন্ডারে এটাই নভেম্বর বিপ্লব) হল। বলশেভিকরা আলেক্সান্দার কেরেনস্কি-র নেতৃত্বধীন সাময়িক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করল, সেন্ট পিটার্সবার্গে জারের শীতকালীন প্রাসাদ শ্রমিক আর নাবিকরা দখল করল, আর তারপর নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে রাশিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী মস্কো দখল করল।

মার্চ ১৯১৮— পোলান্ড-রাশিয়ার সীমানার কাছে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শহরে রাশিয়া জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি আর অটোমান সাম্রাজ্য, এদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আসতে পারল। কিন্তু ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তির জন্য রাশিয়াকে বিপুল মূল্য দিতে হয়েছিল। জারের রাশিয়া সাম্রাজ্যের ১০ লক্ষ বর্গমাইল জমি, সেই সাম্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ (মোটামুটি সাড়ে পাঁচ কোটি), সাম্রাজ্যের মোট কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও লোহা আকরিক সঞ্চয়ের অর্ধেকেরও বেশি, এবং বড়ো শিল্পের একটা বিশাল অংশ রাশিয়ার হাত থেকে বেরিয়ে গেল। লেনিন খুব তিক্ততার সঙ্গে বললেন, এই চুক্তি হল রাশিয়ার পরাজয়, অপমান, অঙ্গচ্ছেদ ও দাসত্বস্বীকার। কিন্তু তিনি এও বললেন, যেকোনো মূল্যে যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চাই।

১৯১৮ সালের ২১ নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, এবং মিত্রপক্ষের হাতে জার্মানিপক্ষ পরাজিত হয়ে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করতে বাধ্য হল। তার ফলে ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হল। ভার্সাই-এর চুক্তি নামে খ্যাত এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে, জার্মানি ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তিতে পাওয়া সমস্ত সুবিধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

১৯১৮ থেকে ১৯২০ — রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ : কিন্তু জারের আমলের রাশিয়া সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্তটা জুড়ে গৃহযুদ্ধ চলল— একপক্ষে বলশেভিক বা লালরক্ষী, অন্যপক্ষে বলশেভিক-বিরোধী নানা ধরনের শ্বেতবাহিনী। উত্তর রাশিয়ায় ব্রিটিশ, ফরাসি আর আমেরিকান সৈন্যদল মুরমানস্ক এবং আর্চাঞ্জেল দখল করে রাখল ১৯১৯ সাল পর্যন্ত, আর পূর্বদিকে জাপানীরা ভ্লাদিভস্তক দখল করে রাখল ১৯২২ সাল পর্যন্ত।

লালরক্ষীদের লোকবল কম ছিল, আর তাদের ১৬-টি বিদেশি বাহিনী, তার ওপর দেশের বিরোধীদের শ্বেতবাহিনী, সবার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। জয় প্রায় অসম্ভব ছিল, কিন্তু ত্রৎস্কির নেতৃত্বে তারা জয়ী হল।

■ সমসাময়িক ইউরোপ ও রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর অবস্থা :
১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন কয়েক মাসও টেঁকেনি, ফরাসি সৈন্য জনতার প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছিল। তারপর রাশিয়ায় ক্ষমতা দখলের

সঙ্গে সঙ্গে পরপর কিছু বিপ্লব প্রচেষ্টা ঘটল। ফিনল্যান্ডে ১৯১৮ সালে লাল ও শ্বেত বাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধে লাল বাহিনী পরাস্ত হল। ১৯১৮-১৯ সালে রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবক্নেখট-এর নেতৃত্বে জার্মানিতে কম্যুনিস্টদের বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বেলা কুন-এর নেতৃত্বে ১৯১৯-এর হাঙ্গেরি-র সোভিয়েট রিপাবলিক স্থাপিত হল, কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে তার পতন হল। ১৯২১ সালের মঙ্গোলিয়ান বিপ্লবে মঙ্গোলিয়ান পীপলস রোভোলিউশনারি পার্টি রাশিয়ার লালরক্ষী বাহিনীর সাহায্য নিয়ে তৎকালীন চীন রাষ্ট্রের হাতের পুতুল মঙ্গোলিয়ান সরকারকে পরাস্ত করল।

■ **সমসাময়িক বিশ্ব, বিশেষত আমেরিকার অবস্থা :**

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলেছিল ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত। আমেরিকার তৎকালীন ৩৪-টি রাজ্যের মধ্যে সাতটি নিজেদের দাসপ্রথার সমর্থক বলে ঘোষণা করল ও নিজেদের 'কনফেডারেট অফ স্টেটস', বা 'সাউথ' বলে 'স্বাধীন' ঘোষণা করে। ক্রমে ১১-টি রাজ্য এই কনফেডারেট-এর অংশীদার হল। আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার, বা আর কোনো বিদেশি রাষ্ট্র এদের আলাদা রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয়নি। আমরা জানি শেষ পর্যন্ত আমেরিকাতে এই কনফেডারেট পরাস্ত হয় ও দাসপ্রথার বিলোপ ঘটে।

আমেরিকার কয়লাখনি শ্রমিক ধর্মঘট, ১৯০২— এর অনেকদিন পরের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯০২ সালে আমেরিকার কয়লাখনি শ্রমিক ধর্মঘট। আমেরিকায় পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া-তে ১,৪০,০০০ কয়লাখনি শ্রমিক ধর্মঘটে শামিল হল। তাঁদের দাবি ছিল বেশি মাইনে, দিনের মধ্যে কম সময় ধরে কাজ, আর তাঁদের ইউনিয়ন করার অধিকার। সেই সময় 'অ্যানথ্রাসাইট' বা 'হার্ড' কয়লা জ্বালিয়ে বাড়ি গরম রাখা হত, কেননা তা 'বিটুমিনাস' বা 'নরম' কয়লার চাইতে বেশি তাপ দিত। ধর্মঘটের ফলে সমস্ত বড়ো আমেরিকান শহরে শীতের সময় বাড়ি গরম রাখার কয়লায় টান পড়ল।

প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট হস্তক্ষেপ করলেন, এবং আমেরিকার সবথেকে বড়ো অর্থ-সরবরাহকারী সংস্থা জেপি মর্গ্যান-এর একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব করলেন। সেই সময় নিউ ইয়র্ক শহরে যথাযথ পৌর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিল না, আর প্রতি পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজন কারখানায় কাজ করত। শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে দশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ন-ঘণ্টা করা হল, আর শতকরা ১০ ভাগ মাইনে বাড়ানো হল। ধর্মঘটের অবসান হল। আমেরিকায় এটাই প্রথম শিল্পশ্রম নিয়ে মতভেদ যেখানে কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকার হস্তক্ষেপ করে। কর্পোরেট সংস্থার হাতে চরম ক্ষমতা থাকার বিরোধিতা করেন রুজভেল্ট। *শ্রমিক আর একচেটিয়া কর্পোরেটের বিরোধ তখনই সেখানে সরাসরি সামনে এসেছিল।*

■ **এবার আমরা সমসাময়িক বিশ্বের দিকে তাকাই। তাকাই ভারতের দিকে।**

ভারত : ১৯১৫-১৯১৯

➤ ১৯০৮ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ১৯১৩ সালে ডাক্তার হয়ে দামোদরের বন্যাতে ত্রাণকার্যে অংশ নেবার সূত্রে তিনি বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ সালে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নেন যদুগোপাল। পরে তিনি রাঁচিতে বাস করেন ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেন।

➤ ১৯১৫ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরলেন। এরপর তিনি হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্শামুখ।

➤ ১৯১৬ সাল-ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ডিগ্রি আইন পাশ হল ১৬ মার্চ। এই আইনে 'পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান'-এর মধ্যে পাশ্চাত্যের 'অ্যালোপ্যাথি' মেডিসিন, সার্জারি ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি ধরা হল ও হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা ইউনানি চিকিৎসাকে বাদ দেওয়া হল।

➤ **হোম রুল আন্দোলন ১৯১৬-১৮-** আইরিশ স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের ধাঁচে বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ত-এর নেতৃত্বে এই হোম রুল আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ তৈরি করে।

➤ **রাওলাট আইন, ১৯১৯-১৮** মার্চ ১৯১৯, দিল্লির ইম্পেরিয়াল আইনসভায় পাশ হওয়া এই আইনের পুরো নাম নৈরাজ্যবাদী ও বিপ্লবী অপরাধ আইন। এই আইনবলে অপরাধ করতে পারে এই আশঙ্কাতেই কোনো বিচার বা কোর্টে হাজিরা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য কাউকে ধরে রাখা যেত। তাই এই বিলের পরিচিতি ছিল, দলিল-উকিল-অ্যাপিল চলবে না। জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন দমন করতেই এই আইন। পঞ্জাবে এই আইনের বিরুদেধ প্রতিবাদ আন্দোলন জোরদার হয়, আর ১০এপ্রিল কংগ্রেসের দুই নেতা ডা. সত্য পাল ও ডা. সাইফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করে লুকিয়ে ধরমসালায় আনা হয়।

➤ **জালিয়ানওয়ালা বাগে প্রতিবাদসভা-** সত্য পাল ও সাইফুদ্দিন কিচলুর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালা বাগে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কর্নেল রেগিন্যাল্ড ডায়ার-এর হুকুমে সভার অহিংস জমায়েতের ওপর মেশিনগানের গুলি চলে, শত শত মানুষ মারা যান। এটাই কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড বা অমৃতসর হত্যাকাণ্ড। ভগৎ সিং তখন ১২ বছরের বালক মাত্র— তিনি জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরে সেখোনে যান।

➤ **১৯২০-১৯২৪- ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি** তৈরি হয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি সমস্ত কম্যুনিস্ট কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ফলে একটা সঙ্ঘবদ্ধ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ওপর আঘাত হানে তিনটি চক্রান্ত মামলা— পেশওয়ার চক্রান্ত মামলা, মীরাট চক্রান্ত মামলা, আর কানপুর বলশেভিক চক্রান্ত মামলা। কানপুর বলশেভিক চক্রান্ত মামলার বিচারে ১৭ মার্চ ১৯২৪ এম এন রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত, শওকত উসমানি, সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, গুলাম হুসেন এবং আর সি শর্মা— এদের গ্রেপ্তার করা হয়। ছোটো ছোটো কম্যুনিস্ট গোষ্ঠী বাংলা (মুজফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে), বোম্বে (শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের

নেতৃত্বে), মাদ্রাজ (সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-এর নেতৃত্বে), যুক্তপ্রদেশ (শওকত উসমানি-র নেতৃত্বে) এবং পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ (গুলাম হুসেনের নেতৃত্বে) তৈরি হয়েছিল।

- **১৮২৩-২৪** - হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হল। লালা হরদয়ালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল এলাহাবাদে গিয়ে বাংলার দুই বিপ্লবী ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ স্যান্যালের সাহায্যে হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান রচনা করলেন।
- **১৯২৫ সাল** - হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়শনের প্রথমদিকের কার্যকলাপের মধ্যে কাকোরি ট্রেন ডাকাতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্ণৌ থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে ট্রেন থেকে সরাসরি টাকা লুট হল, অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত একজন যাত্রীর প্রাণ গেল। কিন্তু এই ঘটনার জেরে ইংরেজদের বিচারে আশফাকউল্লা খান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোহন সিং ও রাজেন্দ্র লাহিড়ী— এই চারজন নেতার ফাঁসি হল।
- **১৯২৮ সাল**- হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনের নতুন নাম রাখা হল হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন। ভগৎ সিং এই নাম পরিবর্তনের মূল হোতা ছিলেন। আগেকার হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন যে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছিল তাতে সমাজবাদের কথা ছিলই, এখন তা মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকল। হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশন গণশক্তির সাহায্যে সংগ্রাম করে ''সর্বহারার একনায়কতন্ত্র'' প্রতিষ্ঠা করার কথা বলল, এবং ''রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পরজীবীদের উৎখাত'' করতে ডাক দিল।

■ এবার আবার অক্টোবর বিপ্লবের কথায় ফিরি :

রাশিয়ার বিপ্লবের আগের অবস্থার সঙ্গে অন্য দেশগুলোর অবস্থা তুলনা করি, দেখি অক্টোবর বিপ্লবের কাঁধে ঠিক কতটা দায় চেপেছিল, কীরকম অবস্থায় থাকা এক দেশকে তা কতটা উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিল।

■ অক্টোবর বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থা :

বিপ্লবের আগে রাশিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাপারে অত্যন্ত পশ্চাৎপর দেশ ছিল, আর মানুষের কাছে চিকিৎসার কোনো সুযোগই পৌঁছে দেওয়া হয়নি। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বুলেটিন অফ নিউ ইয়র্ক অকাদেমি অফ মেডিসিন'-এ কর্নেল এফ. এইচ. গ্যারিসন-এর ''আগের রাজত্বে রাশিয়ার চিকিৎসাবিজ্ঞান' প্রবন্ধটিতে সেই অবস্থার খুব ভালো বর্ণনা আছে।

আইভান দ্য টেরিবল তথা জার চতুর্থ আইভান-এর আমলে (১৫৩৩-৮৪), ইংল্যান্ডে তখন রানি প্রথম এলিজাবেথের আমল, জার্মানি থেকে জার আইভান চারজন সার্জেন, চারজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, আটজন সার্জারি করার ড্রেসার ও আটজন নাপিত-সার্জন নিয়ে এলেন। তার অনেক পরে, অষ্টাদশ শতকে, রাশিয়ার নিজস্ব ইউনির্ভাসিটির মেডিক্যাল ডিগ্রিধারী ডাক্তার তৈরি হল, তখন জার 'মহান পিটার' (১৬৭২-১৭২৫) দেশে পশ্চিম ইউরোপীয় ভাবধারা আনতে সত্যিকারের চেষ্টা করছিলেন। প্রথম হাসপাতাল (১৭০৬ সাল) আর প্রথম মেডিক্যাল স্কুল (১৭০৭ সাল) তাঁরই সময়ে তৈরি হয়। পাশাপাশি মনে রাখা যেতে পারে, কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঐ ১৭০৭ সালেই প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল (এখনকার পিজি হাসপাতালের পূর্বসূরি), শুরু করে, যদিও তা ছিল কেবল ইউরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য।

গ্যারিসন-এর ঐ প্রবন্ধ বলছে, ১৮০৪ সালে চারটি রাশিয়ান মেডিক্যাল কলেজ ছিল, কিন্তু শিক্ষাদান তেমন উচ্চমানের ছিল না। সেগুলো ছিল মস্কো, দরপাত, খারকভ, কাজান ইউনির্ভাসিটি আর সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট মেডিক্যাল অকাদেমি। ১৮৩৫ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট মেডিক্যাল অকাদেমি-কে মিলিটারির হাতে দেওয়া হয় ও সেখানে ট্রেনিং-এর কিছু উন্নতি ঘটে। ভারতের দিকে তাকালে দেখব, ঐ ১৮৩৫ সালেই ভারতে দুটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল— কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও তার পরেই মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ।

■ ১৯১৭ সালের আগে রাশিয়ায় মেয়েদের ডাক্তারি শিক্ষার অবস্থা-

নাদেঝদা সুসলোভা প্রথম রাশিয়ান মহিলা ১৮৬৭ সালে মেডিক্যাল ডিগ্রি পান। কিন্তু তিনি রাশিয়াতে তাঁর ডাক্তারি শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ১৮৬০ দশকে নাদেঝদা সুসলোভা বিপ্লবী দলে যোগ দেন, তারপর ১৮৬২-তে সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট মেডিক্যাল অকাদেমি-তে ভর্তি হন। কিন্তু ১৮৬৫ সালে রাশিয়ার ইউনির্ভাসিটিগুলোতে মেয়েদের পড়া আইনত বন্ধ করা হয়। এদিকে নাদেঝদা-র স্বামী ও ভাইবোনদের রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করার ফলেও তিনি দেশ ছেড়ে সুইজারল্যান্ডে আসেন, আর জুরিখ ইউনির্ভাসিটিতে দু-বছর মেডিক্যাল ক্লাসগুলো অডিট করেন, তারপর ইউনির্ভাসিটি মেয়েদের নেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর সেখানকার পুরোদস্তুর ছাত্রী হন।

■ ১৯১৭-র আগে আমেরিকায় মেডিক্যাল শিক্ষা ও মেয়েদের অবস্থা :

আমেরিকার প্রথম মেডিক্যাল কলেজ খোলার ৮৫ বছর পর ১৮৪৯-র জানুয়ারি মাসে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল সেখানে প্রথম পাশ-করা মহিলা ডাক্তার হন। প্রায় ঘটনাচক্রেই এলিজাবেথ ডাক্তারিতে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও শিক্ষকরা এতদিন মেয়েদের কেবল ম্যাট্রিকুলেশন পড়ার দরখাস্ত দেখতেন, তাঁরা ঠিক করতে পারছিলেন না এলিজাবেথ-এর ডাক্তারি পড়ার দরখাস্তটার কী উত্তর দেবেন। শেষমেশ এলিজাবেথ পড়তে ভর্তি হতে পারেন যে ক্লাসে তার ১৫০ জন ছাত্রদের ভোট নিলেন তাঁরা; কথা ছিল একজনও যদি বলে 'হবে না' তো এলিজাবেথ ভর্তি হতে পারবেন না। কিন্তু সেদিনের নতুন প্রজন্মের একজনও পিছিয়ে যায়নি, এলিজাবেথের ছাড়পত্র মিলেছিল।

■ **১৯১৭-র আগে ভারতে মেডিক্যাল শিক্ষা ও মেয়েদের অবস্থা :** ভারতে মেয়েরা কিন্তু তেমন পিছিয়ে ছিল না। ১৮৮০ সালে প্রথম ব্রিটিশ মহিলা ডাক্তার হিসেবে ফ্যানি বাটলার ভারতে রোগী দেখা শুরু করেন। তারপর ১৮৮৫ সালে ডাফরিন ফান্ড তৈরি হল কাউন্টেস ডাফরিন-এর বদান্যতায়। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে মহিলা ডাক্তার আনা ও নারীদের জন্য হাসপাতাল খোলা, এবং ভারতীয় মেয়েদের ডাক্তারি শিক্ষায় সাহায্য করা। ১৮৮৬ সালেই কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত কলোনিগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলা হিসেবে ডাক্তারি পাস করেন, এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।

কিন্তু কাদম্বিনী এদেশের নারীদের মধ্যে পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক প্রথম মহিলা নন, সে কৃতিত্বের অধিকারী হলেন পুণের আনন্দীবাঈ যোশী। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ডিগ্রি পেয়েছিলেন ১৮৮৬-র জুলাইতে, শুধু তাই নয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পুরোনোপন্থীদের নানা চক্রান্তের ফলে তাঁকে তখনকার সাধারণ ডিগ্রি এমবি দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল 'গ্রাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ', যদিও এতে কাদম্বিনীর কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র খাটো হয় না। আনন্দীবাঈ যোশী আমেরিকায় গিয়ে ১৮৮৬ সালের মার্চ মাসে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর স্বামী গোপালরাও যোশী ছিলেন ডাকবিভাগের এক কর্মচারী, তিনি আনন্দীকে খুব উৎসাহ দেন ও সাহায্য করেন। আনন্দীবাঈ যোশীর দুর্ভাগ্য, আমেরিকায় গিয়ে তাঁর খাওয়া-দাওয়া খুব খারাপ হয়েছিল, অপুষ্টিতে ভুগে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন ও দেশে ফিরে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জনের একবছর পুরো হবার আগেই ১৮৮৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান; তখন তাঁর বয়স ২২ বছরও হয়নি।

এর অনেক আগে, মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ ১৮৭৫ সালে ভারতে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নেওয়া শুরু করেছিল, আর ১৮৭৮ সালে সেখান থেকে চারজন মহিলা 'লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন' ডিগ্রি লাভ করে প্র্যাকটিস করার অধিকার পান। এঁরা অবশ্য জন্মসূত্রে ভারতীয় ছিলেন না। এঁরা হলেন মেরী স্কারলিব, ডি হোয়াটি, ডি মিচেল ও বি বেটি। মনে রাখতে হবে এই সময় ইউরোপে কোনো ইউনির্ভার্সিটিতেই মেয়েদের ডাক্তারি ডিগ্রি দেওয়া হত না, আর আমেরিকাতে একটিমাত্র জায়গায় মেয়েরা ডাক্তারি পড়তে পারত ('উইমেন্স' মেডিক্যাল কলেজ, পেন্সিলভ্যানিয়া)। মাদ্রাজের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও তারপর ১৮৮৫ সালে বোম্বের গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ মেয়েদের ডাক্তারিতে ঢুকতে দেয়।

এরপর ডা. এডিথ মেরি ব্রাউন ও তাঁর সহকর্মীরা ১৮৯৪ সালে 'নর্থ ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মেডিসিন ফর ক্রিশ্চিয়ান উইমেন' চালু করেন— এর বর্তমান নাম 'ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ, লুধিয়ানা'। ১৯০০ সালে ইডা স্ক্যাডার-এর উদ্যোগে একটিমাত্র শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক হিসেবে ভেলোরের খ্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ যাত্রা শুরু করে। তারপর ১৯০৩ সালে তিনি একটি কম্পাউন্ডারদের জন্য স্কুল, ১৯০৯ সালে নার্সিং স্কুল, আর ১৯১৮ সালে মেয়েদের জন্য মেডিকাল স্কুল তৈরি করেন। আমেরিকার কর্নেল মেডিক্যাল স্কুলে প্রথম স্নাতকদের মধ্যে অন্যতম ইডা স্কাডার ভারতে স্থানীয় মানুষদের, বিশেষ করে এখানকার মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কী কী, সে দিকে নজর দিয়েছিলেন আর এভাবেই তৈরি হয়েছিল আজকের ভারতের অন্যতম সেরা হাসপাতাল।

১৯০৭ সালে বোম্বে-তে ক্যামা অ্যান্ড অবলেস হাসপাতালের ডা. অ্যানেটি বেনসন-এর নেতৃত্বে অ্যাসোসিয়েশন অফ মেডিক্যাল উইমেন ইন ইন্ডিয়া তৈরি হল। ১৯১৬ সালে দিল্লিতে খোলা হল লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ, আর ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে লেডি ওয়েলিংটন মেডিক্যাল স্কুল ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা হল।

■ **স্বাস্থ্যে বৈষম্যের সামাজিক কারণ : সিস্টেম-বিজ্ঞান ব্যবহার করে তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা—**

স্বাস্থ্য ও রোগ, এ-দুয়ের সামাজিক কারণ অনুসন্ধানে বামপন্থী তত্ত্বের ভূমিকা যথেষ্ট বড়ো। ঊনবিংশ শতকের ডা. ভিরকোভ (Dr Rudlof Virchow, ১৮২১-১৯০২, আধুনিক প্যাথোলজি-র জনক বলে খ্যাত), ও অনেক পরে ডা. সালভাদর আলেন্দে (Dr. Salvador Allende, ১৯০৮-১৯৭৩, চিলির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট যিনি প্রতিবিপ্লবীদের আক্রমণে শহিদ হন)— এঁরা জনগণের স্বাস্থ্যের ওপরে সমাজের প্রভাব নিয়ে কাজ করার বামপন্থী ধারাবাহিকতার সাক্ষী।

রুডলফ ভিরকোভ প্রুশিয়া-র আপার সাইলেশিয়া-তে প্লেগ মহামারীর সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও দারিদ্রের সম্পর্ক দেখান। মার্কসবাদের অন্যতম জনক ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণির জীবনধারণের দুরবস্থার সঙ্গে তাদের উচ্চ মৃত্যুহারের সম্পর্ক দেখান। এঁরা ছিলেন পথিকৃৎ। এর অনেক পরে চিলি-র সালভাদোর আলেন্দে-র গবেষণা ও কাজ জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যের বৈষম্য সৃষ্টিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলো খতিয়ে দেখায়।

সাম্প্রতিককালে, ১৯৮০-র দশকে, জিওফ্রে রোজ, জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, একজন ব্যক্তিমানুষের অসুখের কারণ আর একটা জনগোষ্ঠীর অসুখের কারণ— এ দুটো আলাদাভাবে চর্চা করার বিষয়। তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন সেটা বাস্তবে মেলে না, কিন্তু বাস্তবের সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করে। ধরা যাক এক জনগোষ্ঠীতে

প্রত্যেকে দিনে কুড়িটা করে সিগারেট খায়। এই জনগোষ্ঠীকে আমাকে চিকিৎসাশাস্ত্র-মান্য ''কোহর্ট'' ও ''কেস-কন্ট্রোল স্টাডি'' (চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুল-ব্যবহৃত পরিসংখ্যান-বিদ্যার কৌশল) করলে, সিদ্ধান্ত হবে ফুসফুসের ক্যানসার জিনগত প্রবণতার ফল! কিন্তু এই ধূমপানের ব্যাপারটা সামাজিক প্রথা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক ফল। যে সমাজে মাথাপিছু ধূমপানের হার কম, সেখানে ফুসফুস ক্যানসারের হারও অনেক কম। সুতরাং ব্যক্তির আচরণ (যেমন ধূমপান)-এর ওপর জনগোষ্ঠীর প্রথা ও সামাজিক গঠনের অভিঘাত পড়ে, আর তার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো রোগ ঘটার বা থাকার তারতম্য হয়, আবার একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে দু-জন মানুষের অবস্থানের তারতম্যের ফলে তাদের দুজনের রোগ আলাদা আলাদা হবার সম্ভাবনা।

অসুস্থ ব্যক্তি হল জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক অবস্থার প্রতিনিধি, অসুস্থ হবার কারণ থাকলেই সবাই দৃশ্যমানভাবে অসুস্থ হবে, এমন নয়। এই বিষয়ে এখনকার গবেষণা স্বাস্থ্য-বৈষম্যের সামাজিক কারণ চর্চায় সামাজিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক প্রথা, সমাজের গঠন, আর তাদের পেছনে থাকা কারণগুলো দেখার চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য-বৈষম্যের জনক সামাজিক পরিবেশের কারণ বিশ্লেষণ করে তিনটে প্রধান দিক দেখা গেছে।

■ সোভিয়েতের পতনের পরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থা : ইউএসএসআর-এ সমাজতন্ত্রের পতনের পরবর্তী আর্থিক ভেদবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তার প্রভাব :

'দ্য লিগ্যাসি অফ স্টেট সোশ্যালিজম অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ ট্রান্সফর্মেশন' বলে বিখ্যাত বইটিতে ডেভিড স্টুয়ার্ট লিখেছিলেন, ইউএসএসআর-এর পতনের ফলে শুধু রোজগার কমেছে তা-ই নয়, মানুষের আয়ের তারতম্যও অনেক বেড়েছে, দারিদ্র বেড়েছে।

গিনি সূচক বলে একটা আর্থিক বৈষম্য মাপার সংখ্যাতাত্ত্বিক মাপকাঠি আছে। এটা তৈরি করেছিলেন ইতালির সংখ্যাতত্ত্ববিদ করাডো গিনি। গিনি সূচকের মান শূন্য (বা ০%) থেকে এক (বা ১০০%) পর্যন্ত হতে পারে। কোনো জনগোষ্ঠীতে গিনি সূচক শূন্য মানে সেখানে সবার আয় সমান, অর্থাৎ একেবারে আর্থিক বৈষম্যহীন অবস্থা। আর কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠীতে যদি একজনই সব উপার্জন করে, অন্য কেউই কিছুমাত্র উপার্জনও না করে, তবে সেখানে গিনি সূচক হল এক (১০০%)।

এখন আমরা দেখি, ১৯৮৭-৮৮-তে ইউএসএসআর-এর পতনের সূচনার আগে গিনি সূচক কেমন ছিল, আর ১৯৯৩-৯৪ তে পতন সমাপ্ত হলে গিনি সূচক কেমন কমাবাড়া করেছিল। এই সময়পর্বের আগে গিনি সূচক মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল (০.১৯ থেকে ০.২৮)। আর এই সময়পর্বের পরে গিনি সূচক হয়ে দাঁড়াল ০.৫৫, মানে বৈষম্য অনেক বাড়ল। ২০১২ সালে রাশিয়ায় গিনি সূচক ছিল ০.৪২, ২০১৬ সালে তা হল ০.৭।

■ সোভিয়েতের পতনের পরে আর্থিক ভেদবৃদ্ধি ও ভারতে আর্থিক ভেদবৃদ্ধিতে তার প্রভাব—

নভেম্বর ২০১৬-র পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, ভারত আর্থিক বৈষম্যের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে। এদেশে সব থেকে ধনী এক শতাংশ মানুষের হাতে ৫৮.৪ শতাংশ সম্পদ আছে, আর ওপরতলার দশ শতাংশের হাতে আছে ৮০.৭ শতাংশ সম্পদ। গিনি সূচকের ঊর্ধ্বগমন প্রত্যেক বছরই বাড়ছে, অর্থাৎ দরিদ্র হচ্ছে আরও দরিদ্র, অন্যদিকে ধনীর সম্পদ বাড়ছে। এটা কিন্তু স্বাধীনতার পর ঘটেনি। ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ এই সময়পর্বে গরিবরা অবস্থাপন্নদের সঙ্গে রোজগারের ব্যবধান কমাচ্ছিল, আর ১৯৮০-২০১৪ কালপর্বে এটা পুরো উলটে গেল। এদেশে গিনি সূচক ০.৫৮ (৫৮%)-এ ঠেকছে, যেটা কিনা এদেশে সর্বকালীন রেকর্ড বলা যায়।

ক্রেডিট সুইসে-র (Credit Suisse) বিশ্ব সম্পদ রিপোর্ট অনুসারে ২০১৬ সালের রাশিয়া হল সবথেকে বৈষম্যের দেশ। রাশিয়ার মোট সম্পদের ৭৪.৫ শতাংশ ওখানকার সবথেকে ধনী এক শতাংশ মানুষের হাতে আছে। আজকের রাশিয়ার যে 'গণতন্ত্র' স্থাপিত হয়েছে, তার ভেতরকার চেহারাটা এইরকমই। আর এই বৈষম্য স্থাপন করার প্রচেষ্টাই পূর্বতন ইউএসএসআর ভাঙার একটা বড়ো কারণ। অতএব সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শেষ হয়নি। *যতদিন ভারতে ওপরতলার ১ শতাংশের হাতে ৭৩ শতাংশ সম্পদ থাকবে ততদিন অক্টোবর বিপ্লব এদেশে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না।*

■ বৈষম্য ও স্বাস্থ্য :

রোজগারের বৈষম্য কেবল জাতির সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাই নয়, তা জাতির স্বাস্থ্যভঙ্গও করে। বিএমজে (পূর্বতন British Medical Journal)-এর সম্পাদকরা স্বাস্থ্যের সঙ্গে রোজগার-বৈষম্যের এই সম্পর্ককে ''এক বিরাট ধারণা'' বলে অভিহিত করেছেন। 'বিরাট ধারণা'-টা হল এই যে— কোন সমাজে কত সম্পদ আছে, মৃত্যু বা স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয় হিসেবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজের সম্পদ কতটা সমভাবে বণ্টিত আছে। যত সমবন্টন সমাজের স্বাস্থ্য তত বেশি ভালো।

এর রাজনৈতিক তাৎপর্যটি বামপন্থীদের কাছে বেশি অর্থবহ— স্বাস্থ্যের উন্নতি করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল যথাসম্ভব আর্থিক সাম্য আনা। উন্নত দেশগুলোতে রোজগারের বৈষম্যের ফল চোখেই দেখা যায় যখন দেখি শিশুমৃত্যু, জন্মের সময় শিশুর ওজন কম হওয়া, এসব আর্থিক বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত, এবং বিজ্ঞানসম্মতভবে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অন্য সমস্ত সম্ভাব্য কারণগুলোকে গণনার মধ্যে আনলেও, বৈষম্যের এই ভূমিকা কমছে না। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য,

আত্মহত্যা-প্রবণতা ও বিষাদরোগ— সবই আর্থিক বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত।

পরের চিত্রে বিশ্বের যেসব দেশের ক্রেডিট সুইসে-র পরিসংখ্যান আছে সেইসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বৈষম্যময় দেশগুলোর অবস্থা দেখানো হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে এই বৈষম্যময় দেশগুলিতে সবথেকে বড়োলোক এক শতাংশ বাকি ৯৯ শতাংশের চাইতে বেশি সম্পদের মালিক। এইসব দেশের সঙ্গে ব্রিটেনের তুলনা করলে দেখব, সেখানে সবচেয়ে ধনী এক শতাংশ মানুষ ২৩.৯ শতাংশ সম্পদের মালিক। আর সবথেকে সমান আর্থিক অবস্থা হল হাঙ্গেরিতে, সেখানে ধনীতম এক শতাংশ মানুষ ১৭.৬ শতাংশ সম্পদের মালিক।

■ ১৯১৮-১৯৯১ কালপর্বে ইউএসএসআর-এ মূল ঘটনাসমূহ :

১) **১৯১৮-১৯২১** - 'যুদ্ধকালীন কম্যুনিজম'-এর নীতিগুলো সামনে আনা হল, আর রাষ্ট্র দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল।

২) **১৯২৪** - সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বহারার একনায়কতন্ত্র-এর ওপর ভিত্তি করে সংবিধান রচনা করল; জমি ও উৎপাদনের সমস্ত উপায়ের ওপর মালিকানা রাষ্ট্রের হয়ে গেল; লেনিন মারা গেলেন ও যোসেফ স্তালিন তাঁর জায়গায় এলেন।

৩) **১৯২২-২৯** - লেনিন অসুস্থ হলেন ১৯২২-২৩ সালে। মারা গেলেন ১৯২৪-এ। ত্রৎস্কিকে ১৯২৯-এ নির্বাসনে পাঠানো হল।

৪) **১৯৩৬-৩৮** - স্তালিনের শাসনের বিরুদ্ধে লিও ত্রৎস্কির নেতৃত্বে চক্রান্ত চলছিল, এমন জানা গেল।

৫) **আগস্ট ১৯৩৯**- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নাজি জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করল।

৬) **১৯৪১ জুন থেকে ১৯৪৫ মে** - জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করল, ১৯৪১-এর শেষে তারা বেলারুশ দখল করল, ইউক্রেনের অধিকাংশ দখল করল, ও লেনিনগ্রাদ (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ) ঘিরে ধরল।

৭) **জুন ১৯৪২** - জার্মান সেনারা স্তালিনগ্রাদের (বর্তমান নাম ভলভোগ্রাদ) দরজায়, আর ককেশাস-এর তেলখনিগুলোর কাছে। ১৯৪৩-জার্মানরা স্তালিনগ্রাদ দখল করল পারল না; সোভিয়েত সৈন্য প্রতি-আক্রমণে গেল, আর শেষ পর্যন্ত জার্মানির রাজধানী বার্লিন দখল করল। প্রচুর মানুষ মারা গেলেন, বহু সম্পদ ধ্বংস হল।

৮) **১৯৪৯-৫০** - সোভিয়েত রাষ্ট্র তার প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা ফাটাল; চিনের কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দিল; সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিন ত্রিশ বছরের মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করল।

৯) **১৯৫৩-৫৪** - ১৯৫৩-র মার্চে স্তালিন মারা গেলেন ও নিকিতা ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারি হলেন, তারপর তিনি ১৯৫৮ তে দেশের প্রধান হলেন ও ১৯৬৪ পর্যন্ত সেই পদে থাকলেন।

১০) **১৯৫৮-৬০** - চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতানৈক্য হল, মস্কোর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি ও ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ সালে স্তালিনকে যে নেতিবাচক মূল্যায়ন করেছিলেন, চিন এ-দুয়ের বিরুদ্ধে গেল।

১১) **১৯৫৭**- বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুতনিক-কে পৃথিবী-প্রদক্ষিণে পাঠাল সোভিয়েত রাশিয়া।

১২) **১৯৮৮-৯১** - সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তান ছাড়ল; জর্জিয়ায় জাতিয়তাবাদী দাঙ্গা লাগল; সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে লিথুয়ানিয়া কম্যুনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা ঘোষণা করল; ইউএসএসআর-এ নতুন ''কংগ্রেস অফ পিপল'স ডেপুটিজ'' তথা পার্লামেন্টের প্রথম 'মুক্ত নির্বাচন' (বহুদলীয়) হল।

১৯৯০ - আজেরবাইজানে আর্মেনিয়ান ও আজেরি-দের মধ্যে জাতিদাঙ্গা বাঁধায় সেখানে সোভিয়েত সেনা পাঠানো হল; কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেকার ভোটে 'এক-পার্টি ব্যবস্থা' শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল; গর্বাচেভ বালটিক রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ঘোষণার বিরুদ্ধতা করলেন; বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক-এর পার্লামেন্টের ভোটে তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ও কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়লেন।

১৯৯১- সেপ্টেম্বর মাসে ''কংগ্রেস অফ পিপল'স ডেপুটিজ'' সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর অবসান ঘোষণা করল।

■ অক্টোবর বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছে?

প্রথমত, অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, সময় ছিল ঐতিহাসিক বিপ্লবক্ষণ, আর তা সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা বদলে দেবার চেষ্টা করেছিল। ভগৎ সিং সহ এদেশের ও অন্য অনেক দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নভেম্বর বিপ্লব থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, আর তাঁদের চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। মানুষ সত্যিকারের মুক্ত এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল— মানুষ হবে সব সংস্কার, ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও অর্থনৈতিক দাসত্বের থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয়ত, একটা বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করার চাইতে তৃণমূল স্তরে সমাজবাদ প্রতিষ্টা করা অনেক বেশি শক্ত। এটা করতে অনেক নতুন কিছু ভাবতে ও করতে হয়, আর বারবার নিজেকে শুধরে নেবার হিম্মত লাগে। সত্যিকারের সংগ্রামের জায়গা হল— নিজের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো, অন্যমত-কে তার প্রাপ্য জায়গা দেওয়া, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী সমাজ যে চক্রান্ত করে তাকে রোখা। নতুন ব্যবস্থায় যাদের অসুবিধা হবে তারাই সমাজবাদী সমাজের চারপাশ জুড়ে থাকবে, আর তার মধ্যে থেকেই সমাজবাদের অগ্রগতি ব্যাহত না করে মানুষকে যথাযথ স্বাধীনতার অধিকার দিতে হবে।

১৯১৮ থেকে ১৯২০ — রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের কথা ভাবা যাক। জারের আমলের রাশিয়া সাম্রাজ্যর প্রায় সবটা জুড়ে গৃহযুদ্ধ চলল— একপক্ষে বলশেভিক বা লালরক্ষী, অন্যপক্ষে বলশেভিক-বিরোধী নানা ধরনের শ্বেতবাহিনী। কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি ষোলোটি দেশের বাহিনী একযোগে বিপ্লবী লালরক্ষী বাহিনীকে হারানোর চেষ্টা করছিল, আর তার জন্যে তারা রাশিয়ার বিপ্লব-বিরোধী শ্বেতবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কেন?

কেন তারা এককাট্টা হয়ে নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল? কেন তারা 'রাশিয়ার জনগণ ঠিক করবে', এই নীতির ওপর আস্থা রাখল না? কেন তারা গণতন্ত্র রক্ষার নামে রাশিয়া আক্রমণ করল?

অন্য দেশে কিন্তু এমন হয়নি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কথা ভাবুন। দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সঙ্গে উত্তরের রাজ্যগুলোর দশকব্যাপী রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল নানা বিষয়ে— কেন্দ্রের ক্ষমতা বনাম রাজ্যের ক্ষমতা, পশ্চিমদিকে জমি দেশের দখলে আনা, আর ক্রীতদাস-প্রথা—এসব মিলিয়ে ১৮৬১ সালের বসন্তকালে একটা সংঘর্ষ শুরু হল, আর সেটাই রূপ নিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সেই গৃহযুদ্ধ চলল। দক্ষিণের রাজ্যগুলো তৈরি করল 'কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা', আর আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কনফেডারেট-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, ছ-লক্ষ কুড়ি হাজারের চাইতেও বেশি মানুষ মারা যান, আর তার কয়েকগুণ মানুষ আহত হন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এই কনফেডারেট- এর অংশ ছিল এগারোটি দক্ষিণ-এর রাজ্য যারা ১৮৬০-৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেড়িয়ে এসেছিল, আলাদা পূর্ণাঙ্গ সরকার চালাচ্ছিল, আর যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ১৮৬৫-র চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে পর্যন্ত পুরোদস্তুর যুদ্ধ চালিয়েছিল। ১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর আমেরিকার একেবারে দক্ষিণের সাতটি স্টেট মনে করে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে তাদের নিজের মতো করে বাঁচা সম্ভব নয়, ও সেই সাতটি স্টেট, আলাবামা, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, সাউথ ক্যারোলিনা আর টেক্সাস স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফোর্ট সুমটার-এ ১৮৬১ সালে কামানগর্জনের মধ্যে দিয়ে যখন যুদ্ধ শুরু হয়েই গেল, তখন তাদের একটু উত্তরের চারটি স্টেট (আরকানসাস, নর্থ ক্যারোলিনা, টেনেসি আর ভার্জিনিয়া) এদের দলে যোগ দেয় কিন্তু কোনো বিদেশি শক্তি কেন্দ্রের হাত থেকে দক্ষিণের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সমর্থন ঘোষণাও করেনি, যুদ্ধে তাদের মদত দেয়া দুরের কথা। কেন বাকি বিশ্ব, কেবল রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ নিয়ে এত ব্যস্ত হল?

■ অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন :

লেনিন ছিলেন এক অসাধারণ চিন্তাবিদ। ইতিহাসকে বুঝতে আর ঐতিহাসিক মুহূর্তের গুরুত্ব ধরার কাজে তাঁর প্রতিভা আসামান্য ছিল। একবার ভেবে দেখুন, লেনিন ও তাঁর জীবনসঙ্গিনী রাশিয়া ছেড়ে, তার রাজধানী থেকে দু-হাজার কিলোমিটার দূরে, নির্বাসিত পলাতকের জীবন যাপন করছেন। সেখানথেকে অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়া আসার সময় সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড এই চারটে দেশ পেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু ১৯১৭-র দ্রুত পরিবর্তনশীল সেই সময়কে তিনি অতদূরে বসে ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর বলশেভিক (বলশেভিক কথাটার আক্ষরিক অর্থ সংখ্যাগুরু) দলের সাথীরা দেশে বসে বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করেও সেই সময়কে ওইভাবে বুঝতে পারেননি।

জুরিখের তাঁর আস্তানা ছেড়ে রাশিয়ায় ফেরার সময় তিনি বললেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হয় তাঁরা ফাঁসিকাঠে ঝুলবেন, নয়তো নতুন এক বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসবে। তিনি অবশ্যই জ্যোতিষী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ, আর সমাজে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ অনেকটাই বুঝতে পারতেন। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ করে ভবিষ্যৎ বোঝা, এটাই হল বিজ্ঞানীর কাজ। লেনিন ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী, মার্কসেরই মতো, তাই তাঁরা নিজের সময়কে ছাপিয়ে আগামীকে দেখতে পারতেন, অবশ্যই পুরোটা নয়। কিন্তু দেশে একজন লেনিন থাকাটা একটা দুর্বলতাও বটে, কেননা লেনিন একজনই মাত্র মানুষ, আর বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধ-সঙ্কুল চারবছর মাত্র তিনি বেঁচে ছিলেন, তার অনেকখানি সময় ছিলেন খুবই অসুস্থ। তিনি আর কয়েক বছর বাঁচলে ইতিহাস অন্যরকম হত এমনটাই মনে হয়।

''একজন মানুষকে তার জীবনকে একমুহূর্তের সাফল্য, বা একঘণ্টার জয়, এমনকী একবছরের ফলাফল দিয়ে বোঝা যায় না। তার জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে।জন্ম থেকে মৃত্যু, এই সারা জীবন দেখার মতো অবস্থান তৈরি করে তবেই তাকে বিচার করা ভালো— একবার সে সমভূমিতে পদচারণা করে, একবার খাড়াই পাহাড়ে চড়ে, একবার মনোরম উপত্যকার মধ্যে যায়, আবার আরেকবার উপলবন্ধুর পর্বতে তার পথ কেটে চলে— লোভ, কঠিন বিচার, জয়, সবই তার পথের অঙ্গ। তার কাছে ভাগ্য কোনো দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়, সেটা বেছে নেবার ব্যাপার। তার জন্য সে কিছু ঘটে যাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না, সে ঘটিয়ে তোলে।''—উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, ১৮৬০।

■ লিও ত্রৎস্কি-র মতবাদ ও তাঁর বহিস্কার :

অন্যান্য ঐতিহাসিক সত্য যাই হোক না কেন, ত্রৎস্কি একটা অসম গৃহযুদ্ধ জিতেছিলেন। তাঁর না ছিল রসদ, না ছিল নিয়মিত সেনাবাহিনীর দক্ষতা। আর সেটা এমন একটা সময় যখন লেনিন সহ সব বলশেভিকদের জার্মান চর বলে প্রচার করা হচ্ছিল, কেননা জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ত লিতোভস্ক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করার ফলে রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) থেকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু তার (জারের রাশিয়া সাম্রাজ্যের) দশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা, তার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ, রাশিয়ার কয়লা, খনিজ তেল, আর লোহার খনির অধিকাংশ, আর আধুনিক শিল্পের বিরাট অংশ জার্মানির হাতে তুলে দিতে হল। লেনিন এই চুক্তিকে অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে ''পরাজয়, খন্ড-বিখন্ড হওয়া, দাসত্ব আর অপমান'' বলে অভিহিত করলেন, কিন্তু চুক্তি না করে উপায়ান্তর ছিল না।

ত্রৎস্কি এরকম বহুবার বিপ্লবী রাশিয়াকে আগলে রেখেছেন। অথচ ১৯০৩-০৪ সালেই তাঁর সঙ্গে লেনিনের তীব্র বিরোধ হয়েছিল, আর ছাড়াছাড়ির সময় লেনিন তাঁকে 'জুডাস' (বাংলা লবজে, 'বিভীষণ') বলেছিলেন। কিন্তু-এর জন্য লেনিনের মনে চিরস্থায়ী চির ধরেনি, এবং পরে ত্রৎস্কি বলশেভিকদের পক্ষে যোগ দিলে কোনো অসুবিধা হয়নি। এর থেকে মনে হয় ত্রৎস্কি ভুল করেছিলেন। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের সময় ও তারপরেও অবদান রেখেছিলেন। ১৯২১ সালে লেনিন বলেন, ত্রৎস্কি সংগঠন খুব ভালোবাসেন, কিন্তু কার্যকর রাজনীতি বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা নেই। বলশেভিক পার্টি থেকে ও তারপর দেশ থেকেই

ত্রৎস্কির বিতাড়ন বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে পুনর্বিচারের প্রয়োজন, কেননা তা গোটা বিশ্বের বাম আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পুনর্বিচার চিরকালই খুব কঠিন।

কিন্তু যাঁরা ভাবেন মৃত্যুর আগে ত্রৎস্কি সমাজবাদকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা ত্রৎস্কির ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালের লেখাটা পড়ে হয়তো অবাক হবেন।

''আমার জীবনের সচেতন ৪৩ বছর ধরে আমি বিপ্লবী ছিলাম, আর তার মধ্যে ৪২ বছর আমি মার্কসবাদী হিসেবে লড়াই করেছি। আমাকে যদি জীবন আবার শুরু করতে বলা হয়, আমি নিশ্চয়ই এদিক-সেদিক দু-একটা ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে চাইব, কিন্তু আমার জীবনের মূল ধারা বদলাব না। আমি একজন শ্রমিকশ্রেণির মার্কসবাদী বিপ্লবী, একজন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ও ফলত একজন অজেয় নিরীশ্বরবাদী হয়েই মরব। কম্যুনিস্ট ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস এতটুকুও কমেনি, এমনকী আমার যৌবনের দিনগুলোর চাইতে আজ সেটা বেড়েছে। নাতাশা এখনই এসে আমার বারান্দার দিকে জানলাটা বড়ো করে খুলে দিল যাতে আরও বাতাস আমার ঘরে ঢুকতে পারে। আমি এখন দেয়ালের নীচে থাকা সেই একটুকরো ঝকঝকে সবুজ ঘাসে ঢাকা ফালিটি দেখতে পাচ্ছি, আর দেয়ালের ওপরে পরিস্কার নীল আকাশ, চারিদিকে সূর্যের আলো— জীবন বড়ো সুন্দর। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর সব আবর্জনা পরিস্কার করবে, সব অত্যাচার আর হিংস্রতা, আর জীবনের অশেষ দান পুরোমাত্রায় ভোগ করবে।'''-(লিও ত্রৎস্কি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০)

জোসেফ স্তালিন (১৯২৯-৫৩ পর্যন্ত ইউএসএস আর-এর কর্ণধার)

স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পোন্নত ও সশস্ত্র ক্ষমতার চূড়ায় গিয়ে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠেছিল। স্তালিন কথাটার অর্থ ইস্পাতের মানুষ, আর স্তালিন সেরকমই ছিলেন। নাজিদের পরাস্ত করার মতো যুদ্ধ করার বাহিনী তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। তিনি প্রায় সিকি শতক জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন।

তাঁর বাবা ছিলেন একজন মদ্যাসক্ত মুচি, যিনি ছেলেকে মারধোর করতেন, আর মা ছিলেন ধোপানি। বালক অবস্থায় স্তালিনের গুটিবসন্ত হবার ফলে সারা জীবন মুখে ক্ষত থেকে গিয়েছিল। কৈশোরে জর্জিয়ান অর্থোডক্স চার্চে পুরুতগিরি শেখার স্কুলে তিনি স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৯৯ সালে সেই পাঠশালা থেকে তিনি বিতাড়িত হন— অপরাধ মার্কসবাদ প্রচার।

কিন্তু স্তালিনের পরেই সোভিয়েট রাশিয়া কী করে এমন লোকেদের হাতে গেল যাঁরা স্তালিনের সব পথকেই ভুল বলল?

এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দ্য কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল -এর ১৭-তম বর্ধিত প্লেনাম-এ (ডিসেম্বর ১৯২৬) স্তালিন নিজেই এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন-''যদি পুঁজি সোভিয়েত রিপাবলিককে ভেঙে ফেলতে পারে তাহলে কী হবে? তাহলে সব পুঁজিবাদী দেশ ও তাদের উপনিবেশগুলিতে অন্ধকারময় প্রতিবিপ্লবী দিন আসবে, শ্রমিকশ্রেণি ও অত্যাচারিত মানুষের ওপর নেমে আসবে চরম অত্যাচার, আন্তর্জাতিকভাবে কুম্যনিজম তার সম্মান হারাবে।'' কিন্তু স্তালিন এসব বলা সত্ত্বেও ক্রুশ্চেভ-এর মতো তোষামুদে বিভীষণ তাঁর চারপাশেই ছিল, আর সেটাই ছিল তাঁর চরমতম ভুল।

আবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, ১৯৫৮-৬০ সময়পূর্বে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি, এবং ১৯৫৬ সালে ক্রুশ্চেভের করা স্তালিনের সম্পূর্ণ নেতিবাচক সমালোচনা, চিন এ-দুটোকেই মানতে অস্বীকার করে। এটা ইতিহাসের সবথেকে দুঃখের সময়, আর এই কারণেই বাম আন্দোলন শক্তি হারায়।

স্তালিন নিজেও কিন্তু চিনের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, এবং তার ফলে চিনের কম্যুনিস্টদের অসুবিধাই হয়েছে। তবুও চিনের কম্যুনিস্ট দল স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের মুখে তাঁর চরম নিন্দাবাদ মেনে নিতে রাজি ছিল না। চিনের বিপ্লবের আগে, চিনের কম্যুনিস্ট দল তখনও বেশ ছোটো একটি দল। স্তালিন চিনের জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনতাং দলকে সমর্থন করে চিনের ছোটো কম্যুনিস্ট দলকে কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে মিলেমিশে বুর্জোয়া বিপ্লব করতে পরামর্শ দেন, এবং বলেন সোভিয়েত ধরনের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের জন্য তখনও চিন প্রস্তুত নয়। চিনের কম্যুনিস্টরা তাঁর কথা শোনেননি, কেন না ১৯২৭ সালের ১২ এপ্রিল সাংহাই-এর নিধনযজ্ঞ তাঁদের কুয়োমিনতাং-দের আসল মুখ চিনিয়ে দিয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লব সারা বিশ্বের মানুষের বুকে আশা জাগিয়েছিল। কিন্তু মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য বিরাট মূল্য দিতে হয়। সমাজবাদী রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র নিয়ে লোকে অনেক প্রশ্ন তোলে। কিন্তু ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, এসব দেশে মানুষ জবাই, বা কিউবা-র প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর ওপর বারংবার গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা, এগুলোও মনে রাখা দরকার। যাই হোক, সমাজতন্ত্র বিশ্বে সাময়িকভাবে পিছু হটেছে, তাই মানুষের আশা-আকাঙ্খার পথে সাময়িক বাধা পড়েছে।

■ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব :

১৯৪৫ -এর আগস্ট বিপ্লবে ভিয়েতনামে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক তৈরি হয়। প্রথম ইন্দোচিনের যুদ্ধে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী সেনা ১৯৪৫-র দিয়েন বিয়েন ফু-র লড়াই হারে, উত্তর ভিয়েতনামে হো চি মিন-এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতায় আসে। ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদী সেনার সঙ্গে লড়াই, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ, চলে (১৯৫৭-৭৫)। শেষে কম্যুনিস্ট গেরিলা সৈন্যদের আক্রমণের ফলে আমেরিকার সৈন্য সায়গন ছাড়তে বাধ্য হয়, উত্তর দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলন ঘটে ও সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম তৈরি হয়। আমেরিকার সঙ্গে এই অসম যুদ্ধে ভিয়েতনামের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়।

১৯৪৮ সালে কোরিয়ায় সোভিয়েত-সমর্থিত ওয়ার্কার্স পার্টি অফ কোরিয়া কিম-ইল-সুং-এর নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসে ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্ রিপাবলিক অফ কোরিয়া গড়ে তোলে।

১৯৫৯-র কিউবা বিপ্লব ছিল জাতীয়বাদী বিপ্লব। তার নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গেভারা পুতুল প্রেসিডেন্ট বাতিস্তাকে পরাজিত করেন, ও পরে কিউবায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

বাতিস্তা প্রথমবার নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু তারপর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখল করেন।

তিনদিনের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে কঙ্গোয় পিপলস্ রিপাবলিক স্থাপিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় সেনা প্রধান সুহোর্তো এক সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সুকার্নো- কে পদচ্যুত করেন। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি সুকার্নো-র পক্ষে দাঁড়ায়। সুহার্তো ক্ষমতা হাতে নিয়েই কম্যুনিস্ট সন্দেহে হত্যাকান্ড শুরু করেন। ১৯৬৫-৬৬ -র ইন্দোনেশিয়ার ম্যাসাকার, ইন্দোনেশিয়ান জেনোসাইড বা ইন্দোনেশিয়ান কম্যুনিস্ট-নিধন নামে কুখ্যাত এই কান্ডে কয়েকমাস ধরে হত্যালীলা ও গণবিক্ষোভ চলে, সেনা ও সরকার কম্যুনিস্ট বা কম্যুনিস্টদের ওপর সহানুভূতি আছে এমন সবাইকে হত্যা করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তথ্যগুলো এব্যাপারে সর্বত্র এক কথা বলে না। সব থেকে স্বীকৃত ও পরিচিত তথ্য অনুসারে, পাঁচলাখ থেকে দশলাখ মানুষকে এভাবে হত্যা করা হয়; কিন্তু সম্প্রতি পাওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে ঐ সংখ্যা কুড়ি লাখ থেকে ত্রিশ লাখ হবে।

লাওসে গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্ট লাও পিপলস্ রেভোলিউশনারি পার্টি ১৬৭৫ সালে ক্ষমতায় আসে, সে দেশে কম্যুনিস্ট-চালিত লাও পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক স্থাপিত হয়।

১৯৭০ সালে ডা. সালভাদোর আলেন্দে চিলি-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন। তিনি দেশের বড়ো শিল্পকে জাতীয়করণ করেন, কৃষিতে সমবায়ের ওপর গুরুত্ব দেন। এইসব ও আরও কিছু কারণে চিলি-র পার্লামেন্ট ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। ১৯৭৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর, আলেন্দেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সেনা অভুত্থান হয়, আর তার পেছনে ছিল আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা বিভাগ সিয়া (CIA) । সেনাবাহিনী আলেন্দের লা মনেদ প্রাসাদ ঘিরে ধরে, আলেন্দে তাঁর শেষ ভাষণে বলেন, তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না। ঐ দিন আলেন্দে রাইফেলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন, অন্তত চিলি-র আদালত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে ২০১১ সালে এক তদন্তে তেমন রায়ই দেয়। আলেন্দের মৃত্যুর পর জেনারেল অগুস্তো পিনোচেত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে অস্বীকার করেন, ফলে তারপর থেকে ১৯৯০ সাল চিলি মিলিটারি শাসনে থাকে। তার আগে কিন্তু চিলির প্রায় চল্লিশ বছর টানা গণতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাস ছিল। পিনোচেত-এর মিলিটারি শাসন চিলি-র আইনসভা ভেঙে দেয় ও সংবিধানকে মুলতুবি রাখে, সমস্ত বিরোধীদের আক্রমণ করে, আলেন্দের হাজার হাজার সমর্থকদের অপহরণ, অত্যাচার ও হত্যা করা হয়।

নিকারাগুয়ার বিপ্লব একনায়ক আনাস্তাসিও সোমোজা দেবায়েল-কে ক্ষমতাচ্যুত করে, আর সান্দিনিস্তা- দের ১৯৭৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত ক্ষমতায় আনে।

এল সালভাদোর নামে ছোট্ট দেশটিতে গৃহযুদ্ধে ফারাবুন্দো মার্তি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, সংক্ষেপে এফএমএলএন (FMLN), মূলত মার্কসবাদী- লেনিনবাদী গেরিলাদের সংগঠন আমেরিকার মদতপুষ্ট মিলিটারি সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মিলিটারি সরকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবীদের জেলে পুরো দিচ্ছিল বা হত্যা করছিল, তার মধ্যে কুখ্যাত হল এল মোজোত হত্যাকান্ড। এফএমএলএন যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা ছিল ফারাবুন্দো মার্তি আর লেনিন।

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানচর্চার ওপর নভেম্বর বিপ্লবের অভিঘাত :

বিজ্ঞানীদের ওপর নভেম্বর বিপ্লবের অভিঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না। দুটো প্রধান ধারণাগত জায়গায় নভেম্বর বিপ্লব বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে।

প্রথম ধারণাটা হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা—যাতে রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া, সামন্ত্রতান্ত্রিক এক দেশ তার সমাজকে সংগঠিত করতে পারে, অনেক উন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলিকে কয়েক দশকের মধ্যে ধরে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজি জার্মানিকে পরাজিত করতে পারার একটা বড়ো কারণ ছিল ১৯২০-১৯৩০-এর দশক দুটো জুড়ে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন। ১৯১৭ সালের রাশিয়া যে কত পশ্চৎপদ ছিল সেটা এখন ভাবাই অসম্ভব। তার আশি শতাংশ অধিবাসী ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। বলার মত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র নব্বইটি, আর সেখানকার মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বারো হাজার। ১৯৪১ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটশো, আর ছাত্রংসংখ্যা দাঁড়ায় ছ-লক্ষ সাতষট্টি হাজারের বেশি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারী শিল্পের মেলবন্ধন দুয়েরই দ্রুত উন্নতি করতে সাহায্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদ্যুতিকরণ আর তার উড়ানশিল্প (এরোপ্লেন ইত্যাদি)-র উন্নতি এমনই এক মেলবন্ধনের ফসল।

দ্বিতীয়ত, অক্টোবর বিপ্লব বিজ্ঞান ও সমাজকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখিয়েছিল। এর ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সমাজ এই নতুন একাডেমিক বিষয়টি তৈরি হল। যাঁরা এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি -সমাজ বিষয়টি পড়েন তাঁরা যে সবাই নভেম্বর বিপ্লব বা মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের ঋণ স্বীকার করেন, তা নয়। কিন্ত তাঁরাও ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছায় বিরাট বিজ্ঞানী ও অসাধারণ মার্কসবাদী জে ডি বার্নাল যে এই বিষয়টির পথিকৃৎ, সেটা তাঁরা স্বীকার করেন। ব্রিটিশ মার্কসবাদী ও বহু বিষয়ে পারদর্শী বার্নাল তাঁর 'বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা' বইটিতে যুক্তি সাজান যে সোভিয়েত দেশের এত কম সময়ে এতখানি এগিয়ে যাবার কারণ হল সে দেশ বিজ্ঞানকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়েছে, গবেষণা ও বিকাশ-এর খাতে সীমিত অর্থের একটা বড়ো অংশ খরচ করেছে, আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগিয়েছে।

পরিকল্পিত বিজ্ঞানের হাত-ধরাধরি করে পরিকল্পিত বিকাশের এই মডেলটি ভারত ও অন্যান্য নব্য-স্বাধীন দেশ গ্রহণ করেছিল। আর ভারত কেবল পরিকল্পনার এই মডেলটি সোভিয়েত থেকে নিয়েছিল, তা নয়; ভারত তার বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোও ঐরকম পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করেছিল। জে ডি বার্নাল ঐ সময় ভারতে মূল পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন জে বি এস হ্যালডেন, আরেকজন

বড়োমাপের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও মার্কসবাদী। হ্যালডেন ভারতে এসেছিলেন, এবং শেষে ভারতের নাগরিকত্ব পর্যন্ত নিয়েছিলেন।

অনেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ১৯৩১ সালের লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, বার্নাল তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৩১ সালের ঘটনাকে একবার ফিরে না দেখে, বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় মার্কসিস্ট চিন্তাধারার প্রভাব বোঝা যাবে না। সেখানে রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা বুখারিনের নেতৃত্বে একদল প্রতিভাবান সোভিয়েত বিজ্ঞানী তাঁদের তত্ত্ব ও মত প্রকাশ করেন। বোরিস হেসেন তাঁর নিউটন নিয়ে গবেষণাকর্ম ''দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পদ্ধতি ও মার্কস-প্রণীত এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্যে নিউটনের সময়ের সঙ্গে তাঁর কর্মের সম্পর্ক বিশ্লেষণ'' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেটি অনেকের ওপরেই বিরাট প্রভাব ফেলে। এই প্রথম বিজ্ঞানের ইতিহাসকে ব্যক্তির কর্ম হিসেবে না দেখিয়ে সামাজিক পদ্ধতি হিসেবে বোঝা হল। বার্নাল, নীডহ্যাম, জেবিএস হ্যালডেন, ল্যান্সলট হগবেন, এবং আরও অনেক তরুণ বিজ্ঞানীর কাছে এটা ছিল বিজ্ঞানকে দেখার একেবারে নতুন এক পদ্ধতি। এরপর বিজ্ঞানের ইতিহাস-কে আর আগের মতো করে দেখা সম্ভব ছিল না।

বিজ্ঞান ব্যাপারটা নিয়ে এই নতুন ধারার চিন্তা ব্রিটেনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ফ্রান্সে এই চিন্তাপ্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছিল, আর জোলিও কুরি-র বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে একমত হচ্ছিলেন। আমরা এরমধ্যে দেখেছি যে তৃতীয় বিশ্বের অনেকটা জুড়ে, এমনকী ইউনাইটেড নেশনস-এ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে এই চিন্তাধারা কাজে লাগছিল। যাঁরা বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সভ্যতা— আমেরিকা, সাম্রাজ্যবাদী বা আগে সাম্রাজ্য ছিল এমন দেশগুলো- তাদের সঙ্গে দৌড়ে হেরে গেছে, তাঁদের মনে রাখা উচিত একটি অতি পশ্চাৎপদ গ্রামবহুল দেশে প্রথম সমাজবাদ গড়ে উঠেছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পরে এক বড়ো লড়াই চলেছিল। আর তার পরেও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আক্রমণ চলছিল। সে সব সামলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে, তারপর দ্রুত ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হয়েছিল সোভিত্মেয়ত ইউনিয়ন-কে। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো এইসময় একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আর্থিকভাবে বয়কট করেছিল। সোভিয়েত নেতারা বুঝেছিলেন যে ভারী শিল্প ও তার ওপর ভিত্তি করে সামরিক শক্তির বিকাশ না করতে পারলে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। একটা রাষ্ট্র, যেখানে বিপ্লবের আগে একটা লাইটের বাল্ব পর্যন্ত তৈরি হত না, সে কী করে এসব কিছুই করে ফেলল? একদম গোড়া থেকে শিল্প তৈরি করার জন্য বিরাট অর্থ লগ্নি করাটাই সব ছিল না, মানুষের বিকাশে সোভিয়েত দেশ মন দিয়েছিল। এ দেশ নবীন প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার জন্য আসল লগ্নিটা করেছিল, আর তাদের শিল্প গড়ে তোলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছিল। শিল্পের বিকাশ যতটা কারখানা আর যন্ত্রপাতির সঙ্গে জড়িত, ততটাই জড়িত মানুষ ও তার জ্ঞানের সঙ্গে। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছিল পরিকল্পনার মাধ্যমে, আর সেখানেই সমাজবাদী অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাইতে আলাদা হয়ে গেছিল, কেননা পুঁজিবাদী অর্থনীতি 'বাজারই ঠিক করবে কি করা দরকার' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কিছুদিন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশ্চাত্যকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছিল। সোভিয়েতই প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠায়। গণিত ও পদার্থবিদ্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এক নতুন শক্তি হিসেবে উঠে এসেছিল আর লেসার ইত্যাদি মৌলিক প্রযুক্তিতে, কমপিউটারের নবপ্রযুক্তি লিনীয়ার প্রোগ্রামিং, নন-লিনীয়ার সিস্টেমের ডায়নামিক্স বুঝতে (পরে যেটা ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য ক্যাওস/ফ্র্যাকটাল তত্ত্ব হিসেবে পুনরাবিষ্কার করে), এবং এরকম অনেক অগ্রগতিতে সোভিয়েত বিজ্ঞান পথিকৃতের কাজ করেছিল। অবশ্যই একথা সত্যি যে সোভিয়েত অনেক জায়গায় বড়ো রকমের হোঁচট খেয়েছিল, যেমন জীববিদ্যায় উদীয়মান জিনতত্ত্বের বিরোধিতা করে উদ্ভিদবিজ্ঞানী লাইসেঙ্কোর তত্ত্ব সমর্থন করা। এই একটা বড়ো বিচ্যুতি ছাড়া সোভিয়েত বিজ্ঞান আরও অনেক কাজ করতে পেরেছিল, কিন্তু সেসব কাজকে যে কোনভাবে ইতিহাস থেকে মুছে দেবার চেষ্টা চলছে। যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যর্থ হয়েছিল সেটা হল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের কাজটা ঠিকঠাক করলেও সেই কাজ ভারী শিল্পে ঠিকমত লাগানো যায়নি। আমরা এখন জানি সামরিক ও মহাকাশ-প্রযুক্তি, এই দুই খাতে সোভিয়েতের অগ্রগতির বড়ো বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। এতে সামরিক ও মহাকাশ-প্রযুক্তিতে বড়ো উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু দেশের সবধরনের সম্পদ এতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছিল, ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অন্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। ভারী শিল্পে এগিয়ে থাকা ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য প্রযুক্তির যেমন দ্রুত উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল, সেটা করার মতো সম্পদ সোভিয়েত দেশে ছিলই না।

অক্টোবর বিপ্লব আমাদের যে পথ আর যে স্বপ্ন দেখিয়েছে। সে ব্যাপারে শেষ কথাগুলো বলা যায় মায়া আঞ্জেলু-র কবিতার ভাষায়।

তবু আমি উঠি

তোমরা আমাকে তোমাদের ইতিহাস বইতে নীচে নামাতে পারো
অনেক প্যাঁচানো মিথ্যা তোমাদের হাতিয়ার

তোমরা আমাকে ধুলোয় ফেলে দিতে পারো
কিন্তু ধূলিকণার মতোই আমি উঠে দাঁড়াব।
চাঁদ আর সূর্য যেমন উঠবেই
জোয়ার আর ভাটা যেমন খেলবেই
মানুষের বুকে যেমন আশা জাগবেই
আমি সেরকমই উঠে দাঁড়াবই

তুমি কি আমাকে ভাঙাচোরা দেখতে চাও?
মাথা যার নত, চোখ নামানো নীচে?
দু-কাঁধ যেন অশ্রুর মতো ঝুঁকে পড়ছে
আমার ভেতর থেকে উঠে আসা কান্নার দুর্বলতায়।

তোমার কথা দিয়ে তুমি আমায় বিদ্ধ করতে পার,
তোমার দৃষ্টি দিয়ে করতে পার খন্ড-বিখন্ড
তোমার ঘৃণা দিয়ে আমাকে মেরেও ফেলতে পার,
কিন্তু তবু বহমান বাতাসের মতো আমি উঠে দাঁড়াবই।

ইতিহাসের ঘৃণার কুঁড়েঘর থেকে আমি উঠব
আমার যন্ত্রণাবিদ্ধ অতীত থেকে আমি উঠব
আমি নিকষকালো এক মহাসমুদ্র, বিরাট ও ক্ষুব্ধ
ফুলে-ফুঁসে উঠে আমি জোয়ারকে ধারণ করব।

অত্যাচার আর ভয়ের রাতগুলো পিছনে ফেলে
আমি উঠব
আশ্চর্য ঝকমকে এক ভোরের আলোয়
আমি উঠব
আমার পূর্বপুরুষের কাছে পাওয়া উপহার নিয়ে আসব
আমি স্বপ্ন, আমি ক্রীতদাসের আশা হয়ে উঠব।
আমি উঠব
আমি উঠব
আমি উঠব।

— মায়া আঞ্জেলু
[সৌজন্য : 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে']

World Health Day 2018: Theme : Universal health coverage : everyone, everywhere. Slogan : Health for All

■ **Key messages :**

World Health Day messages :

- Universal health coverage is about ensuring all people can get quality health services, where and when they need them, without suffering financial hardship.
- No one should have to choose between good health and other life necessities.
- UHC is key to people's and nations' health and well-being.
- UHC is feasible. Some countries have made great progress. Their challenge is to maintain coverage to meet people's expectations.
- All countries will approach UHC in different ways: there is no one size fits all. But every country can do something to advance UHC.
- Making health services truly universal requires a shift from designing health systems around diseases and institutions towards health services designed around and for people.
- Everyone can play a part in the path to UHC, by taking part in a UHC conversation.

■ **Too many people are currently missing out on health coverage :**

"Universal" in UHC means "for all", without discrimination, leaving no one behind. Everyone everywhere has a right to benefit from health services they need without falling into poverty when using them.

Here are some facts and figures about the state of UHC today :

- At least half of the world's people is currently unable to obtain essential health services.
- Almost 100 million people are being pushed into extreme poverty, forced to survive on just $1.90 or less a day, because they have to pay for health services out of their own pockets.
- Over 800 million people (almost 12 percent of the world's population) spend at least 10 percent of their household budgets on health expenses for themselves, a sick child or other family member. They incur so-called "catastrophic expenditures".
- Incurring catastrophic expenses for health care is a global problem. In richer countries in Europe, Latin America and parts of Asia, which have achieved high levels of access to health services, increasing numbers of people are spending at least 10 percent of their household budgets on out-of-pocket health expenses.

What UHC is -

- UHC means that all people and communities receive the health services they need without suffering financial hardship.

- UHC enables everyone to access the services that address the most important causes of disease and death and ensures that the quality of those services is good enough to improve the health of the people who receive them.

What UHC is not

- UHC does not mean free coverage for all possible health interventions, regardless of the cost, as no country can provide all services free of charge on a sustainable basis.
- UHC is not only about ensuring a minimum package of health services, but also about ensuring a progressive expansion of coverage of health services and financial protection as more resources become available.
- UHC is not only about medical treatment for individuals, but also includes services for whole populations such as public health campaigns - for example adding fluoride to water or controlling the breeding grounds of mosquitoes that carry viruses that can cause disease.
- UHC is not just about health care and financing the health system of a country. It encompasses all components of the health system: systems and healthcare providers that deliver health services to people, health facilities and communications networks, health technologies, information systems, quality assurance mechanisms and governance and legislation.

পশ্চিমবঙ্গের ডেঙ্গি চিত্র

জেলা	২০১৬	২০১৭
উত্তর ২৪ পরগনা	৮,২৫০	১৮,১৬১
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	১,৭২২	৩,৪২৯
নদীয়া	১,৫৬৪	২,৮৫৬
মালদা	৪১২	১,২৬৮
দার্জিলিঙ	১৬৫	১,২৬৬
মোট	২৩,২১৩ (মৃত্যু : ৪৫)	৩৬,৮৯৬ (বৃদ্ধি ৫৮.৯%) (মৃত্যু : ৩৮)

দুঃসময়ের লেখা

মৃত্যুঞ্জয় বাউরী

অসম যুদ্ধে বিধ্বস্ত মনের প্রাচীর!
রক্ত-ঘাম শুকোয় না কপালে।
মৃত্যুর পাহারাদার একা পুড়ছে দাবানলে...

ডাক্তার এখন পালাতে চাইছে প্রতিদিন!
নিজের কাছ থেকে,
মানুষের কাছ থেকে...
আজন্মলালিত স্বপ্নের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে
ডাক্তার পালাতে চাইছে প্রতিদিন।
বিশ্বাসহীনতার জ্বরে আক্রান্ত রক্ত
বা ইচ্ছে নদীর জলে...
কোন্ ওথ্ আছে? কোথাও কি?
কোন ছলে?
ভরে দেবে শূন্যতার ঝুলি?
বাতাসে ভাসছে শুধু বুলি!
পচা, দুর্গন্ধময় বুলি!
এই শিশুটি কার?
কার কোল থেকে এসে হবে সে ডাক্তার?
সময় নেই এ-সব ভাবার
দন্ড শুধু এক অবহেলার!
জল নেই! খাদ্য নেই! স্বাস্থ্য নেই!
পদে পদে মৃত্যুর আঁধার!
এর দায় নেবে না সংসার,
হে ধর্মাবতার?

ডাক্তার পালাতে চাইছে প্রতিদিন!
এই ধ্বংসস্তূপ থেকে... এই মৃত্যু থেকে...
জ্বলছে বুকে সামাজিক ঋণ!

■ **গুরুত্বপূর্ণ গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন ২০১৭ :**

- মোট আসন : ১৮২ ; প্রয়োজনীয় আসন : ৯২
- বিজেপি : ৯৯ (৪৯.১% ভোট); কংগ্রেস : ৮০(৪১.৪ % ভোট); কংগ্রেস সমর্থিত অন্যান্য : ০৩
- বিজেপির টানা ষষ্ঠবার জয় এবং ২২ বছরের শাসন
- গ্রামে আসন : ১২৭ [কংগ্রেস ৭১; বিজেপি ৬৩ (৪৬% ভোট)]
- শহরে আসন ৫৫ : [বিজেপি ৪৫ (৪৭% ভোট) , কংগ্রেস ১০ (৩৮% ভোট)]
- ৫০টি জেতা আসনে বিজেপির থেকে কংগ্রেসের ব্যবধান ১৫০০ ভোটের কম।
- তারমধ্যে ১৮টি ও ১২টি আসনে ব্যবধান কম যথাক্রমে ৫০০ ও ২৫০-র কম ভোটে।

চিঠিপত্র, রিপোর্ট

চিকিৎসক নিগ্রহ বন্ধ হোক

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতোই লাগাতার ডাক্তার নিগ্রহ চলছে রাজ্যজুড়ে। সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না পেয়ে মানুষের মৃত্যু মিছিলও বাড়ছে। চিকিৎসা পরিকাঠামো— প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর দাবি, কিংবা ডাক্তার নিগ্রহকারীদের শাস্তির দাবি নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন, তাদের ওপর এবং শাসকদলের বশংবদ নয় এমন চিকিৎসকদের ওপর নেমে আসছে প্রশাসনিক সন্ত্রাসের খাঁড়া। এমনকি তাঁদের বাক্ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছে প্রশাসন—যা চিকিৎসার পরিবেশকে কলুষিত করছে। মানুষ ক্রমাগত হারাচ্ছেন স্বাস্থ্যের অধিকার।

যখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল অংশ সরকার দ্বারা পরিচালিত ছিল, তখন কিন্তু এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।' ৯০ -এর দশক থেকেই এরাজ্যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতিতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একের পর এক পরিষেবা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে থাকে তদানীন্তন রাজ্য সরকার। ১৯৯৩-এর গ্যাট চুক্তির প্রভাব এসে পড়ে ২০০২-এর দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে। এর ধারাবাহিকতায় 'ন্যাশনাল রুরাল হেল্‌থ মিশন ২০০৫', স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অনেকাংশে কর্পোরেট নির্ভর এবং বিমা নির্ভর করে তোলে। চিকিৎসা হয়ে ওঠে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বর্তমান সরকার ২০১২ সাল থেকেই রাজ্য জুড়ে প্রান্তিক জায়গায় মাল্টি সুপার হাসপাতাল তৈরি, SNCU, CCU-এর নামে হাসপাতালে হাসপাতালে কাঁচের ঘর তৈরি, ফ্রি চিকিৎসার ঘোষণা, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান ইত্যাদি পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা জগতে এক চমক সৃষ্টি করে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা শত গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক লোকবল এবং পরিকাঠামো, সদিচ্ছা এবং বাজেট বরাদ্দ কোনওটাই না থাকায় প্রত্যেকটি প্রকল্পেরই অন্তঃসার শূন্যতা আজ আমাদের চোখে পড়ছে। যদিও বহু মানুষ এখনো আশায় বুক বাঁধছেন! ফলে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা না পেয়ে মানুষ যখন নিকট পরিজনদের হারাচ্ছেন, যখন সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ছে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের ওপর। সরকার সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্ত ত্রুটির দায় সুকৌশলে ডাক্তারদের ওপর চাপাচ্ছে। আরেকদিকে রাজ্যজুড়ে আইন শৃঙ্খলা অবনমন থেকে শুরু করে নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে শাসকদলের ছত্র ছায়ায় একদল মানুষ যেমন দাদাগিরি দেখিয়ে চলছে তার ছাপ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেও পড়ছে। ফলে তুচ্ছ কারণে বা বিনা কারণে ঘটছে চিকিৎসা নিগ্রহের ঘটনা। বর্তমান চিকিৎসক নিগ্রহের শতকরা ৯০ ভাগই সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ঘটছে। সম্প্রতি যা ডাক্তারের গায়ে বিষ্ঠা মাখানো, মহিলা ডাক্তার ও নার্সের শ্লীলতাহানি, ডাক্তারকে পুজো মন্ডপে অসুর সাজানো থেকে শুরু করে ডাক্তারের মাথায় পিস্তল ঠেকানোর পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং তা বহুগুণ বেড়ে গেছে গত ৩ মার্চ '১৭ যেদিন রাজ্য সরকার ওয়েস্টবেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিসমেন্ট অ্যাক্ট চালু করে তারপর থেকে। ঠিক একই দিনে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১৭ পার্লামেন্টে পাশ করায় যার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিমা নির্ভর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এই চূড়ান্ত নৈরাজ্য যেমন চলছে, তেমনই স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসকদের ন্যায্য পাওনা নিয়েও চলছে চরম বঞ্চনা। বকেয়া ডিএ ৫৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ছুটির ন্যায্য অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, ট্রেনি রিজার্ভের অধিকার প্রায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রান্সফার, পোস্টিং, প্রোমোশন নিয়ে চলছে চূড়ান্ত দুর্নীতি ও দলবাজি। এসবের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে নেমে আসছে প্রশাসনিক সন্ত্রাস। সম্প্রতি দেশের সংবিধানকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাক্ স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেই তার ওপর নেমে আসছে সাস্পপেনশন, শো কজ-এর খাঁড়া অথবা বদলি করা হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

পে কমিশন বসার পর দু'বছর হয়ে গেছে। অন্যসব রাজ্য নতুন বেতনক্রম চালু করেছে। কিন্তু এরাজ্যে সরকার এ বিষয়ে নির্বিকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত অধিকার এবং ক্ষমতা অন্যায়-অগণতান্ত্রিকভাবে আজ আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যের মতো বৈজ্ঞানিক একটি বিষয়কে নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে দেখা এবং একদল আমলার হাতে প্রশাসনের ভার ন্যাস্ত হওয়ায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আজ ভেঙে পড়ার মুখে। ক্রমাগত তা কেবল কর্পোরেট ও বিমা মালিকদের মুনাফাকেই সুনিশ্চিত করছে।

এই দমবন্ধ হওয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে 'সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম।' আমরা এর বিরুদ্ধে এককভাবে গত সাড়ে ছ বছর ধরেই লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করে চলেছি। বর্তমানে যৌথভাবে অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সথে গত ১৫ মাস ধরে অসংখ্য মিছিল, প্রতিবাদসভা, বিক্ষোভ, কনভেনশন ইত্যাদি কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি। যার ফলে প্রশাসন আজ ভীত সন্ত্রস্ত; কিন্তু আরও বেশি আক্রমনাত্মক। তাই তারা বাক্ স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছে। এই লাগাতার এবং ঐতিহাসিক তথা গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনে হাজার হাজার প্রতিথযশা চিকিৎসক রাস্তায় নেমেছেন। বিগত' ৭০-৮০-র দশকের ডাক্তার ও জুনিয়ার ডাক্তারদের গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে চিকিৎসকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই আমাদের আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করছে। আবার আন্দোলনের যৌথ নেতৃত্বের একাংশের হটকারী ও আপোসকামী সিদ্ধান্ত আন্দোলনে আগত বহু চিকিৎসককে ব্যথিত করেছে এবং অনেকে হতাশায় ভুগছেন— যা আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করছে। সব কিছু মাথায় রেখে যৌথ আন্দোলনকে আরও দুর্বার করে তুলতে আন্দোলনের প্রকৃত শক্তিকে আজ চিনতে শেখা খুবই জরুরি। তাই আসুন এই যৌথ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী করে তুলি।

— সার্ভিস ডক্টরস্ ফোরাম

Press Release on 'National Medical Commission (NMC)' Bill From Resident Doctors' Association, AIIMS, New Delhi, 08.01.2018

Discussion on NMC bill organized by RDA AIIMS in the presence of Vice president DMA and president JACSDO Dr. Rajeev Sood, DMC registrar Dr. Girish Tyagi, Dr. Anoop Saraya HOD dept.of gastroenterology AIIMS, and various faculty of AIIMS like Dr. Minu Bajpai, Dr. Piyush Ranjan. Representatives from RDA AMU Aligarh, ARD PGI Chandigarh, RDA Lady Hardinge hospital, RDA RML hospital, representatives of FORDA, and various RDAs from all over India, private practitioners from Delhi, Haryana, Punjab, UP, Rajasthan, delegation of AYUSH doctors' association from Haryana, representatives of Student Union, Nurses Union and other associations of AIIMS.

In the presence of above mentioned dignitaries and around 500 audiences, the NMC bill was discussed in details and following conclusions are made : -

1) We reject this bill in it's present form for all aspects
2) This bill requires a complete makeover rather than amendments because it will not solve the purpose for which it was made.

Problems with The Bill :

1) This bill promotes bureaucratization and politicization of medical education and doesn't provide independence to the NMC. It will be more like the puppet in the hands of government and bureaucrats. Most of the members are nominated by the government and suggested by bureaucrats.
2) Decision on fees regulation of only up to 40 % and providing free hand to private medical colleges is the worst part of the bill and promote capitalization and will increase the cost of medical education to tremendous level. It will move the medical education out of the reach of the poor and underprivileged section of society.
3) No strict guidelines to regulate functioning of private medical colleges was mentioned in the bill, only monetary penalty that too not specified
4) National licentiate examination (NLE) is a welcome step for quality assurance of medical education but there is no clear description that how will this exam be conducted, whether objective MCQ based, subjective or clinical assessment or all together. There is no description whether bridge courses holder will also have to appear for NLE or not. And if not then how to ensure quality for bridge course holders. As this exam will also give entry to post graduate courses but every year around 65000 doctors pass MBBS and give PG entrance exam for around 15000 seats. So what will happen to all those who cleared licentiate exam but didn't get PG seat, whether they have to appear for NLE again next year or score of previous year will be calculated, and it will create a big backlog and further deteriorate the situation of medical graduates. Overall the concept is good but India is not ready for it yet.
5) No clear guidelines for registration process, whether registration is required every year or not
6) Though granting permission for establishing medical college is big task but the whole authority is given to single board named medical assessment and rating board (MARB) with only one president and two members of board.
7) A person who wants to establish the medical college and was refused by MARB and also by commission can appeal to government and might get permission. This opens doors for corruptions as a closed ally of politician might be benefitted from this clause.
8) No clause for grievances redressal for students if they felt betrayed or looted by private medical colleges. No provision for them to say their words to board or commission.
9) Bridge course : - this is the most unacceptable step of government, everyone in single voice completely refused the concept of bridge course. There is no clear definition of bridge course, what purpose it will serve, where they be recruited, whether they appear for licentiate examination, whether they will be trained enough to be liable for medico legal cases and medical negligence, if not then is it ethical to allow them to practice, overall medical sciences and modern medicine are complicated issue to understand and government must consult medical professional before taking such irrelevant decisions because by doing so it will play with health of Indian public which will not be acceptable approach. Delegates from AYUSH also said that it's insult for AYUSH practitioners for asking them to do bridge course and practice allopathy like a registered quack.
10) There is no description of foreign citizens in the bill, if they want to get register in India then what examination they will appear.
11) No clear description regarding the necessity of National board of examination (NBE) why it won't be merged with NMC, why we need four boards in NMC and fifth as NBE.

Overall this bill has flaws in each and every section of it, we will not accept this bill in present form and will rewrite the complete bill with possible solutions as discussed in the meeting and will submit our proposed bill to the Chairman, Standing Committee and also to the Union Health Minister. We will also request the Chairman, Standing Committee to give us time to present our proposed bill in front of them. If our demands are not considered, then RDA AIIMS will lead the nationwide agitation and will come on roads for the betterment of medical education in India.

Thanking you

Dr. Harjit Singh Bhatti
President
RDA AIIMS, New Delhi

■ 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিমত :

ভারত সরকারের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতে পাঠিয়েছিল নিকাশি ও পানীয় জলের অধিকারের বিশেষজ্ঞ লিও হেলারকে। দুসপ্তাহ ভারতের বেশ কিছু জায়গায় ঘুরে তার রিপোর্ট :

- শুধু শৌচাগার তৈরি তৈরি করলেই খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ হবে না। মানুষের আচরণ পাল্টানোর পদ্ধতিও নিতে হবে। অনেক গ্রামকেই নির্মল গ্রাম ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ আগের মতই মাঠে যাচ্ছেন।
- কম খরচে তৈরী হওয়া শৌচাগার যাতে ব্যবহার হয়, তার জন্য যথেষ্ট জল সরবরাহের ব্যবস্থাও করতে হবে।
- শৌচাগার তৈরী করতে গিয়ে পানীয় জলের জোগান থেকে নজর সরে গেলে চলবে না।
- শৌচালয় ও সেপটিঙ্ক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে গিয়ে অসুখে অথবা দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এরা মূলত নীচু জাতির মানুষ। এই অভিযানে এদের কাজ, ঝুঁকি ও এদের প্রতি বৈষম্য বাড়ছে।
- অভিযানের লক্ষ্য পূরণের জন্য অমানবিক সব শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।
- লোগোর চশমার কাঁচ বদলে মানবাধিকারের কাঁচ বসানো উচিত।
- সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীরা রাস্তা থেকে নিঃখরচায় জল ভরে বস্তিতে গিয়ে জল বিক্রি করছে।

■ ফসল পোড়ানোর ধোঁয়াশা থেকে মুক্তির জন্য :

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বর্ষার ফলন তুলে শীতের ফসল লাগানোর আগে উত্তর ভারতে প্রচলিত ফসলের গোড়া পোড়ানোর ফলে দিল্লী সহ উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি ক্ষতিকর ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য পাঞ্জাব রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ 'সুপারাষ্ট্র ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' লাগানো 'কমবাইন্ড হারভেস্টর' যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলেছেন। এছাড়াও দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ধান বর্ষায় চাষ করার কথাও বলা হচ্ছে। এর ফলে শীতের ফসল বোনার আগে বর্ষার ফসলের গোড়া তোলার অনেকটা সময় পাওয়া যাবে।

অন্যদিকে পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মীরাটের ৫০ টি গ্রামের কৃষকরা পড়ে থাকা ধান, ধানগাছের গোড়া, আখগাছের পাতা পচিয়ে জৈব সার বানিয়ে পরিবেশ দূষণ অনেক খানি কমাতে পেরেছেন।

■ নৌসেনার প্রথম মহিলা পাইলট :

ভারতীয় নৌসেনার ইতিহাসে প্রথম পাইলট হিসাবে যোগ দিলেন উত্তরপ্রদেশের শুভাঙ্গী স্বরূপ। তারপরই কুনুরের নৌসেনা আকাদেমীতে যোগ দিলেন আরও তিনজন।

■ শিশু-নারী পাচার ও ঘরোয়া হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ সবার সেরা :

মানব ও শিশু পাচারে, যার সিংহভাগই বালিকা ও কিশোরী, যৌন দাসী বা যৌন ব্যবসায় দেশ বিদেশে যাদের বলপূর্বক নামিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং ঘরোয়া হিংসায় অর্থাৎ স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকদের বধূ নির্যাতন ও হত্যায় আমাদের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'বিশ্ব সেরা কন্যাশ্রীর বিশ্ব বাংলা' দেশের মধ্যে সেরা। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো'র ২০১৬ রিপোর্টে সব মিলিয়ে অপরাধে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লী এগিয়ে থাকলেও নারী পাচার ও মহিলাদের উপর হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। ২০১৫-'১৬ মহিলাদের উপর অপরাধ ২.৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা বেশীরভাগ অপরাধই নথিভুক্ত হয় না। রিপোর্টে যে ৩৫৭টি মানব পাচারের (কিশোরী ও তরুণী) উল্লেখ আছে তার ৪৪% পশ্চিমবঙ্গ থেকে। যে ১,১১,৫৬৯ টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে, তার ১৫% পশ্চিমবঙ্গের। স্বামী-শ্বশুরবাড়িতে বধূ নির্যাতনের যে ১.১০ লক্ষর কিছু বেশী অভিযোগ দায়ের হয়েছে তার মধ্যে ১৯,৩০২টি অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের। যা গোটা দেশের ১৮%। আরও লজ্জার বিষয় ভারতে মহিলাদের মধ্যে অ্যাসিড আক্রমণে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ এবং আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও খুব দুর্বল ভূমিকা।

খবরাখবর

- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে স্কুলশিক্ষকদেরও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সাড়ে চারলক্ষ স্কুল শিক্ষক এবং অনুমোদিত মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এবং আরও চার লক্ষ পার্শ্ব শিক্ষক, সর্বশিক্ষা মিশনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী প্রমুখ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেন। প্রত্যেকেই প্রাথমিকভাবে সপরিবারে দেড় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বীমার সুবিধা পাবেন। কঠিন অসুখ ও অস্ত্রপচারের জন্য মিলবে সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা।
- মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেন দেশটি একদিকে সৌদি আরবের ক্রমাগত বিমান থেকে বোমাবর্ষন অন্যদিকে ক্ষমতাসীন সুন্নী ও বিরোধী শিয়া গোষ্ঠীর যুদ্ধে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। ডব্লিউ.এইচ ও-র একটি তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল থেকে আগষ্ট'১৭ এই পাঁচ মাসে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ কলেরায় আক্রান্ত। মৃত্যু ২,০৪৮।
- রাজনৈতিক ইউনিয়নের পরিবর্তে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজনৈতিক ছাত্র কাউন্সিল গড়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১১ সেপ্টেম্বর' ১৭ যাদবপুর থেকে বিকাশভবন অবধি মিছিল করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।
- ভারতীয় নৌসেনার তরফ থেকে ছজন মহিলা নেভি অফিসার এই প্রথম আট মাসের বিশ্বপরিক্রমায় বেরোলেন। 'নভিকা সাগর পরিক্রমা'র উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ১০ সেপ্টেম্বর গোয়ার আই.এন.এস.মানদভি নৌসেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। দীর্ঘ যাত্রাপথে সারাই ও যোগান অক্ষুন্ন রাখতে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেম্যন্টেল, নিউজীল্যান্ডের লিটলেটন, ফকল্যান্ডের ফোর্ট স্টানলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন এই চারটি বন্দরে থামবে। এর আগে প্রস্তুতি হিসাবে নৌসেনারা আই.এন.এস মাদেই করে মরিসাশ এবং আই.এন.এস. তারিণী করে কেপটাউন অবধি অভিযান চালিয়েছিলেন।
- সঙ্ঘ পরিবার ও কেন্দ্রের মোদি সরকারের প্রবল প্রচেষ্টা সত্বেও নয়াদিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদে সম্মিলিত বাম ছাত্রজোটের কাছে ভরা ডুবির পর তাদের ঘোষিত দুর্গ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনেও বড়সড় ধাক্কা খেল এ.বি.ভি.পি.। কংগ্রেসের এন.এস.ইউ.আই.সভাপতি ও সহ সভাপতির পদে বিজয়ী হল। মোদি সরকারের হস্তক্ষেপে পূনর্গননা ইত্যাদি করে ঘুরপথে এবিভিপি সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকের পদ পেলেও তা কোর্টের বিবেচনাধীন।
- উন্নয়ন হোক না হোক, আর সেই 'উন্নয়ন' কর্পোরেট-পুঁজিপতি-ধনীদের জন্যও হোক না কেন— বিধানসভা নির্বাচনের আগে গুজরাটে মোদিভাইয়ের এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে দিদিভাইয়ের প্রচার তুঙ্গে। প্রতিশ্রুতি, বক্তৃতা, প্রচার মাধ্যমে ঢেউ। নরেন্দ্র মোদি প্রথমত একপ্রস্থ জাপানী বুলেট ট্রেন চালু ও তাকে ঘিরে শিল্প করিডোরের স্বপ্ন দেখালেন। তারপর মধ্যপ্রদেশের ও গুজরাটের কৃষক ও আদিবাসী গ্রামগুলিকে ডুবিয়ে, প্রকৃতি পরিবেশকে ধ্বংস করে নর্মদা নদীকে বেঁধে ফেলা সর্দার সরোবরের ৫ ৮০ কোটি কিউবিক মিটার জল। সম্পন্ন কৃষক ও পুঁজিপতিদের উপহার দিলেন। সেই জল আবার গুজরাট নির্বাচনের পর থেকে কৃষকরা পাচ্ছেন না। এরপর সাতপুরা রেঞ্জের সাধু পাহাড় ভেঙ্গে উন্মোচন হবে বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উচ্চ মূর্তি। দিদিভাই দিচ্ছেন অন্ডাল থেকে কলকাতা 'বুলেট প্রুফ' ট্রেন সহ অসংখ্য, অগুন্তি 'উন্নয়ন'-র তালিকা।
- গুজরাটে গোঁফ রাখার 'অপরাধে' দলিতদের মারধর করার দুটি ঘটনা সামনে আসার পরপরই ২৫ সেপ্টেম্বর রাজধানী গান্ধী নগরের ১৫ কি.মি. দূরে লিম্বোদরা গ্রামে মন্দিরে গরবা নৃত্য দেখার অপরাধে মারধোর করলে দলিত জয়েশ সোলাধি নামক এক দলিত যুবকের মৃত্যু হয়। ঘোড়া পোষার জন্য মারা হয় একজনকে।
- মহরম-দশেরার সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ব্যক্তি আহত হন ও প্রচুর সম্পতি ভাঙচুর হয়।
- এত কৃষক বিরোধী সরকার বোধহয় কখনও আসেনি। দিকে দিকে কৃষকদের কণ্ঠে একই অভিযোগ। কৃষকেরা না খেয়ে মরছে, ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেই চলেছে। সরকারের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ২১৬ টি জেলা জলহীন ক্ষরাগ্রস্ত, অসংখ্য জেলা বন্যায় জেরবার। ফসল কেনার খরচ অনেক। ফসলের বাজারে নেই দাম। পাঞ্জাবের মত জেলাতেও মৃত্যু বাড়ছে। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল যোজনা বীমা' ব্যর্থ। এইসবের প্রতিবাদে এবং পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের ২০টি রাজ্যের ১৮০টি কৃষক সংগঠন ২০ নভেম্বর'১৭ রাজধানী দিল্লীর রাজপথকে ভরিয়ে দিল। এর নেতৃত্ব দিল 'অল ইন্ডিয়া কিষান সংঘর্ষ্ কোঅরডিনেশন কমিটি (এ.আই.কে. এস.সি.সি.)।
- গৌরী লঙ্কেশ সাহস ও নিষ্ঠার সাথে শান্তি ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ, হিন্দু মৌলবাদের বিরোধিতা, নারীর অধিকার রক্ষা, জাতিভেদ প্রথার অবসান এবং দলিতদের অধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য মৃত্যুর পরও সন্মানজনক আন্না পলিতভোসকায়া পুরস্কার পাচ্ছেন। তাঁর সাথেই পাচ্ছেন পাকিস্থানের ইসলামী ধর্মীয় মৌলবাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য সাহসিনী গুলালাই ইসমাইল। ২০০৬-এ মস্কোতে চেচেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাধারণ মানুষদের হত্যার প্রতিবাদ করায় খ্যাতনামা রুশ সাংবাদিক আন্না পলিতভোসকায়াকে হত্যা করা হয়। তারপর থেকে লণ্ডনস্থিত 'রিসার্চ' অল উইমেন ইনওয়ার (RAW)' এই পুরস্কার চালু করেছেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় যেসব সাহসিনীরা শান্তি, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের কাজ করছেন তাদের একত্র করছেন।
- বিটি কটন চাষে 'পুলিশ অ্যান্ড পোলো' রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে মহারাষ্ট্রের ইয়াতমাল, শোলাপুর প্রভৃতি জেলায় কয়েক হাজার কৃষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বেশ কয়েকজন মারাও গেছেন।
- জেনেটিক গবেষনায় প্রমাণ পাওয়া গেল যে ভিজে আবহাওয়া থেকে উষ্ণ আবহাওয়ায় পরিণত হওয়ার কারণে আফ্রিকা থেকে আজ থেকে ৬০ হাজার বছর আগে আদিমানব ইউরেসিয়ায় পাড়ি দেয়।

- মহারাষ্ট্রের নাগপুরের শিবানগাঁও গ্রামে সরকারি প্রকল্পের জন্য জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকরা বাবা দেয়ারের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেছেন।
- ১০০ কমান্ডো ও বনকর্মীর ৩৫ ঘন্টার চেষ্টায় হরিয়ানার মানেসরের মারুতি গাড়ি কারখানার ইঞ্জিন ইউনিট থেকে ঘুম পাড়ানি গুলির সাহায্যে নয় ফুট দীর্ঘ ও ৬০ কেজি ওজনের ঢুকে পড়া চিতাবাঘটি উদ্ধার করা হয়।
- অক্টোবর'-১৭ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর লোকসভা আসনে, যা ছিল বিজেপির জেতা আসন, কংগ্রেস ১,৯৩,২১৯ ভোটে বিজেপিকে হারায়।
- ২০১৭-র ম্যান বুকার পুরস্কার জিতলেন মার্কিন লেখক জর্জসন্ডার্স। তার প্রথম উপন্যাস 'লিঙ্কন ইন দ্য বার্ডো'-র জন্য।
- কন্যাশ্রী ইত্যাদি নিয়ে যতই ঢাকঢোল পেটানো হোক না কেন ২০১৫'-১৬র জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকার বিয়ে সবচাইতে বেশী ৪১%। জাতীয় গড় যেখানে ২৭%। ফলে অল্পবয়সেই সন্তান ধারন, অসুস্থতা, সন্তান ও মার অযত্ন, অসুস্থতা ও মৃত্যু, অকাল বার্ধক্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নারীপাচার, যৌনদাসী ও পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্যারও বিরাম নেই এই রাজ্যে। এই রাজ্য থেকে এবং এই রাজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে নারীপাচারেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শীর্ষে।
- দূষণের কারণে বিশ্বে বছরে ৯০ লক্ষ মানুষ মারা যান। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী দূষণে মৃত্যু ভারতে। ২৫ লক্ষ এবং সমগ্র মৃত্যুর ২৮%। সুত্র 'ল্যানসেট'।
- আদিবাসী ও পরম্পরাযুক্ত বৃষ্টি, জল,জঙ্গল, মাটি ও বীজের সুষম ব্যবহার করে দীর্ঘস্থায়ী ফলদায়ক জৈব চাষকে গুরুত্ব দিতে দক্ষিণ রাজস্থানের বানসয়ারা, দুঙ্গারপুর প্রভৃতি জেলায় 'ভাগধারা গোষ্ঠী' 'জনজাতীয় কিষান স্বরাজ যাত্রা' এবং সংগঠিত আদিবাসী সম্মেলন করলেন।
- ভুটান ও মানসের জঙ্গলসংলগ্ন বোড়ো টেরিটোরিয়াল এরিয়ার উদলগুড়ি জেলার দক্ষিন কাহিবাড়িতে তেনজিং বোদোসা যে দুটি চাবাগান নির্মাণ করেছেন তাতে হাতী বন্যজন্তুদের নিত্য আনাগোনা। বোদোসা তাদের যাত্রাপথে বাধা না দিয়ে জন্তুদের নিরাপদ যাতায়াত ও চা চাষের সহবস্থান করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।
- গুজরাটের দাহোদ জেলায় উপজাতি অধ্যুষিত জেসবারা থানায় কৃষকদের বিক্ষোভের সময় পুলিশ গুলি চালালে দুজন কৃষকের মৃত্যু হয়।
- ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জন্য 'লারসেন অ্যান্ড টুবরো' যে সাতটি 'অফসোর পেটরল ভেশেল'-র বরাদ পেয়েছে ১,৪৩২ কোটি টাকায় 'বিক্রম' সিরিজের তার প্রথমটি তৈরী হল।
- ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন লিসম্যানিয়া ডোনোভেনি ছাড়াও লেপসি এন.এল.ভি, ভাইরাসটি কালাজ্বর রোগের কারণ।
- রাজস্থান সরকারের প্রস্তাবিত 'ক্রিমিনাল ল'জ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল'-র বিরুদ্ধে অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলি বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। 'রাজস্থান পত্রিকা' মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেকে বয়কট করেছে।
- বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন একদিকে আবহাওয়া পরিবর্তন ও বৃষ্টি হ্রাস অন্যদিকে যথেচ্ছ বালিতোলা, আবর্জনা ফেলা, বাধ দিয়ে চাষ ও মাছ চাষ, রাসায়নিক প্রয়োগ, ডিনামাইট ফাটানো, নদী অববাহিকার অরণ্য ও বৃক্ষরাজি নিধন ও ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি কারণে মধ্য কেরলের ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে পাথানামথিচ্চা, কোট্টায়াম ও আলাপূজা জেলার (১) পম্পা, (২) আচেনকইল, (৩) মনিমালা, (৪) মিনাচিল, (৫) মুভাত্তুপুজা, (৬) চালাকুডি প্রমুখ নদী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।
- সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে এতদিনকার বিদেশী হাউন্ড কুকুরের পরিবর্তে উত্তর কর্ণাটকের বাগালকোর্টের প্রাক্তন ঘোরপাড়ে রাজবংশের ইরানী, তুর্কী ও ভারতীয় কুকুরের মিশ্রণে জাত মুধল, শিকারী কুকুরকে পছন্দ করা হচ্ছে।
- বিশ্বের পুরুষতন্ত্র ও মৌলবাদের সদর দপ্তর সৌদি আরবে আরবীয় লেখিকা বদরিয়া আল বিশরের একটি উপন্যাস বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল সৌদি রাজতন্ত্র।
- শুধু ডেঙ্গু যন্ত্রণা নয়, ম্যালেরিয়াতেও পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। ১৯১৬ তে এখানে ৩৫,১২৩৬ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছে বলে রিপোর্ট করা হয়েছে যার মধ্যে মৃত্যু ৫৯ জনের। ১৯১৭-এ সেপ্টেম্বর অবধি আক্রান্ত ১২,৫২৪ এবং মৃত্যু ২৬।
- কেরলের কোজিকোড জেলার মুক্কোম এলাকায় গেইলের ৮০ কিমি দীর্ঘ গ্যাসের পাইপ লাইন বসাতে গিয়ে ৬০০ পরিবারের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিয়েছে।
- নরেন্দ্র মোদি সরকার একমাত্র সরকারি বিমানসংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া ও সহযোগী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস সংস্থার মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে বিক্রি করার জন্য খদ্দের খুঁজছে।
- প্রস্তাবিত নাগপুর-মুম্বাই সুপার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের বিরুদ্ধে ২৭টি গ্রামের কৃষকরা আদালতে গেলেন কারণ এর কারণে বহু কৃষি জমি নষ্ট হবে, বহু কৃষক পরিবারের উচ্ছেদ হবে, ১৫৬ হেক্টর বনভূমি এবং পশ্চিমঘাট পাহাড়ের অনেকটাই নষ্ট হবে।
- বাড়ির সামনে আততায়ীরা খুন করে গিয়েছে কারও প্রিয়জনকে। দাঙ্গার মামলায় বিচার চাইতে গিয়ে রাজরোষে পড়তে হয়েছে কাউকে। সরকারি বশ্যতা স্বীকার করে লেখা বদলাতে রাজি না হওয়ায় কারও কাজের জায়গা বিপন্ন হয়েছে। এরা হলেন মহারাষ্ট্রের মেঘা পানশারে, গুজরাতে তিস্তা শেতলবাদ এবং দিল্লীর পরাঞ্জয় গুহঠাকুরতা। 'বাক্ স্বাধীনতা আমার অধিকার শীর্ষক আলোচনাচক্রে কলকাতার যুবকেন্দ্রে যোগ দিয়ে তারা বলেন যে সরকারে যে-ই থাকুন, স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়ার প্রশ্নে কারও ভূমিকাই প্রশ্নাতীত নয়। তাই বাক্স্বাধীনতার লড়াইয়ে নাগরিকদেরই অগ্রনী ভূমিকা নিতে হবে।

- ‘অখিল ভারতীয় কিষান সঙ্ঘর্ষ সমিতি’-র অন্তর্গত ওড়িষার ‘স্টেট লেভেল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ ফারমারস্ অরগানাইজেশন’ কৃষিদ্রব্যের মূল্য খরচের অন্তত দেড়গুন করার দাবীতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করল।
- মহারাষ্ট্রের ‘বসন্তরাও নাইক শ্বেতকার স্বাবলম্বন মিশন (ভি.এস.এস.এন.এম.)’ কার্পাস ও সোয়াবিনের লাভজনক দামের দাবীতে এবং বিপদবিক্রির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন।
- এতদিন ভারত থেকে আফগানিস্তানে যা কিছু পাঠানো হত তা পাঠাতে হত পাকিস্তানের স্থল বা আকাশ পথ দিয়ে। ২৯ অক্টোবর ১৭, ভারতীয় সহায়তায় গালফ অফ ওমানে অবস্থিত ইরানের ছাবাহার বন্দরকে নতুন করে তৈরী করার পর সেখান দিয়ে ভারতীয় জাহাজে পাঠানো গম ছাবাহার- জাহেদান (ইরান)- জারানজ (আফগানিস্তান)- কাবুল সড়কপথে পাঠানো গেল।
- উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরের পর গুজরাতের আমদাবাদের হাসপাতালে একই দিনে নটি শিশুর মৃত্যু সোরগোল ফেলেছে।
- ‘নিমাহানসে’র একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৫-২৯ বছর বয়সের যুবদের মধ্যে মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০% রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ওড়িশার সাথে কয়েকবছরের তথ্যপ্রমানের দ্বৈরথের পর ভারত সরকারের ‘রেজিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি দপ্তর’ রসগোল্লাকে পশ্চিমবঙ্গের ‘জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন (জি.আই)’ হিসাবে স্বীকৃতি দিল। গবেষকরা জানাচ্ছেন ১৮২৩-এ নদীয়ার রানাঘাটের হারাধন ময়রা গরুর দুধ কেটে তৈরী ছানা ও চিনির রস দিয়ে প্রথম রসগোল্লা তৈরী করেন। তারপর ১৮৯৫ তে কলকাতার বাগবাজারের নবীন চন্দ্র দাস রসগোল্লার আধুনিক রূপ দেন। একই দিনে তামিলনাড়ুর সমুদ্রতীরবর্তী অপরূপ মাম্মালাপুরম্ পাথরের মন্দির স্থাপত্যকেও জি.আই.ট্যাগ দেওয়া হল। এরপরই গোবিন্দভোগ চালের জি.আই.পায় পশ্চিমবঙ্গ।
- ২০১৭-র গোয়ায় অনুষ্ঠিত ভারতের ৪৮ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরিদের নির্বাচিত নারীর অসহায়তার উপর তৈরী সর্বত্র প্রশংসিত দুটি ছবি, মারাঠী ‘ন্যুড’ ও মালয়ালাম ‘এস.দুর্গা’, স্ক্রিনিং কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রচার মন্ত্রক আকস্মিক বাতিল করে দেওয়ায় ‘ইন্ডিয়ান প্যানোরোমা’ বিভাগের জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান চিত্র পরিচালক সুজয় ঘোষ ও অন্য জুরি সদস্য অপূর্ব আসরানি পদত্যাগ করলেন। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিবাদে বন্ধ হল পুরস্কার বিজয়ী ‘দশক্রিয়া’।
- মহারাষ্ট্রের সাংলিতে এক ২৬ বছরের যুবককে থানায় মারধোর ও অত্যাচার করে মেরে ফেলার এবং দ্রুত পুড়িয়ে ফেলার প্রতিবাদে তৃপ্তি দেশাইয়ের নেতৃত্বে ‘ভূমাতা ব্রিগেড’ ও অন্যান্যরা আন্দোলন করছেন।
- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা তৈলচিত্র ‘সালভাতর মুন্ডি (সেভিয়র অফ দ্য ওয়ার্ল্ড)’ লন্ডনের ক্রিস্টির নিলামে ৪৫ কোটি ডলার রেকর্ড মূল্যে বিক্রি হল।
- কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের ৪,০০০ আদিবাসীদের জমায়েতে নাগপুরের কস্তুরচাঁদ পার্কে বীরসা মুন্ডার ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল।
- আখের লাভজনক দামের দাবীতে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর, আওরঙ্গাবাদ, সোলাপুরে, ‘স্বাভীমানী শ্বেতকারী সংগঠনে’র নেতৃত্বে কৃষকদের আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে।
- পশ্চিম ওড়িশার ক্ষরাপীড়িত সম্বলপুর, বরগরা, সুন্দরগড় প্রভৃতি জেলাগুলিতে কৃষকদের মৃত্যুমিছিল চলছেই। অক্টোবর’১৭ একমাসেই ঋণজর্জরিত, পোকায় আক্রমণে বা অসময়ের বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়া অথবা ফসলের দাম না পেয়ে পথে বসা ১৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করে, ১৩টি কৃষক পরিবার ধ্বংসের পথে চলে যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ,প:বঙ্গ, কর্ণাটক, আত্মহত্যার চলছেই।
- উত্তর কর্ণাটকের পশ্চাদপর কালাবুর্গি জেলায় প্রসূতির মৃত্যু বেড়েই চলেছে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর ১৭ অবধি ৭০ জন প্রসূতির মৃত্যুর রিপোর্ট পাওয়া গেছে।
- নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ-এ অবস্থিত ‘ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে’র ২০১৮-’২৯ পর্বে পঞ্চম বিচারক হিসাবে ভারতীয় বিচারক দলবীর ভান্ডারী নির্বাচিত হলেন।
- আগে স্থলে, জলে, সাবমেরিনে সফল পরীক্ষা হয়েছে এবার বায়ুসেনার সুখোই ৩০ এম.কে.আই বিমানের থেকে আকাশে ছুঁড়ে ৪০০ কি.মি. দূরত্বের আকাশ থেকে আকাশ অথবা স্থলে ব্রহ্ম ক্ষেপনাস্ত্রের সফল পরীক্ষা ঘটাল ভারতীয় নৌ সেনা।
- তেলেঙ্গানার এক নবদম্পতী বোদাপল্লী অবিনাশ কুমার ও নীলিমা তাদের রেজিস্ট্রির দুদিন পরে অনুষ্ঠানে মরনোত্তর নিজেদের চোখ দান করলেন এল.ভি.প্রসাদ আই ইনস্টিটিউটকে, কিডনি সহ দেহস্থ অরগানগুলি মোহান ফাউন্ডেশনকে এবং দেহ গান্ধী হাসপাতালকে। অবিনাশের পিতা রবি কুমার এই সিদ্ধান্তকে শুধু সমর্থন নয় সাক্ষর করেন। এছাড়াও তারা আত্মঘাতী হওয়া কৃষকদের চারটি পরিবারকে অর্থ সাহায্য করেন। চিত্রনির্মাতা অবিনাশ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে কৃষকদের আত্মহত্যা না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি একটি চিত্র নির্মাণ করবেন।
- খুন, অপহরণ কিংবা ধর্ষণ— দেশের অন্য শহরগুলিকে ছাপিয়ে শীর্ষে দিল্লী। জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো ২০১৬-র পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, ২০ লক্ষের বেশী জনসংখ্যা রয়েছে, এমন ১৯টি শহরে এক বছরে ধর্ষণের যে ঘটনাগুলি ঘটেছে তার ৪০% ই দিল্লীতে। স্বামী-শ্বশুর বাড়ির লোকেদের অত্যাচার, পনের বলি হওয়া ঘটনার ২৯%ই দিল্লীতে ঘটেছে। শহরগুলিতে সব মিলিয়ে, অপরাধের যে সব ঘটনা, তার ৩৯% ই দেশের রাজধানীতে ঘটেছে। আর্থিক অপরাধেও শীর্ষে দিল্লী।
- দেশের সার্বিক অপরাধের শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। শহরের মধ্যে দিল্লী। সবচেয়ে বেশী খুনের ঘটনা উত্তরপ্রদেশে। তারপর বিহারে। জাল

টাকা উদ্ধারে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় (২.৩২ কোটি টাকা)। সম্মতি নিয়ে অপরাধ সবচাইতে বেশী দিল্লীতে। সবচাইতে বেশী বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার উত্তরপ্রদেশে। দলিতদের উপর অত্যাচারে সবচাইতে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ (প্রতি এক লক্ষে ৪৯২২টি ঘটনা)। এরপর দলিতদের উপর বেশী অত্যাচার হয়েছে রাজস্থান, গোয়া, বিহার,গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশে।

- ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান অববাহিকা সিয়াং নদীটি অরুনাচল প্রদেশের জীবনধারা। সিয়াং নদীর উৎপত্তি চীনে। সেখান থেকে অরুনাচল প্রদেশে ভারতে ঢুকে পরে দিবাং ও লোহিতের সাথে মিশে তৈরী করেছে প্রকাণ্ড ব্রহ্মপুত্র নদ। চীন সিয়াং ও সাংপোয় বহু বাঁধ তৈরী করায় এমনিতেই বিগত কয়েক দশক ধরে সিয়া সহ চীন থেকে আসা নদীগুলির জলধারা কমে গেছিল। এবার বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চীন সাংপো নদীর গতিপথ তিব্বত থেকে তাকলামাকান মরুভূমির দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণে ও বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে সিয়াং-র জলধারা আরও কমছে। এবার অরুনাচলের পূর্ব সিয়াং জেলার অধিবাসীরা দেখছেন শীতকালে আয়নার মত স্বচ্ছতোয়া জলের পরিবর্তে সাদা কাদাগোলা অল্প জল প্রবাহিত হচ্ছে তার সাথে মাছেরা মরে ভেসে উঠছে। পাশিঘাটের সাংসদ কেন্দ্র সরকারকে জানিয়েছেন। ডায়িং-এরিং অভয়ারন্যে পরিযায়ী পাখীরা আসেনি। অসমের ধেমাজি, তেজপুর প্রভৃতি জায়গায় জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে পানীয়র অযোগ্য। চীন জানাচ্ছে ভূমিকম্পের কারণে হয়েছে।
- এশিয়ার সর্ববৃহৎ যৌনপল্লী উত্তর কলকাতার সোনাগাছিতে ৭০০ যৌন কর্মীকে 'প্রি এক্সপোজার রেট্রোভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস্' প্রয়োগ করে দেখা গেছে বিগত দুবছরে কোন এইচ আই ভি সংক্রমণ হয় নি।
- আন্তর্জাতিক 'পিপলস্ হেলথ মুভমেন্টে'র ভারতীয় শাখা 'জন স্বাস্থ্য অভিযান' পুনরায় সকলের জন্য নিঃখরচায় চিকিৎসার দাবী জানিয়েছেন।
- কলকাতায় 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এসোসিয়েশনে'র অনুষ্ঠানে মৎস্যবিজ্ঞানী ও প্রাক্তন বন আধিকারিকরা বাস্তুতন্ত্রের এক অনন্য উপহার সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বাঁচাতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ 'প্রোজেক্ট টাইগার' প্রকল্পের মত বাংলার অপর এক অনন্য সম্পদ নোনা জলের রূপোলী ইলিশকে বাঁচাতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগের দাবী জানান। নদীতে দূষণ এবং নির্বিচারে ছোট ইলিশ ধরার জন্য ইলিশের উৎপাদন কমছে। নদী ও জলাভূমিতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে হবে, বন্ধ করতে হবে প্রজননের সময় ইলিশ ধরা এবং ৫০০ গ্রামের নীচে ওজনের চারা বা জাটকা ইলিশ না ধরা। ৯০ মিলিমিটারের ছোট ফাঁদের গিলনেট যা শক্তিশালী ইঞ্জিনের দ্রুতগতির ট্রলারের চলার সাথে জলের টানে ৭০ মিলিমিটার হয়ে গিয়ে ছোট মাছরাও আটকা পড়ে তার ব্যবহার করা বন্ধ করা।
- বিদর্ভের চাষিদের প্রতি মহারাষ্ট্রের ফাদনবিস তথা কেন্দ্রের মোদি সরকারের উদাসীনতার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন ৭৯ বছর বয়সী প্রাক্তন আমলা এবং বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা। তুলো ও সয়াবিন চাষ করে কীট পতঙ্গের হানায় ও পর্যাপ্ত দাম না পাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়া দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবীতে তিনি কৃষকদের নিয়ে মহারাষ্ট্রের আকোলার জেলাশাসকের অফিসে বিক্ষোভ দেখান.। তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে ছেড়ে দিলে তিনি থানার সামনেই ধর্না শুরু করেন।
- বাংলাদেশের বরিশাল ও চট্টগ্রামে উৎপন্ন হওয়া প্রথম শ্রেণীর বেত দিয়ে শ্রীহট্ট, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নোয়াখালির দক্ষ পাটিয়ালদের তৈরী সূক্ষ্ম নকশাদার শীতলপাটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা তার বয়ন পদ্ধতির জন্য 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজে'র স্বীকৃতি দিল। বাংলাদেশের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শন এই শীতলপাটি। এর আগে বাংলাদেশের বাউলগান, নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা, জামদানি শাড়ি ও নকশিকাঁথাকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো।
- সোচির শীতকালীন ওলিম্পিকে ৩৩টি পদক জিতেছিল রাশিয়া। পদক জয়ীদের এক তৃতীয়াংশের নাম রয়েছে ডোপিং কেলেঙ্কারির তালিকায়। ঘটনা সাঙ্ঘাতিক কারণ সরকারি পরিকল্পনায় ডোপিং হত এবং ওলিম্পিক চলাচালীন রাতের অন্ধকারে ল্যাবরেটরি থেকে ডোপড মূত্র সরিয়ে ফেলা হত। এর জোরে পরবর্তী পিয়ং চ্যংয়ের শীতকালীন ওলিম্পিক থেকে রাশিয়াকে সাসপেন্ড করেছে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি।
- শ্রীলঙ্কা তার দক্ষিণের হামবানটোটা দক্ষিণ বন্দরটি ৯৯ বছরের লিজে চীনের হাতে তুলে দিল। বন্দরটি ও তাকে ঘিরে আর্থিক অঞ্চলের ৭০% মালিকানা থাকবে চীনের দুটি সংস্থার হাতে। ভারত মহাসাগরের বুকে চিনের এই উপস্থিতি ভারতের পক্ষে মোটেই স্বস্তিকর নয়।
- ডোকলামে রাস্তা বাড়িয়েই চলেছে চীন। ৭২ দিন টানাপোড়েনের পর শীত পড়ার আগে ডোকলাম থেকে সেনা সরাতে রাজি হয় চীন। তার আগে ভারতীয় সেনারা সরে আসে। উপগ্রহ চিত্র জানাচ্ছে এর পরেও সেখানে নতুন করে ঘাঁটি গাড়ে ১৮০০ চীনা সেনা। পাশাপাশি দুটি রাস্তা তৈরী করছে বিতর্কিত এলাকায়।
- চিকেন পক্সে মৃত্যু ;

সাল	রোগীর সংখ্যা	দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গে রোগী মৃত্যুর সংখ্যা
২০১৫	৪৭০৯৪	৪৬	৪০
২০১৬	৬১১১৮	৬০	৩৫

- স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদাসহ একাধিক দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত 'আশা' কর্মীরা ১৮ ডিসেম্বর' ১৭ কলকাতায় সমাবেশ করলেন।

- ১২ বছর ধরে একই বেতন কাঠামো রয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে পার্শ্ব শিক্ষকদের মাসিক বেতন যথাক্রমে ৮,১৮৬ ও ৫, ৯৫৪ টাকা। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কাটার পর হাতে আসে আরও কম। সপ্তাহে পাঁচ দিনে ২০টি ক্লাস নেওয়া ছাড়াও অনেক কিছু করতে হয়। স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানোর দায়িত্বও তাদের। কিন্তু এই বেতনে সংসার চলে না। অভাবের জন্য গত ছয় মাসে ২৩ জন পার্শ্ব শিক্ষক আত্মহত্যা করেছেন। ১৮ ডিসেম্বর' ১৭ বেতন বৃদ্ধির দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় পার্শ্ব শিক্ষকরা বিক্ষোভ দেখালেন।
- ন্যূনতম মজুরি মাসিক ১৮ হাজার টাকা। তিন হাজার টাকা পেনশন এবং তিন লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতার দাবীতে 'সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়িকা কর্মী সমিতি'র নেতৃত্বে আন্দোলনে নেমেছে অঙ্গনওয়াড়ি, আশা ও মিড ডে মিলের কর্মীরা। ১৭ জানুয়ারী' ১৮ তারা একদিনের ধর্মঘট পালন করেন।
- বিভিন্ন দাবী দাওয়া, রাজ্য নেতা সহ অন্যান্যদের বদলি রদ প্রভৃতি নিয়ে রাজস্থানের সরকারি চিকিৎসকরা ১৩ নভেম্বর'১৭ থেকে ধর্মঘট পালন করেছেন। রাজস্থান সরকার 'রাজস্থান এসেনসিয়াল সার্ভিসেস মেনটেনেন্স অ্যাক্ট' জারি করে ৬৫ জন চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছেন। অবশেষে সরকার তাদের দাবী মানায় ২৯ ডিসেম্বর বন্ধ উঠে যায়।
- ২০১৭ এ নীতি আয়োগ দারিদ্র, পরিকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিরিখে দেশের ১৫০টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে সবচাইতে বেশী পিছিয়ে পড়া জেলা (১৯) রয়েছে ঝাড়খণ্ডের। পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে পাঁচটি জেলা— বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর। এর মধ্যে দেশে দারিদ্রে পঞ্চম বীরভূম, ষষ্ঠ মুর্শিদাবাদ।
- সরকার বিরোধী মত প্রকাশের কারণে পরপর বেশ কিছু চিকিৎসককে সাসপেন্ড ও শোকজ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস্', 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডক্টরস্ ফোরাম', 'সার্ভিস ডক্টরস্ ফোরাম', 'এসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ডক্টরস', 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার', 'ডক্টরস্ ফর ডেমোক্রেসি', 'শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ', 'এইচ. এস. এ.' প্রমুখ।
- কেন্দ্র সরকারের আমানত বিমা বিলের (এফ.আর.ডি.আই) বিরোধিতায় মাঠে নেমেছেন বামপন্থী ও অন্যান্য সংগঠনগুলি।
- সংরক্ষণের পরও দেখা যাচ্ছে নাগাল্যান্ডের ওখা, মণিপুরের তামেংলা, অসমের ডিমা হাসাও জেলার অরণ্যে পরিযায়ী আমুর বাজরা কম আসছে। প্রতি বছর শীতের শুরুতে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় ২২ হাজার কি.মি. পরিযায়ী যাত্রাপথে এবং শীত শেষে ফেরবার পথে আমুর বাজরা এই অরণ্যগুলিতে বিশ্রাম নেয়। মনে করা হচ্ছে পরিবেশ পরিবর্তন, অরণ্য ধ্বংস, মানুষের বসতি ও গতিবিধি বৃদ্ধি, চোরা শিকার প্রভৃতি তাদের সংখ্যা হ্রাসের কারণ।
- ২৭ ডিসেম্বর'১৭ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ঘোষণা করলেন যে বিহারের সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে।
- নরেন্দ্র মোদি-অরুণ জেটলি-রাজনাথ সিংদের পাক সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে ঢক্কানিনাদ নস্যাৎ করে দিল সরকারি পরিসংখ্যান।
- গুজরাটের পতিদারদের মত মহারাষ্ট্রে মারাঠারা সংরক্ষণের দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু করেছেন। 'মারাঠা ক্রান্তি মোর্চা'-র নেতৃত্বে তারা মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সভা, প্রচার মিছিল চালিয়ে যাচ্ছেন।
- মহাদায়ী নদীর জলবন্টন নিয়ে কর্ণাটক ও গোয়ার মতান্তর তিক্ততায় পৌঁছেছে। উত্তর কর্ণাটকের জেলাগুলিতে আন্দোলন বন্ধ ও হিংসার পথে চালিত হয়েছে।
- ১৮১৮-র ১ জানুয়ারী মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোড়েগাঁওয়ের যুদ্ধে অত্যাচারী জাতবাদী পেশোয়া শাহীর অবসান হয়েছিল ইংরেজের পক্ষ নিয়ে দলিত মাহার প্রমুখ সেনানীদের দক্ষতায়। তার দুশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতের নবমনুবাদী নব পেশায়োশাহী মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একদা পেশোয়াশাহীর সদরদপ্তর শনিওয়াড়ার মঞ্চে সমবেত হয়ে ভিড় ঠাসা ময়দানে লড়াইয়ের ডাক দিলেন শহীদ রোহিত ভেমুলার মা রাধিকা ভেমুলা, ছত্তিশগড়ের আদিবাসী প্রতিবাদের নেত্রী সোনি সোরি, গুজরাটের দলিত প্রতিরোধের নেতা জিগ্নেশ মেবানী, জেএনইউ-র ছাত্র নেতা উমর খালিদ, ভীম আর্মির বিনয় রতন সিং প্রমুখেরা।
- ছাত্র ও যুব সমাজকে নেশাসক্ত ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার জন্য লাভজনক ড্রাগের ব্যবসা ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের প্রতিটি বড় শহরের নামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ, কলেজ, এমনকি স্কুলে এই বিপদ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাস ও হষ্টেলগুলি হয়ে উঠেছে ড্রাগসের আখড়া। সম্প্রতি দিল্লী ও কলকাতা থেকে ড্রাগ চক্রের কিছু ব্যক্তিকে ধরাও হয়েছে।
- সম্প্রতি নিমহ্যানসের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতের মনরোগ সম্পর্কে সাঙ্ঘাতিক তথ্য উঠে এসেছে। ভারত মনরোগের মহামারীর সম্মুখীন। সমগ্র জনসংখ্যার ১০% মনরোগের শিকার। অথচ দেশে ক্লিনিকাল সাইকোলজিষ্ট আছেন মাত্র দু হাজার আর সাইকিআট্রিষ্ট রয়েছেন মাত্র পাঁচ হাজার।
- অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন এবং পুরুলিয়া সদর থেকে ৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত বেগুনকোদর রেল স্টেশনে ১৯৬৭ সালে স্টেশন মাস্টারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর যাত্রী ও রেলকর্মীরা এই স্টেশন এড়িয়ে যেতেন। পরে রেলের রেকর্ডে একে 'হন্টেড' বা হানাবাড়ি স্টেশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় মানুষরা পর্যটকদের 'হানাবাড়ি স্টেশন' হিসাবে দেখাতো। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা গিয়ে ওখানে কয়েক রাত কাটিয়ে কল্পকথা ফাঁস করে দেন। প্রথম রাতে প্রায় দুটোর সময় স্টেশনের পিছন থেকে অদ্ভুত শব্দ শোনা গেলে মঞ্চের সদস্যরা জোরালো টর্চের আলো ফেলেন। দেখেন কয়েকজন লোক যারা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল পালাচ্ছে। তাদের তাড়া করলে তারা পরিমরি দৌড়ে পালিয়ে যান। তারপর থেকে অন্য রাতগুলোয় কিছু ঘটেনি।

- ভারতীয় বংশোদ্ভুত আজিজ আনসারি প্রথম এশীয় অভিনেতা হিসাবে মার্কিন টেলিভিশনে সেরা অভিনেতা হিসাবে 'মাস্টার অফ নানে'র জন্য 'গোল্ডেন গ্লোব' পুরস্কার পেলেন।
- জৈব পদ্ধতিতে চাষের পাশাপাশি প্রয়োজন জৈব বীজে বোনা ফসল। রাজ্যে ও বিদেশে চাহিদা থাকা গোবিন্দভোগ, রাধাতিলক ও রাঁধুনিপাগল তিনটি সুগন্ধী ধানের জৈব বীজ তৈরী ও তার বাজারজাত করার লাইসেন্স পেলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা।
- জৈব রাজ্য ঘোষণা হওয়ার পর সিকিম আনাজপাতি, ফসল শুধু নয় জৈব আমিষ খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে এবং ৩১ মার্চ '১৮-র পর থেকে মাংস, ডিম, মাছ বাইরে থেকে আমদানি করা নিয়ন্ত্রণ করছে।
- বিদর্ভ ও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের ১২ লক্ষ কৃষক তাদের খারাপ মানের বীজ যা উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটিয়েছে সরবরাহের জন্য ২১৬টি সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবীতে কৃষি দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছে।
- কর্ণাটকের চিকবাল্লাপুর জেলার চিন্তামনি তালুকে বহু দরিদ্র দলিত পরিবার পিডিএস ব্যবস্থার অভাবে গাছের শিকড়, পাতা প্রভৃতি খেতে বাধ্য হচ্ছেন।
- জার্মান নৃতত্ত্ববিদ উরশুলা গ্রাহাম বাওয়ার যিনি গবেষণার কাজে এসে উত্তর-পূর্ব ভারতের জেমি নাগাদের মধ্যে থেকে যান, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী আগ্রাসন প্রতিরোধে নাগাদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন ও জেমি নাগারা যাকে রানী হিসাবে দেখত, তাকে নিয়ে ফিল্ম তৈরী হচ্ছে।
- ১২ জানুয়ারী '১৮, কার্টোস্যাট-২ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে ইসরো শততম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের নজির গড়ল।
- ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন সুপ্রীম কোর্টের চার বিচারক— জাস্তি চেলমেশ্বর, কুরিয়েন জোসেফ, রঞ্জন গগৈ ও মদন লোকুর। তারা সোহরাবুদ্দীন ভুয়ো সঙ্ঘর্ষ মামলার, যাতে বিজেপি প্রেসিডেন্ট অমিত শাহ্ জড়িত, বিচারক ব্রিজ গোপাল লোয়ার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চান।
- তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপ্রকল্পে গোঘাটের ভাবাদিঘি সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন স্থানীয় মানুষদের লড়াই চলছে। পাশে আছে এ.পি.ডি.আর সহ অনেকেই। ১৪ জানুয়ারী এই প্রসঙ্গে আরামবাগে আহুত নাগরিক সভায় তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা তান্ডব চালায়। মঞ্চ দখল করে।
- ২০১০ এ উত্তর আফ্রিকার তিউনিশিয়ায় একনায়ক আল-আবেদিন বেন আলির দুদশকের শাসনকে উৎখাত করেছিল যে গণবিদ্রোহ তা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র আরব দুনিয়ায়। সাত বছর পর সরকার বিরোধী গণবিক্ষোভে আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে তিউনিশিয়া। এবারও আন্দোলনের কেন্দ্র রাজধানী তিউনিসের হাবিব বোর্গিবা অ্যাভেনিও।
- ২০১৭-র ডিসেম্বর ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জানুয়ারীতেই তাকে ভাসিয়ে দিল বন্যা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে দাবানলে মাটির ওপরের স্তর পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। জল সহজে নীচে নামতে পারে না। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। জলের সঙ্গে পোড়া মাটি আর গাছপালার স্তুপ মিশে সহজেই কাদার স্রোতে পরিণত হয়।
- অত্যন্ত ভঙ্গুর আদিবাসী সম্প্রদায় মানকিদিয়ারা প্রথম থেকে বর্তমান সিমলিপাল অরণ্যাঞ্চলে থাকত। এখন ব্যাঘ্র প্রকল্পের নামে সরকার তাদের সিমলিপাল থেকে উৎখাত করছে।
- আলুর ন্যূনতম দাম না পেয়ে এবং তাদের সমস্যা ও দাবীর প্রতি সরকার দৃকপাত না করায় 'রাষ্ট্রীয় কৃষক মঞ্চে'র নেতৃত্বে কৃষকরা অভিনব কায়দায় উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে প্রতিবাদ জানালেন। ৬ জানুয়ারী শেষ রাতে তারা লরী করে লক্ষ্ণৌয়ে ঢুকে ভি.আই.পি এলাকাগুলিতে আলু ছড়িয়ে চলে গেলেন।
- একদা বিতর্কিত নয়াচরে 'জুওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' গবেষকরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন ইতিমধ্যে সেখানে ৭৬ রকম অমেরুদন্ডী প্রাণী, ১৫১ রকমের জন্তু এবং ৩৭ প্রজাতির পাখি বাসা বেঁধেছে।
- 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' (এ.আর.এস.এ.)'-র যে জঙ্গী হানার প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সেনাবাহিনীর মদতে শয়ে শয়ে রোহিঙ্গাকে হত্যা ও ধর্ষণ, হাজারে হাজারে রোহিঙ্গা গৃহ অত্যাচার, লুঠ ও ধ্বংস, সাত লক্ষ রোহিঙ্গার দেশ ছেড়ে প্রাণ হাতে পালানো, তারাই আবার ৬ জানুয়ারী একটি মায়নমার আর্মির পরিবহন যান আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়।
- ভীমা - কোঁড়েগাও যুদ্ধের দুশো বছর পূর্তির এলগার পরিষদের অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী গান গাওয়ার জন্য 'কবীর কলামঞ্চে'র শিল্পীদের বিরুদ্ধে পুনে পুলিশ দেশদ্রোহিতার কেস দিল। 'শম্ভাজি ব্রিগেড' সহ দলিত সংগঠনগুলি এর প্রতিবাদ করেন।
- আলু চাষ করে পুনরায় সর্বস্বান্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষীরা হিমঘর থেকেও আলু তোলা বন্ধ রেখেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'মাটি উৎসবে'র বিপরীত পূর্ব বর্দ্ধমানের আলু চাষীরা আলু পোড়ানোর অনুষ্ঠান করলেন।
- ৩৭ বছর পর আবার বরফে ঢেকে গেল সাহারা মরুভূমি। জানুয়ারীর শুরুতে ১৬ ইঞ্চি পুরু বরফের চাদর ঢেকে দিয়েছে সাহারা মরুভূমিকে।
- ৫০০ টাকা ও ১০ মিনিট সময় দিলেই 'আধারে'র তথ্য জানা যায়— তথ্য প্রমাণ দিয়ে সংবাদিক রচনা খয়রা 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করায় তার ও পত্রিকার বিরুদ্ধে এফ.আই.আর. করল আধার কর্তৃপক্ষ।
- ১৯৫১ সালে কলকাতা থেকে পথ চলা শুরু আই.আই.এমের। এতদিন তাদের ডিপ্লোমা ছিল আন্তর্জাতিক মানের। নতুন আইনের মাধ্যমে এখন থেকে তারা ডিগ্রি, পিএইচ ডি, ডিসটিঙ্কশন সবই দিতে পারবে।

- অসমের বোরো ও অন্য উপজাতির মানুষেরা কাঠ বা বাঁশ কাটতে যাওয়ার সময়ে, যুদ্ধের সময়ে, বাড়ির সংলগ্ন জমিতে তৈরী 'রেডি টু ইট' কোমল চাল সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ঠান্ডা জলে আধঘন্টা রাখলেই ভাত তৈরী হয়। ফুলিয়ার ধান্য গবেষণাগারে এই বীজ তৈরী করে পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে।
- খবরে প্রকাশ ২৮ ডিসেম্বর, অরুণাচলের টুটিংর বিশিং অঞ্চলে চীনা সেনাবাহিনী ও নির্মাণ কর্মীরা এক্সক্যভেটার প্রভৃতি ভারি সরঞ্জাম নিয়ে ভারত সীমান্তে ৬০০ মিটার ঢুকে রাস্তা তৈরী করতে শুরু করে। ওদিকে ইরানের ছাবাহার বন্দরের কাছে, যে রুটে ভারত আফগানিস্তানে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠাচ্ছে, পাকিস্তানের মাটিতে চীন আরেকটি সামরিক ঘাঁটি বানাতে চলেছে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমীক্ষা রিপোর্ট (২০১৫-'১৭) জানাচ্ছে গোটা দেশের ছাত্র সংখ্যার ২৫.২% উচ্চশিক্ষা পাঠরত। তামিলনাড়ু সর্বোচ্চ (৪৫%)। অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এগিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ (১৮.৫%) ও বিহার (১৫%) পেছিয়ে। ২০১১-'১৪তে ছাত্র ভর্তি বেড়েছিল ৪%, ১৪-'১৭ তে ২.২%।
- দলিতদের ভীমা-কোরেগাঁও উদযাপনী সমাবেশে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণ এবং একজনের মৃত্যুতে প্রকাশ আম্বেদকরের নেতৃত্বে 'ভারিপ বহুজন মহাসঙ্ঘ (বিবিএম)', 'শম্ভাজী ব্রিগেড' প্রমুখ দলিত সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ৩ জানুয়ারী মহারাষ্ট্র অচল করে দেয়। মন্ত্রীসভার মধ্যে আটওয়ালে, পাশোয়ানরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
- 'অল ইন্ডিয়া দলিত মহিলা মঞ্চে'র নেতৃত্বে ধর্মীয় ও জাতি বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও হিংসা, পিলু খাঁন আফরাজুল হত্যার প্রতিবাদে এবং শান্তির দাবীতে রাজস্থানের জয়পুরে ৩ জানুয়ারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
- শ্রীনগর থেকে লেহ্ যাবার একমাত্র পথে সোনমার্গের পর ১১, ৫৭৮ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রণকৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জোজিলা পাসে আগামী সাত বছরে ৪,৮৯৯.৫ কোটি টাকায় তৈরী করা হচ্ছে সমস্ত ঋতুতে দুদিকে যাওয়ার ১৪.২ কি.মি.-র টিউব টানেল।
- অবশেষে ভারতীয় সংস্থার তৈরী টাইফয়েডের টীকা 'টাইপবার-টিসিভি'-কে ছাড়পত্র দিল ডব্লিউ.এইচ.ও
- মোদি সরকারের প্রস্তাবিত 'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বিল'কে গরীব বিরোধী ও জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে এইমসের 'রেসিডেন্ট ডক্টরস্ এসোসিয়েশন' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে গণবিতর্কে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
- সাঁতরাগাছি সহ বিভিন্ন জলাভূমিতে দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত কারণে '১৭-'১৮-র শীতে পরিযায়ী পাখিরা তেমন আসেনি। বরং তাদের দেখা গেছে বর্দ্ধমানের চুপির চড়, হুগলীর পুরশুরা-খানাকুল-তারকেশ্বর, নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার বিলগুলিতে। হুগলী নদীর মোহনায় সারা বছর ১৪ হাজার ট্রলার লম্বা লম্বা জাল নিয়ে চষে বেরায়। এই জালগুলির ফাঁস এড়িয়ে সমুদ্র থেকে নদীর উজানে ডিম পাড়তে আসা ইলিশের সংখ্যা গঙ্গায় অত্যন্ত কমে গেছে। মিষ্টি জলে ডিম পেড়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ইলিশের ঝাঁকের যখন বর্ষা শেষে সমুদ্রের নোনা জলে ফেরার কথা তখন ওই জালের ফাঁসে তারা অনেকেই ফিরে আসছে। সারাবছর গঙ্গায় থাকছে। ফারাক্কা, বলাগড় থেকে শ্রীরামপুর, রায়চক থেকে নিশ্চিন্দাপুর ভাগীরথী-হুগলীতে এরকম ইলিশের ছোট কলোনি দেখা যাচ্ছে। এমনই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের চাঁদপুরে পদ্মায় এবং গুজরাটে তাপ্তী নদী হয়ে উকাই জলাধারে।
- পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ দূষণ পর্ষদ জানাচ্ছেদ পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলী সহ ১৭টি নদীর জল অতি দূষিত। টোটাল কলিফর্ম কাউন্ট (টি.সি.সি.) ও মোষ্ট প্রোবাবল নাম্বার অফ কলিফর্ম ব্যাকাটিরিয়া (এম.পি.এন.) প্রতি ১০০ মিলিতে নির্ধারিত মাত্রা ৫০০-র চাইতে অনেক অনেক বেশী। শিলিগুড়ির কাছে মহানন্দা, জলপাইগুড়িতে তিস্তা ও করলা, আলিপুরদুয়ারে কালজানি, পশ্চিম দামোদর ও বরাকর, বীরভূম ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, পশ্চিম মেদিনীপুরে কংসাবতী প্রমুখ এই তালিকায় রয়েছে।
- 'অল ইন্ডিয়া কিষাণ মজদুর সভা (এ.আই.কে.এম.এস.)' সমীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন 'সবুজ বিপ্লবের'র নামে পরীক্ষিত পরম্পরার জৈব চাষ ছেড়ে উড়িষ্যার গত এক দশকে অবৈজ্ঞানিক এক ধরনের ধান চাষের কারণে 'চাকাদা পোকা (ব্রাউন প্ল্যানহপার)' সহ ফসলে এত পোকার উপদ্রব ও ফসল নষ্ট।
- নারী ও মানবতা বিদ্বেষী ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট থাকার ও ক্ষতিকারক নীতিগুলির বিরুদ্ধে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্টশিপের বর্ষপূর্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান ২১ জানুয়ারী ২০১৮।
- মহারাষ্ট্রের কানঝারভাট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিয়ের আগে মেয়েদের সতীচ্ছদ বা সতী পরীক্ষার বিরোধিতায় ঐ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত তরুনদের নিয়ে গঠিত 'স্টপ দ্য ভি রিচুয়াল' হোয়াটস অ্যাপ গোষ্ঠীর সভ্যদের ঐ সম্প্রদায়ের মাতব্বররা মারধোর করে। 'মহারাষ্ট্র অন্ধ, শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি' এর তীব্র প্রতিবাদ করে।
- কেরলের কোচির ভাদামপাদিতে উচ্চবর্ণের মানুষেরা গ্রামে 'জাত পাচিল' তুলে নিম্নবর্ণদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিবাদে এক বছর ধরে, ধর্না চালাচ্ছে 'কেরালা পুলায়ার মহাসভা (কেপিএসএস)', 'অভিলাষ পদাচেরী' প্রমুখ দলিত ও মানবাধিকার রক্ষা সংস্থা। ২৩ জানুয়ারী' ১৮ বাম সরকারেরর পুলিশ ধর্না ভেঙ্গে দেয়।
- 'ন্যাশনাল টেকনিকাল এডভাইসারি গ্রুপ অন ইমিউনাইজেশন' অবশেষে ভারতে জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচীতে জরায়ুমুখ ক্যানসার নিবারণে 'হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস ভ্যাকসিন (এইচ.পি.ভি)' অন্তর্ভূক্তিকরণের ছাড়পত্র দিল। পাশাপাশি হায়দ্রাবাদের 'ভারত বায়োটেক লিমিটেড'-র তৈরী রোটা ভাইরাল ডাইরিয়া নিবারণে 'রোটাভ্যাক' ভ্যাকসিন জাতীয় টীকাকরণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হল।

➲ কেন্দ্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দেশের ৭৩টি কম ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত এয়ারপোর্ট ও হেলিপ্যাডকে কাজে লাগিয়ে 'উড়ান ফেজ দুই' প্রকল্পে ১৯টি রাজ্যে আঞ্চলিকভাবে বিমান ও হেলিকপ্টার পরিষেবা চালানো হবে। এর মধ্যে থাকছে :

রাজ্য	বিমান পরিষেবা	হেলিকপ্টার পরিষেবা
জম্মু ও কাশ্মীর	কার্গিল - শ্রীনগর	—
অরুণাচল প্রদেশ	পাসিঘাট-জোরহাট তেজু -জোরহাট-গুয়াহাটি	দাপারিজো - ইয়াংইয়ং ইটানগর-লীলাবাড়ি-তেজপুর পাসিঘাট-টুটিং তেজু-ওয়ালঙ টুটিং-ডিব্রুগড় ইয়াংইয়ং-ডিব্রুগড় ওয়ালঙ-ডিব্রুগড় জিরো-ডিব্রুগড়
সিকিম	প্যাকইয়ং-গুয়াহাটি প্যাকইয়ং-দিল্লী প্যাকইয়ং-কলকাতা	
অসম	জোরহাট-কলকাতা জোরহাট-পাশিঘাট-তেজু লীলাবাড়ি-কলকাতা তেজপুর-কলকাতা তেজপুর-শিলঙ তেজপুর- লীলাবাড়ি রুপসী- গুয়াহাটি	জোরহাট-ডিব্রুগড় জোরহাট-তেজপুর লীলাবাড়ি-ডিব্রুগড় লীলাবাড়ি-ইটানগর নগাঁও-গুয়াহাটি নগাঁও-তেজপুর তেজপুর-ইটানগর তেজপুর- নগাঁও তেজপুর-জোরহাট
মনিপুর		জিরিবাম-তোমেংলঙ মোরে-ইম্ফল পারবঙ-থামলঙ তোমেংলঙ-ইম্ফল থানলঙ-ইম্ফল থানলঙ-পারবঙ তোমেংলঙ-জিরিবাম
পশ্চিমবঙ্গ	বার্ণপুর-গুয়াহাটি কোচবিহার-গুয়াহাটি	
বিহার	দারভাঙ্গা-ব্যঙ্গলোর দারভাঙ্গা-দিল্লী দারভাঙ্গা-মুম্বাই	
ঝাড়খণ্ড	বোকারো-কলকাতা বোকারো-পাটনা দুমকা-কলকাতা দুমকা-রাঁচী	

➲ সমাজতান্ত্রিক 'কুর্দিস্থান ওয়ার্কাস পার্টি (কে.পি.পি.)'-র 'কুর্দিস পিপলস্ প্রোটেকশন ইউনিট (ওয়াই.পি.জি.)' মিলিশিয়ার গেরিলা যোদ্ধাদের ইসলামিক স্টেটের জঙ্গীদের পরাস্ত করতে সাফল্য এবং তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্ত ও উত্তর ইরাকে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে ভীত তুরস্কের মৌলবাদী একনায়ক এর্দোগান কেপিপি ও ওয়াইপিজি-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তুরস্ক-সিরিয়া সীমান্তে কুর্দ বসবাসকারী অঞ্চলে ব্যাপক বোমা ও গোলাবর্ষণ করে চলেছে। তাকে মদত দিচ্ছে পুটিন ও ট্রাম্প।

➲ ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া, মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া প্রভৃতি জেলায় আদিবাসীদের পোষা দেশজ লো-কোলেস্টেরল কাদাকনাথ মুরগী এতটাই জনপ্রিয় যে হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, আমেবাদাবাদে ৫০০ টাকা কেজিতে উপরোক্ত অঞ্চলগুলির পোল্ট্রিতে তৈরী কাদাকনাথ বিকোচ্ছে। এর জি.আই.ট্যাগের দাবী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে।

➲ ইজরায়েল ইতিমধ্যে ভারতের তৃতীয় অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছে। মোদি- নেতানয়াহু সফরের মাঝে ভারতের জন্য ইজরায়েল বরাত পেয়েছে দুটি রেডারভেদী ফ্যালকন অ্যাওয়াক বিমান (১৯, ১৩১ কোটি টাকা), নেভির জন্য এস.আর.এস.এ.এম. মিসাইল (৯,৫৬২ কোটি টাকা), ১০টি হেরন টি পি সশস্ত্র ড্রোন (২,৫৫০ কোটি টাকা), ৫৬০টি ভূমি থেকে আকাশ এম.আর. এস.এ.এম মিসাইল ও ১৬টি লঞ্চার (১২,৭৪৯ কোটি টাকা)।

➲ মোদি সরকারের কর্মসংস্থান তৈরী ক্ষেত্রে ব্যর্থতার বিষয়টি উঠতে মোদি রাস্তায় পাকোড়া ভাজাকেও কর্মসংস্থান দেখিয়ে কৃতিত্ব নিয়ে চেয়েছেন। এর প্রতিবাদে 'কর্ণাটক ফর এমপ্লয়মেন্ট সংস্থা (কে.এফ.ই.)' রাস্তায় পকোড়া ভেজে প্রতিবাদ জানাল।

➲ মাটির তলা থেকে যথেচ্ছ জল তুলে নিয়ে বোরো প্রভৃতি চাষ সহ যাবতীয় কাজে ব্যবহারের জন্য আর্সেনিক ও লোহা শুধু নয় ফ্লোরাইড অতিরিক্ত উঠে এসে দূষণ ছড়াচ্ছে, ফ্লুরোসিস রোগের প্রকোপ বাড়ছে। ভূতলে পলিমাটি, ব্যাসল্ট বা গ্রানাইট যেখানে থাকে সেখানকার অ্যাপাটাইট, ফ্লুয়োরাইট, বায়োটাইট বা হর্ণব্লেন্ডের থেকে ফ্লোরাইড ছড়ায়। পানীয়জলে ফ্লোরাইডের সহনশীল মাত্রা এক মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। ফ্লুরোসিস কবলিত জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে ফ্লোরাইডের মাত্রা ৬-৭ গুণ বেশীতে পৌঁছেছে। ফ্লুরোসিসের প্রকোপ ১১টি জেলার ১৩১টি ব্লকের ১০৭৩টি গ্রামে ছড়িয়ে গেছে।

➲ ৩৬ বছর বয়সেও পুরুষ টেনিসে ২০তম গ্র্যান্ড স্লাম জয় করে রেকর্ড করলেন রজার ফেডেরার। এর অনেক পিছনে রাফায়েল নাদাল ১৬, পিট সাম্প্রাস ১৪, রয় এমার্সন ১২, নোভাক জোকোভিচ ১২।

➲ নেতাজী গবেষক আশিস রায় তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ ''লেইড টু রেস্ট : দ্য কনট্রোভারসি ওভার সুভাষ চন্দ্র বোসে'জ ডেথ''-তে জাপানী ও আন্তর্জাতিক দলিলের ভিত্তিতে জানিয়েছেন যে ১৮ আগষ্ট ১৯৪৫-র তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র কন্যা অনিতা বসু পাফও তাই মনে করেন এবং এই বিষয়ে বারবার তিনি ভারত ও জাপান সরকারকে টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত সুভাষ চন্দ্রের চিতাভস্মের ডিএনএ পরীক্ষা করে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে অনুরোধ করেছেন।

- মোদী জমানায় এক ধাক্কায় দশ ধাপ পেছিয়ে গেল ভারত। 'ইকনমিষ্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটে'র 'অ্যানুয়াল গ্লোবাল ডেমোক্রেসি ইনডেক্সে' ৩২ থেকে ৪২ এ জায়গা হল ভারতের।
- কলকাতার মেয়ে মার্কিন গবেষক সুমিতা মিত্র দাঁতের চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ের গবেষণায় ৯৮টি পেটেন্ট সহ সাফল্যের জন্য 'ন্যাশনাল ইনভেন্টার্স হল অফ ফ্রেমে' সম্মানিত হলেন।
- বাজপেয়ী জমানার বিজেপি-র অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা, তদানীন্তর কৃষি প্রতিমন্ত্রী সোমপাল, গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুরেশ মেটা, বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা প্রমুখরা মোদি সরকারের বিরোধিতায় অরাজনৈতিক 'রাষ্ট্রমঞ্চ' গঠন করলেন ৩০ জানুয়ারী' ১৮এ দিল্লীতে।
- ২০১৮-র বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ ২.৩৮% থেকে ২.৩৫% , এমজি এন আর ই জি এসে বরাদ্দ ৮০ হাজার থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকায় কমে যাওয়ায় এবং কৃষকদের ফসলের দামের পূর্ণ সহায়ক মূল্যের দাবীতে কৃষক সংগঠনগুলি আন্দোলন শুরু করেছে।
- রাজ্যে বাংলা, নেপালি, উর্দু, হিন্দি, সাঁওতালি, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবী সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। এবার রাজ্য সরকার বিধানসভায় বিল এনে ওরাওঁ সম্প্রদায়ের 'কুরুখ' ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিতে চলেছে।
- 'পিউ রিসার্চ' ফাউন্ডেশনে'র সমীক্ষা জানাচ্ছে গত তিন বছরে দেশ জুড়ে হানাহানি বেড়েই চলেছে। ২০১৫ তে ৭০৩টি সঙ্ঘর্ষে ৮৫ জনের এবং ২০১৭ তে ৮২২ টি সঙ্ঘর্ষে ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবচেয়ে বেশী উত্তরপ্রদেশে। সাম্প্রদায়িক হিংসার ক্ষেত্রে সিরিয়া, নাইজিরিয়া ও ইরাকের পরই ভারতের স্থান। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৫, '১৬ ও '১৭ তে সাম্প্রদায়িক হিংসার সংখ্যা যথাক্রমে ২৭, ৩২ ও ৫৮।
- ১৮,৭৪৭ টি জেট বিমানের গতিতে ১ লক্ষ ৪০ পাউন্ড ওজন বহনে সক্ষম সবচাইতে শক্তিশালী রকেট 'ফ্যালকন হেভি', 'স্টারম্যান' মঙ্গলযানকে নিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারী '১৮ ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে পাড়ি দিল।
- দীর্ঘ জটিলতা, চাপান উতোর, আন্দোলন, আইনী লড়াইয়ের পর সুপ্রীম কোর্ট ১৬ ফেব্রুয়ারী এক ঐতিহাসিক রায়ে কাবেরী নদীর জলবণ্টনের বিষয়ে রায় দিলেন। বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে কাবেরীর প্রবাহের ৭৪০ হাজার লক্ষ কিউবিক ফিট (টি.এম.সি.) এভাবে ভাগ করলেন : যথাক্রমে কর্ণাটক পাবে ২৪৫.৭৫, তামিলনাড়ু ৪০৪.২৫, কেরল ৩০, পুদিচেরী ০৭, পরিবেশ রক্ষায় ১০ এবং সমুদ্রে পড়বে ০৪ টি.এম.সি. ফিট। এর ফলে তামিলনাড়ুর অংশ থেকে ১৪.৭৫ টি.এম.সি. ফিট কর্ণাটক পেল। পরিবর্তে তামিলনাড়ু ২০ টিএমসি ফিট ভূতলের জল উত্তোলনের অনুমতি পেল। ডিএম কে, এ এস এমকে আন্দোলনরত।
- পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় অ্যারাবিকা রোবাস্টা কফি চাষ হচ্ছে এর বাজারে চাহিদার জন্য। এই কফি লতা দেবজ বড় গাছের নীচে বেড়ে ওঠে যা বহু পাখিরও আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।
- এক মর্মন্তুদ ঘটনায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিস্কার করতে গিয়ে অন্ধ্রের চিত্তুরে সাতজন সাফই কর্মী মারা গেলেন।
- বোর্নিওর জঙ্গলে যথেচ্ছ কাঠ কেটে, কাগজের কারখানা তৈরী করে, পাম তেলের চাষ করে, খনিজ উত্তোলন করে ও চোরা শিকার করে ১৯৯৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত দেড় লক্ষ ওরাং ওটাঙকে হত্যা করা হয়েছে।
- সুইজারল্যান্ডের দয়তী গুইডো হুইলার ও রিটা রাটিম্যান তাদের পুত্র স্কিয়ার মিশা গাসের দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ং চ্যাঙে অনুষ্ঠিত শীতকালীন ওলিম্পিকের প্রতিযোগিতা দেখতে ১৭,০০০ কি.মি সাইকেল চালিয়ে এলেন।
- সংক্রমিত একই সিরিঞ্জ ব্যবহার করে তিন ডজন গ্রামবাসীর এইচ.আই.ভি সংক্রমণ ঘটিয়ে দেওয়ার অপরাধে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও জেলার হাতুড়ে চিকিৎসক রাজেশ যাদবকে গ্রেফতার করা হল।
- ১৯৪৩-এর ৩ ফেব্রুয়ারী চালু হওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-র বিস্ময় হাওড়া ব্রীজ বা রবীন্দ্র সেতু ৭৫ বছর পূর্ণ করল।
- অকালবৈশাখীর দাপটে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ ও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ১১টি জেলায় ১.২৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হল। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মধ্যপ্রদেশেরও।
- ফসল কাটার পর ধান গাছের গোড়া পোড়ানোর ফলে সারা উত্তর ভারত জুড়ে ব্যাপক দূষণ ও অসুস্থতা সৃষ্টি হওয়ায় পাঞ্জাব সরকার খড়ের সঠিক বর্জ্য সংস্থাপন বাধ্যতামূলক করলেন। এরজন্য তারা কৃষিতে কমবাইন হারভেস্টার মেসিন ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছেন।
- কৃষিঋণ মকুবের ক্ষেত্রে ছলচাতুরি ও অসম্পূর্ণতার কারণে রাজস্থানের আন্দোলনকারী কৃষকেরা সরকারি প্রস্তাব বাতিল করলেন।
- ২০ জানুয়ারী মুম্বাই এয়ারপোর্টে একটি রানওয়েতে ৯৮০ বার বিমানের উড়ান ও অবতরণ রেকর্ড গড়ল।
- নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী ২১টি বড় রাজ্যের মধ্যে ১৭টিতেই নারীর জন্মের হার কমেছে। সবচেয়ে বেশী কমেছে গুজরাতে, তারপর হরিয়ানায়।
- মনিপুরের মায়নমার-ভারত সীমান্তের ১০০ মিটারের মধ্যে মায়নমার থেকে ভারতে প্রবাহিত টুইজেম নদীতে মায়নমারের বাঁধ নির্মাণ মণিপুরবাসীকে চিন্তায় রেখেছে। এর ফলে একদিকে মণিপুরের বেশ কিছু গ্রাম তলিয়ে যেতে পারে, হতে পারে জলসঙ্কট।
- গুজরাট নির্বাচনের আগে নর্মদার অতিরিক্ত জল সবরমতীতে ঢুকিয়ে সীপ্লেন চড়ে স্টান্ট দেখানো মোদির রাজ্যে এখন সব নদী খাল শুকিয়ে গেছে গ্রীষ্মের আগেই। জলের অভাবে নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ফসল।
- সরকারী সূত্রে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে মৃত্যু সংখ্যা

	সাধারণ নাগরিক	নিরাপত্তাকর্মী	'সন্ত্রাসবাদী'	মোট
২০১৬	১৪	৮৮	১৬৫	২৬৭
২০১৭	৫৭	৮৩	২১৮	৩৫৮

- খড়গপুর আই.আই.টি-র চতুর্থ বছরের কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র অঙ্কুর মেহতা 'ইন্টার ন্যাশনাল করফারেন্স অন ক্লিন অ্যান্ড গ্রীন এনার্জি' পুরস্কার জিতলেন।
- বিধানসভার পর পুরসভা ভোটে নরেন্দ্র ভাইয়ের গুজরাট আসন কমল। এরপর বৃহত্তম জেলা বনসকণ্ট, খেড়া ও গান্ধীনগর জেলায় পঞ্চায়েত ভোটেও আসন কমল। ১৭টি তালুক পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ০৮, বিজেপি ০৭, ও দুটিতে টাই। রাজস্থানের উপনির্বাচন গুলিতে বিজেপি হারল। হারল মধ্যপ্রদেশের উপনির্বাচনে, পাঞ্জাবের পুর নির্বাচনে।
- স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ পালন ও কৃষি উৎপাদনের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবীতে 'ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নে'র আহ্বানে হরিয়ানার কৃষকেরা ৯ মার্চ চন্ডীগড়ে হরিয়ানা বিধানসভা ঘেরাও করল।
- আগে বায়ু সেনার বিমান নেমেছিল। ১০ মার্চ বানিজ্যিক বিমান সফলভাবে নামল গ্যাংটক থেকে ৩১ কি.মি দূরে অবস্থিত সিকিমের প্রথম বিমান বন্দর পাকইয়ং বিমানবন্দরে। এবার পাকইয়ং-বাগডোগরা— কলকাতা/দিল্লী/গুয়াহাটি যাত্রা শুরুর অপেক্ষা।
- অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রেট ব্যরিয়ার প্রবাল প্রাচীরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তৈরী অতি পাতলা একটি আস্তরণ তৈরী করেছেন।
- ফিনল্যাণ্ডে প্রাথমিক স্কুল স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হিউম্যানয়েড রোবটের ব্যবহার চালু হল।
- বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে ১০১ টি নলকূপের জলে পাওয়া গেল এক লিটার জলে সর্বাধিক ১০০ বেককিউরেল-র সহনমাত্রার বেশী পরিমাণে তেজস্ক্রিয় রেডন কনা যা দীর্ঘ সেবনে ক্যানসারের সম্ভাবনা।
- ৩৪০ দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে থাকার ফলে দু ইঞ্চি লম্বা হওয়া ছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হাড়ের গঠন, দৃষ্টিশক্তি সহ নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন ধরা পড়েছে মহাকাশচারী স্কট কেলির। তার ও তার প্রাক্তন মহাকাশচারী ভাই মার্ক কেলির উপর 'টুইন স্টাডি' করে নাসা। এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে এর পিছনে অক্সিজেনের স্বল্পতা, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ছাড়াও 'স্পেস জিন-র ভূমিকা আছে কিনা।
- পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের চালু করা গরীবদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রী বিপিএল জীবনরক্ষা কোষ' রাজস্থানের বর্তমান বি.জে.পি. সরকার তুলে দেওয়ায় হৈ চৈ শুরু হয়েছে।
- পশ্চিম তামিলনাড়ুর পাহাড়-জঙ্গল ভরা থেনি জেলায় প্রবল দাবানলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মারা গেছেন ১৬ জন। তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যেও দাবানলের সংখ্যা বাড়ছে। এর পিছনে কাঠ ও জমি মাফিয়া এবং চোরাশিকারীদের হাত থাকতে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।
- এ আই ডি এমকের পনির সেলভন ও পালানাস্বামী গোষ্ঠী এক হয়ে এবং বিজেপির সাহায্যে শশীকলা ও তার ভাইপো টি টি ভি দিনাকরনকে কোনঠাসা ও বহিস্কারের পর শশীকলা জেলে কাটালেও দিনাকরণ নির্দল প্রার্থী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ আর.কে. নগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন এবং আম্মা মাক্কাল মুন্নেত্রা কাঝাগাম (এ.এম.এম.কে) নামে নতুন দল তৈরী করেন। এর আগে জনপ্রিয় অভিনেতা কমল হাসান রাজনীতিতে নামেন ও তৈরী করেন 'মাক্কাল নিধি মাইয়াম।' তার আগে তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত।
- 'কোর্টের নির্দ্দেশে গোয়ার সেসা প্রভৃতি অঞ্চলে বেআইনি খনন বন্ধ হলেও কর্ণাটকের বেলারি, সিমোগ, চিত্রদূর্গ প্রভৃতি অঞ্চলে খনি মাফিয়াদের বেতাজ বাদশা রেড্ডি ভাইদের নেতৃত্বে চলছে ব্যাপক বেআইনি খনন। খনিজ লোহা বের করতে এক একটি আস্ত পাহাড় কেটে ফেলা হচ্ছে। এই আকরিক লোহার মূল ক্রেতা চীন। আর রেড্ডিভাইরা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা। সম্প্রতি জানা গেল তামিলনাড়ুর উধাগামন্ডলের দেভালা অঞ্চলে নীলগিরি পাহাড়ের নীচে গোপনে চলছে সোনা খোঁজার বেআইনি খনন।
- ওড়িষ্যার সবচাইতে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ অনসুপা ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার পর মহানদীর সাথে সংযোগ করে একে বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।
- চেন্নাইয়ের ইনসাটিটিউট অফ ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্সের গবেষকরা গবেষণা করে, ১,৭৪২ টি ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ ও তার মধ্যে থেকে ৯,৫৯৬ রকম ফাইটোকেমিকাল পেয়েছেন।
- আগেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অক্টোবর ১৭ কংগ্রেসে স্থির হয়ে গেছিল। এবার 'ন্যাশনাল পিপলস্ কংগ্রেসের' ভোটেও পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিনপিং দেশের রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন।
- "Herd of Hope" সাংগঠনের পক্ষে চল্লিশজন অশ্বারোহী সমগ্র, বিশাল ও দুরূহ অস্ট্রেলিয়ার তট অঞ্চল পাড়ি দিলেন গ্রামীন স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য।
- সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মধ্যে সবচাইতে বেশী ভিখারি ও ভবঘুরের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে। ২০১১-র জনগননার ৪,১২,৬৭০-র মধ্যে ৮১,২৪৪। মহিলার অনুপাত বেশী। দ্বিতীয় স্থানে উত্তর প্রদেশ, তৃতীয় স্থানে অন্ধ্র।

কার্টুনের দুনিয়ায়

HOME DESPOT

Friend of America!
Enemy of America!

NIRAV SOUND

MITRO, PRACTICE THE ART OF SILENCE...
SEE, HE'S COPYING OUR POLICIES...

GST
STATES

IT'S 'OFFICIAL' NOW

#NoCallDrops

KYA KARE BAT USKA HAI!
GANDHI
SCORE BOARD
KERALA RAHUL - 0
ASSAM RAHUL - 0
RAHUL - 0
RAHUL - 0
RAHUL - 0
RAHUL - 0
RAHUL - 0

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ গুল্ড মশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন ২৫২৬৫০৫০ থেকে মুদ্রিত

e-mail : ssunnayan@gmail.com || Website : www.ssu2011.com

₹ ৩০